মহাকাশ
মহাকাল

জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য

দীপায়নী প্রকাশ ভবন

১৮২. রাজা রাম[illegible] সরণী

কলিকাতা ৭০০০০৯

লে মেনে নিয়েছিল, এবং সেই পৃথিবীর আরোহী হয়ে সে চলে গিয়েছিল ছায়াপথের অন্তর-লোকে, দেখেছিল মহাকাশকে।

এটি তারই অ-সম্পূর্ণ ও অ-সার্থক ধারা-বিবরণী।

অতএব, পৃথিবীর অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল সন্তানটি একদা এক প্রচণ্ড ঝটকা মেরে মায়ের কোল থেকে বেরিয়ে গেল। কাজটি নিশ্চয়ই খুব সহজ ছিল না। কেননা, জন্মাবধি সে রয়েছে মায়ের কোলের কাছাকাছি। বলতে গেলে, তাঁর আঁচল ধরেই তাদের সারা জীবন কেটে যায়। অথচ, ব্রহ্মাণ্ডের দূর-বিস্তৃত সহস্র কোটি আলোক-বর্ষ দূরের নীহারিকামণ্ডল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত নক্ষত্রের ধূলিকণাটিও তাকে টানছে। তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর মাটি তাকে ছিনিয়ে নিতে দিচ্ছেন না। মায়ের কোলের টান এতই প্রবল, অভিকর্ষের টান সবচেয়ে বেশি। সেই অভিকর্ষকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে যেতে হলে চাই প্রচণ্ড শক্তি।— ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে ছুটে চলতে পারলে মাতৃবন্ধন ছিন্ন করতে পারি। কিন্তু আমার অন্য পরিচয়ও রয়েছে। আমি যেমন পৃথিবীর সন্তান, তেমনি সূর্যলোকেরও সন্তান। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে আমি পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে পারি, কিন্তু তা দিয়ে আমি সূর্যলোকের সীমানা লঙ্ঘন করতে পারি না। অতএব, আরও প্রবলতর ঝটকা মেরে আমাকে আর একদিন সূর্যলোকের সীমানা অতিক্রম করতে হবে।

কিন্তু, আমার পরিচয় কি এখানেই শেষ হল? আমি কি এই জ্যোতির্মেখলা ছায়াপথেরও সন্তান নই? হ্যাঁ, তাই। কিন্তু সে পরিচয় আপাতত থাকুক।

অতএব, পৃথিবীর অশান্ত সন্তানটি ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে রকেটে চড়ে বসল। সূর্যের অন্য কোন গ্রহ বা গ্রহাণু তাকে টেনে রাখতে পারল না। এই গতিবেগ নিয়ে সে চলে যেতে

আঘাতে—, তা' চুরমার হয়ে যেত, এবং অনাবৃত, উন্মুক্ত আকাশের নিচে পৃথিবীর 'চিরকুমারী রূপই থেকে যেত।

রকেটটি সূর্যের দিকে ছুটে চলেছে। সৌরমণ্ডলের অধিপতি সূর্য। বুধ থেকে শুরু করে প্লুটো পর্যন্ত নয়টি গ্রহ নানা দূরত্বে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে; তার মধ্যে রয়েছে কিছুক্ষণ আগে ফেলে-আসা পৃথিবীও। এখানে, অর্থাৎ রকেটে বসেই আমি নয়টি গ্রহের অন্তহীন পরিক্রমা দেখতে পাচ্ছি। সূর্যকে মাঝখানে রেখে তারা ঘুরছে। এ দৃশ্য অভিনব, অতুলনীয়। কিন্তু, দৃশ্যটি নতুন নয়, যন্ত্রাগারে পরমাণুর ক্ষেত্রে তা দেখেছি। প্রোটন মহাসূর্যকে কেন্দ্রস্থলে রেখে ইলেকট্রন তাকে প্রদক্ষিণ করছে। নানা কক্ষপথে এমনিই তাদের পরিক্রমা বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতমের মধ্যে এ এক অদ্ভুত সাদৃশ্য! গ্রহগুলির তুলনায় সূর্যের ভর অনেক বেশী. এমন কি. তাদের সম্মিলিত ভরকেও সূর্য ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রোটন, ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও তাই. পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে বসে প্রোটন আবার নিউট্রনের সঙ্গে জোট বেঁধে রয়েছে ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটনের ভর অনেক, অনেক বেশী। প্রোটন ইলেকট্রনের কঠিন বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে বের করে আনা হচ্ছে, যাকে বলা হয়, পরমাণুশক্তি। সেটা দেখা যায় পরমাণ বোমায়, দেখা যায় পরমাণু চুল্লীতে।

যে বন্ধনে সূর্য তার গ্রহগুলিকে বেঁধে রেখেছে—অভিকর্ষ বা মহাকর্ষ, তাকে ছিন্ন করে দিতে পারলে মহাজাগতিক এক প্রচণ্ডতার মধ্যে সৌর সংসার ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে। যে শক্তি মুক্তি পাবে তা দূরবর্তী ছায়াপথের দেহেও কাঁপন ধরাবে।

পৃথিবী যে কী বিপুল গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, পৃথিবীতে বসে কেউ কোনদিন তা আঁচ করতে পারে না। পৃথিবীর বাইরে এসে দেখলাম এক নিঃসঙ্গ জ্যোতিষ্করূপে অন্য সকলের সঙ্গে সেও ছুটে চলেছে।

মহাজগত বা ব্রহ্মাণ্ড এই নিদারুণ সত্যটি বুঝতেই দেয় না। ছলনাময়ী প্রকৃতি আমাদের এ কথাও জানতে দেয় না যে সূর্য তার গ্রহমণ্ডলকে নিয়ে ঘণ্টায় পাঁচ লক্ষ মাইল বেগে ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করছে। এই গতির অংশীদার আমরা—আমরা শুধু সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করছি না, প্রদক্ষিণ করছি ছায়ালোককেও আমার দৌহিত্রীর দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই আমি দম্ভভরে বলতে পারি: কী এমন বাহাদুরি করছ তুমি। তুমি ত মাত্র তিনবার সূর্য প্রদক্ষিণ করলে, কিন্তু আমি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছি ৬০ বার কিন্তু, এ পর্যন্তই।

সূর্য তার গ্রহ সংসারটিকে নিয়ে ঘণ্টায় পাঁচ লক্ষ মাইল বেগে আমাদের ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করছে। ২৫ কোটি বছরে একবার সে ছায়াপথের চতুর্দিকে ঘুরে আসছে। আবার এই ছায়াপথ এক মহাজাগতিক সত্তার চতুর্দিকে ঘুরছে। পৃথিবী থেকে আকাশকে দেখে, বা আকাশের তারকাগুচ্ছ দেখে মনে হত সব অনড়, স্থিতিশীল। কিন্তু, সূর্যের দিকে যাবার পথে এখানে এসে দেখছি কেউ, স্থির নেই—এক প্রচণ্ড গতিশীলতার মুখে সব কিছু যেন ছুটে চলেছে।

আমি সূর্যের দিকে ছুটে চলেছি। পৃথিবী থেকে যে সূর্যকে দেখা যায় শান্ত ও স্থির, সে যে কত অশান্ত, দুর্দান্ত ও ভয়ঙ্কর তা আগে জানতে পারিনি। যতই কাছাকাছি এগোচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, এক ক্রোধোন্মত্ত অগ্নিসত্তা প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছে,—লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ শিখা মহাকাশকে প্রতি মুহূর্তে লেহন করে তীব্রতর ক্ষুধায় জ্বলছে।

কিন্তু, এখানে, পৃথিবী থেকে মাত্র চার কোটি মাইল দূরে গিয়ে আবার পৃথিবীর দিকে চোখ পড়ল। সেই পৃথিবীর দেহে য্যানডিস নেই, হিমালয় নেই, আমাজন, বা প্রমত্তা পদ্মাও নেই, সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলে আকাশে সে একটি ক্ষুদ্র আলো-কণা মাত্র। আর কোন পরিচয় তার নেই।

প্রচণ্ডবেগে সূর্যদেহ থেকে ঝঞ্ঝা বইছে। ওই ঝঞ্ঝা থেকে জীবনকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর কী বিপুল প্রয়াস! স্তরে স্তরে আবরণ সৃষ্টি করে স্নেহপুষ্ট জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে।

ঝড়ের মুখে শিশুসন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬০ মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল। তারই নিম্নাংশে পৃথিবীর বক্ষলগ্ন অদৃশ্য বসনটি হচ্ছে 'ট্রপোস্ফিয়ার'—সেখানে ধূলিকণা, মেঘ ও বাতাস। পৃথিবীর বিষুবরেখায় যার উচ্চতা দশ মাইল।

এই আবরণটি ছিন্ন করে আমাকে আসতে হয়েছে। তারপর প্রায় ২৫ মাইল বিস্তৃত—মোট ৩৫ মাইল—আর একটি স্তর। এখানে মেঘ নেই, সমস্ত কিছু শান্ত ও অচঞ্চল।

তারপর ঢুকে পড়লাম 'মেসোস্ফিয়ার' এ, ঊর্ধ্বে ৬০ মাইল পর্যন্ত যার বিস্তার। অবিশ্বাস্য এই শীতল এলাকায় তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর চেয়েও ৯৫ ডিগ্রী কম। এটা 'অজোন' (ozone) স্তর। বক্ষলগ্ন এই মাতৃবসন সৌর ঝঞ্ঝা, বা, মহাকাশের প্রাণঘাতী বিকিরণগুলি শুষে নেয়।

৬০ মাইল থেকে ১১০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত "থারমোস্ফিয়ার" স্তর অনায়াসে আমি অতিক্রম করে এসেছি। 'মেসোস্ফিয়ার' এর তুলনায় এ যেন এক তাপদগ্ধ ভয়ঙ্কর এলাকা। তাপের পরিমাণ ১২শ, ডিগ্রী। এখানে পরমাণুর অখণ্ড সত্তা বলতে কিছুই নেই। সূর্যের বিকিরণ এখানে ঘা মেরে অণু-পরমাণুগুলিকে বিদ্যুতায়িত করে ফেলছে। মুক্ত ইলেকট্রন, প্রোটন ও অয়নের এই আবরণকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে অয়নমণ্ডল-রূপে। পৃথিবীর জীবন-সত্তাকে নিরাপদ রাখার জন্য একটির পর একটি আবরণ। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত একটি গ্রহের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি, আর ভাবছি, জননী পৃথিবী যদি আঁচলের পর আঁচল দিয়ে সন্তানদের ঢেকে না রাখতেন, তবে জীবনের অভ্যুদয় ও বিকাশ—অন্তত জীবনের যে রূপ দেখে আমরা অভ্যস্ত—তা কি কদাপি সম্ভবপর হত?

সূর্য, মহাকাশ এবং ছায়াপথে ছায়াপথে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য জ্যোতিষ্ক তাদের জীবন যাপনের অঙ্গ হিসাবেই নির্বিকার ঔদাসীন্যে কত বিকিরণ ছড়িয়ে যাচ্ছে, আজ ও পুরোপুরি হিসেব পাওয়া যায় নি। একটি অয়নমণ্ডল পার হয়ে ঝাঁপ দিলাম মহাশূন্যে কিন্তু, আড়াই হাজার মাইল উর্ধ্বে আর একটি অয়নমণ্ডল যা 'ভ্যান এলেন বিকিরণ বলয়' নামে পরিচিত।

পেছনে, প্রায় অন্ধকারে বিলীয়মান পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছি আর, ভাবছি, সূর্য-লোকের অন্যান্য গ্রহ কেন পারেনি জীবন সৃষ্টি করতে, অথবা পারেনি জীবনকে পরিপুষ্ট করতে। সন্তানসম্ভবা হওয়ার আগে পৃথিবীকে কী অনির্বচনীয় নিপুণতায় প্রস্তুত হতে হয়েছে। আজ যদি কোন আকস্মিকতায় ওই অয়নমণ্ডল, বা, ভ্যান এলেন বিকিরণ বলয়টি সরে যায়, তবে মহাজগতের বিকিরিত একস্ রশ্মি, গামা রশ্মি মুক্ত প্রোটন ইলেকট্রন ছুটে এসে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবীর সমগ্র জীবনকে মুছে নিয়ে যাবে।

পৃথিবীর প্রাক্-জীবন রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতিতে সপ্ত সমুদ্রের ও প্রয়োজন ছিল, উন্নততর জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরিরও। মহাকাশে ঝাঁপ দিয়ে সেই পাঁচশত কোটি বছরের বিলুপ্ত ইতিহাসের পাতাগুলি একটি একটি করে আমার সামনে খুলে গেল। জল আছে বলেইত জীবনও আছে। শত কোটি বছরে মহাসাগরের জলে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলেছে। ফলে এমন একটি অণু সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যা আপন প্রতিবিম্ব বা, প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে পারল। সেটাকেই আমরা বলি জীবন-কণা। সেই পরীক্ষা সম্ভরপর ছিল একমাত্র জলেই এবং তরল জলে। ফুটন্ত জল, বা, কঠিন বরফের মধ্যে সেই আদি রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া সম্ভবপর ছিল না।

অতএব কোন গ্রহকে যদি জীবন সৃষ্টি ব. জীবন পোষণ করতে হয়

তবে তাকে তার সূর্য (শক্তির উৎস) থেকে এমন দূরত্বে থাকতে হবে যেখানে জলের তরল অবস্থা সম্ভবপর। বুধের মতো সূর্যের কাছাকাছি কোন গ্রহে, বা, বৃহস্পতির মতো দূরবর্তী কোন গ্রহে উন্নত জীবনের বিকাশ সম্ভবপর নয়। সৌরলোকের মাত্র কয়েক লক্ষ মাইল বিস্তৃত যে অঞ্চলে জলের তরল অবস্থা সম্ভবপর শুধুমাত্র সে এলাকাতেই জীবনের বিকাশ ঘটতে পারে। তাই সৌরলোকের জীবন এলাকা বিশেষভাবেই সীমিত রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, জীবন সৃষ্টি, বা, জীবন পোষণের জন্য শক্তি-উৎসের স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। আমাদের সর্ব শক্তির উৎস হচ্ছে ওই সূর্য। আজ অকস্মাৎ সে যদি Rigel, বা, বাণরাজের মতো সহস্র সূর্যের দীপ্তি নিয়ে জ্বলে উঠে, তবে পৃথিবীকে চলে যেতে হবে অনেক দূরে। সূর্য সাম্রাজ্যের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়েও অনেক দূরে। এক অতি বিস্তীর্ণ কক্ষপথে থেকে পৃথিবীকে হয়তো দুই শত বছরে একবার সূর্য প্রদক্ষিণ শেষ করতে হবে। নীলাভ, বিকট দর্শন বাণরাও পৃথিবীর ঋতুর আবর্তনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে।

আবার সূর্যের বহির্মণ্ডলের তাপমাত্রা যদি ৬ হাজার ডিগ্রী থেকে নেমে আসে, ধরা যাক, চার হাজার ডিগ্রী—তবে, সন্তানদের বাঁচাবার জন্য পৃথিবীকে চলে যেতে হবে সূর্যের কাছাকাছি। ফল দাঁড়াবে, বর্তমানের একবছর সময়ের মধ্যে পৃথিবীকে অন্ততঃ দুই তিন বার সূর্য প্রদক্ষিণ করতে হবে।

আর একটি দুঃসাহসিক কল্পনা করা যাক। পৃথিবীর আয়তন অপরিবর্তিত থেকে তার 'ভর' (mass) যদি বেড়ে যায়, জীবনকেও বর্ধিত অভিকর্ষের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য প্রতিটি জীব-জন্তু ও তরুলতাকে লড়াই করে চলতে হবে। সেই পৃথিবীতে অবিরাম ঝঞ্ঝা—। সেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অক্সিজেনসমৃদ্ধ থাকবে না। ফলে তার শ্বাসযন্ত্রের রূপ পরিবর্তিত হবে, সামগ্রিকভাবে প্রতিটি

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভূমিকাও পালটে যাবে। প্রাক্‌-পরিবর্তন কালের কোন মানুষ যদি সেদিনও বেঁচে থাকেন, তবে তিনি তাঁর চোখের সামনেই অতিকায় দৈত্যদের আবির্ভাব দেখবেন। অতিকায় এবং বিচিত্ররূপী। যার সঙ্গে আজকের মেরুদণ্ডী প্রাণীর চেহারাতেও কোন সাদৃশ্য থাকবে না।

কিন্তু, সেটা আশঙ্কা মাত্র। নক্ষত্রগুলি একে অন্য থেকে এত দূরে রয়েছে যে সে আশঙ্কা খুবই ক্ষীণ। নীল বা, লোহিত দানব-নক্ষত্রদের এলাকা থেকে অনেক দূরে ছায়াপথের এক প্রান্তে নিঃসঙ্গ সূর্যের সাম্রাজ্যে পৃথিবী বেশ আছে এবং আরও বহু শত কোটি বছর ধরে সে ভালই থাকবে, যত দিন না সূর্য চিরকালের জন্য নির্বাপিত হয়ে এবং শ্বেতবামন রূপে আপন গ্লানিকর অস্তিত্ব নিয়ে মহাকাশের অন্ধকারে মুখ লুকোয়।

প্রসঙ্গত, নক্ষত্র সমাজে যাঁরা অভিজাত, সাম্রাজ্য যাঁদের বহু আলোক-বর্ষ বিস্তৃত,—তাঁরাই পরিচিত হন দানব রূপে—এবং তাদের গাত্রবর্ণ অনুসারেই নীল বা লোহিত দানব বলা হয়। যাঁদের সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ ছোট হয়ে গিয়েছে, বা যাঁদের পূর্বতন গৌরব আজ স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হয়েছে, সে সকল ভাঙ্গা-পড়া, বা, ফতুর হয়ে যাওয়া নক্ষত্রদের পরিচয় 'বামন রূপে'। শ্বেত বামন, লোহিত বামন ইত্যাদি। কিন্তু থাক্‌ সে কথা।

অবশেষে আমি সূর্যের এক কোটি মাইলের মধ্যে এসে পড়েছি এবং সূর্য প্রদক্ষিণ করছি। পৃথিবী থেকে যে সূর্য চিরদিন দেখে এসেছি, সে সূর্য নয়। জ্যোতির্ময় তো বটেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অশান্ত, ভয়ঙ্কর—তার সমগ্র দেহে অগ্নিঝঞ্ঝা বইছে। অগ্নিগহ্বর থেকে প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ বিকিরণরূপে মহাকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রকেটের কক্ষপথটিকে আর একটু সংকুচিত করে সূর্যের আরও কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম। লক্ষ লক্ষ মাইল ঊর্ধ্বে অগ্নিশিখা লক্ষ কোটি ফণিনীর

-মতো আকাশে দুলে দুলে উঠছে,—ফণিনীরা প্রচণ্ড আক্রোশে মহাকাশে ছোবল মারছে। এই দৃশ্য বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার -স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়াল সহস্র মাইল পরিধির অগ্নিস্তম্ভ, অগ্নিস্তম্ভগুলি একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ে প্রচণ্ড মত্ততায় লাফিয়ে উঠল—।

সূর্য প্রদক্ষিণ করছি, আর দেখছি, এক মূর্তিমান প্রচণ্ড আক্রোশ যেন আপন জ্বালায় নিজেকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। লক্ষ মাইল দীর্ঘ অগ্নিজিহ্বা দিয়ে মহাকাশকে লেহন করে সে বুঝি কিছুটা পরিতৃপ্ত হল। কিন্তু, ভুল, প্রচণ্ড ভুল।

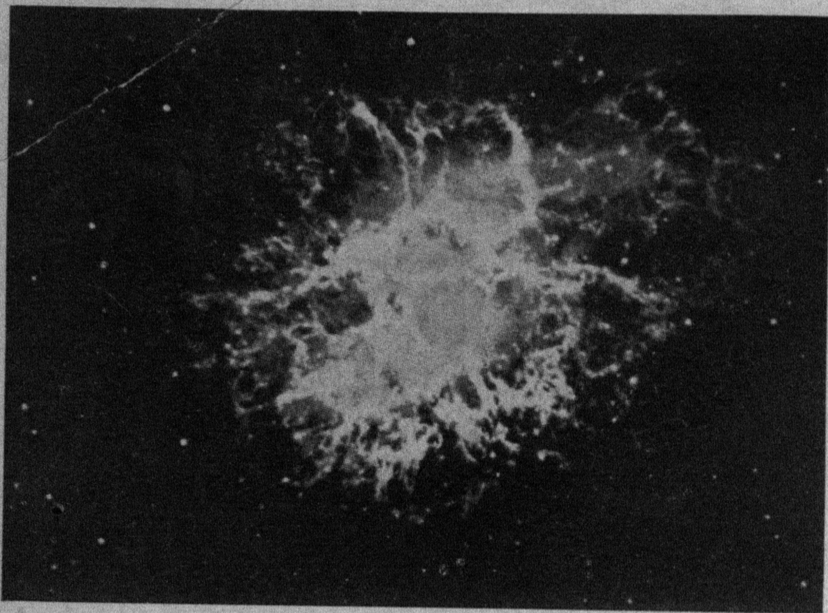
পরমুহূর্তেই দেখছি, বহু লক্ষ মাইল বিস্তৃত এক অগ্নিবর্ণ রাজছত্রের নিচে স্তব্ধ ও সমাহিত অগ্নিমূর্তি। সদা চঞ্চল,—আপন গহ্বরে শত কোটি ডিগরি তাপ চাইছে তাকে বাইরের দিকে প্রসারিত করে দিতে, অন্য দিকে বিপুল অভিকর্ষ-শক্তি চাইছে তাকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর আয়তনের মধ্যে বেঁধে রাখতে। আপন দেহের এই টানা-পোড়েনের মধ্যে সূর্য কি এক অভিশপ্ত সত্তা ?

সূর্যের কাছ থেকে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আগেই সূর্য মহাকাশের দিকে একটি অগ্নি-তোরণ তুলে দিল ; লক্ষ, বা, দশ লক্ষ মাইলের এক অগ্নি-কাঠামো, তার খিলানে খিলানে অগ্নি ঝালর—মহাকাশের দিকে দুলে দুলে উঠছে—কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। পরমহূর্তেই আপন গহ্বর থেকে ঠেলে ওঠা এক প্রচণ্ড আক্রোশ যেন সমস্ত কিছুকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিল। ওখানে সামান্য একটু দূরেই অন্ধকারের এক বিরাট গহ্বর সৃষ্টি হল—। কত তার পরিধি ? হাঁ, স্বচ্ছন্দেই সহস্র পৃথিবীকে সেখানে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা ওটাকে বলেন, সৌর কলঙ্ক। আসলে ওটা কলঙ্ক আদৌ নয় ; বরং অশান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ওটি একটি স্বস্তি। ওদিকে. ওই সৌর কলঙ্কের প্রান্তসীমায় কি দেখতে পাচ্ছি ওটা ? ওই অন্ধকার -গহ্বর থেকেই লক্ষ স্তম্ভের খিলান-আঁটা একটি প্রাসাদ, বহু সহস্র



তার সহস্র মাইল বিস্তৃত মুখগহ্বর। কল্পদানব মুখব্যাদান করে লক্ষ মাইল দীর্ঘ অগ্নিজিহ্বা মেলে দিচ্ছে আমার দিকে : কোটি মাইল দূরে আমার দিকেই যেন সেই বিকটদর্শন ছুটে আসছে। (পৃষ্ঠা ১৩)

ছবি : আমেরিকান স্কাই-ল্যাব। কলকাতার মারকিন তথ্য কেন্দ্রের সৌজন্যে।



দূরে দেখতে পাচ্ছি নীরিহকা কর্কট তাকেই প্রশ্নটি, জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে নিরুত্তর। নীহারিকা কর্কটের উচিত ছিল এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া,—কেননা, তার জন্মের ইতিহাসও এমনইএক নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের ইতিহাস (পৃষ্ঠা ঃ ৬৬)

ছবি ঃ উইলসন-পালোমার মান মন্দির।

মাইল জুড়ে একটি হর্ম্য। উঠছে, উপর দিকে উঠছে। প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে আগুনের বন্যা। একমাইল দু'মাইল করে দু'হাজার মাইল পর্যন্ত উঠল সে প্রাসাদ। অবলম্বনহীন, অথচ, স্থির। প্রাসাদতলে শালে বীথিকার মতো সাজানো অগ্নিস্তম্ভ ধীরে ধীরে উঠে এসে সে প্রাসাদকে চুরমার করে দিয়ে প্রচণ্ড উন্মত্ততায় মহাকাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ভয়ার্ত বিহ্বল ও শঙ্কিত। তবুও সেই অগ্নিময় মহাসত্তার দিকে তাকিয়ে বললাম, হে সূর্য, তোমার ওই রাজছত্রের নিচে রাজোচিত মহিমায় তুমি আর একবার স্থির হয়ে বসো। মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমাকে আর একবার দেখে নিই।

কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই প্রাসাদের পর প্রাসাদ ধ্বসে পড়তে শুরু করল, ধ্বসে-পড়া তোরণ দিয়ে বিপুল বেগে লক্ষ ফণিনী যেন এদিকে আমার দিকেই ছুটে আসতে শুরু করল। এদিকে আর এক প্রান্ত থেকে যেন একটি হিমালয় উঠে আসছে,—সহস্র, বা লক্ষ মাইল দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী; স্পষ্টতঃই তার সু-উচ্চ শিখর আমি দেখতে পাচ্ছি। পরমুহূর্তেই সেই অগ্নি—হিমালয় সূর্য দেহের শেকড় ছিন্ন করে উড়ে যেতে শুরু করল।

কোটি মাইল দূরে দাড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে হাততালি দিয়ে উঠলাম। অগ্নিহিমালয় উড়ে যাচ্ছে ওই ছায়াপথের দিকে। সেদিক থেকে চোখ ফেরাতেই অন্ধকার গহ্বর ফুঁড়ে আগুনের ঝরণা, ক্রমশঃ অগ্নিস্তম্ভের রূপ নিল। অগ্নি স্তম্ভগুলি উড়ে যাচ্ছে—। কিন্তু, কিছুদূর গিয়েই তারা অতিকায় ও বীভৎস জন্তুর রূপ নিল—বহু হাজার মাইল দীর্ঘ জন্তুটি হাত-পা ছুঁড়ে আকাশে-মহাকাশে নেচে বেড়াতে শুরু করল। পেছনে আরও আগুন, আরও অগ্নিস্তম্ভ, নীলবর্ণ অগ্নি-শিখাগুলিকে সে সহস্রপুচ্ছরূপে আকাশে নাচাতে আরম্ভ করল,—তার সহস্র মাইল বিস্তৃত মুখগহ্বর : কল্প-দানব মুখব্যাদান করে লক্ষ মাইল দীর্ঘ অগ্নি জিহ্বা মেলে দিচ্ছে আমার দিকেই ; কোটি মাইল

দূরে আমার দিকেই যেন সেই বিকটদর্শন ছুটে আসছে। মস্তকে তার সেই রাজছত্র, সেই বিভীষিকা, তার কোটি কোটি নেত্রে আগুন নিয়ে সে ছুটে আসছে আমার দিকেই—আগুনের গোলা ছুঁড়ে মারছে দূর থেকেই—লক্ষ পুচ্ছ আন্দোলিত করে নিরবলম্ব অগ্নি সত্তা—। জন্তু, অথচ, জন্তু নয়; এমন একটা কিছু, যা শুধু সূর্যই সৃষ্টি করতে পারে।

রকেটের মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। চললাম বুধের দিকে। তবুও সূর্যকে আমার শেষ প্রণতি। ভয়ঙ্কর, অথচ, সুন্দর। হে সূর্য, জীবনের প্রথম প্রভাত থেকে তোমাকে দেখে এসেছি, কিন্তু, এমনটি কোনদিন দেখিনি।*

সূর্য সাম্রাজ্যের শেষ প্রহরীর দিকে

সূর্য প্রদক্ষিণ শেষ করে, সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে আমি চলেছি সূর্য-সাম্রাজ্যের শেষ প্রান্তিক প্রহরী প্লুটো'র দিকে। কিন্তু, সেটাই আমার শেষ লক্ষ্যস্থল নয়, আমি যেতে চাই ছায়াপথের দিকে যেখানে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয়, বৃদ্ধ ও স্থবির নক্ষত্ররা যেখানে নিজেদের বিগত গৌরবের কাহিনী স্মরণ করে অন্ধকারে মুখ লুকোয়। সেই দূরান্তের যাত্রী যদি সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির দিকে তেমন করে না তাকায়, তবে বড় রকমের অপরাধ করা হয় না। রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে বসে কেউ কি লিলুয়া, বা, শেওড়াফুলির কথা মনে রাখে? বা, রাখতে পারে? সামনে বুধ (Mercury)—সূর্যের নিকটতম গ্রহ। খুবই ক্ষুদ্র, পৃথিবীর অর্ধেকও নয়, ২২৫ দিনে সে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। যে দিকটা সূর্যের মুখোমুখি রয়েছে সেখানে প্রচণ্ড গরম।

---

* ১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণ কালে অধ্যাপক জীনস যা দেখেছিলেন, মুখ্যতঃ সেটি অবলম্বন করে এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের বিবরণ থেকে সূর্য-দর্শন কাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে—। লেখক।

আবার যে দিকটা সূর্যের বিপরীত, সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। জীবনের অভ্যুদয় বা, জীবন পোষণের পরিবেশ নেই।

বুধকে পেছনে রেখে চলে এলাম শুক্রের আকাশে : আয়তনও ওজনে দিক থেকে পৃথিবীরই মতো ; যদিও পৃথিবীর তুলনায় সে সূর্যের অনেক কাছে রয়েছে। আপন দেহকে সে বাষ্প ছায়ার নিচে পুরোপুরি ঢেকে রেখেছে। কিছুই সে সহজে দেখতে দেবে না। ফলে শুক্রকে ঘিরে এক অন্তহীন রহস্য বহুকাল বিরাজিত রয়েছে। পৃথিবীর মানুষ সেই বাষ্প-মেঘের নিচে তরুলতা ও প্রাণীর অজস্র সমাবেশ কল্পনা করে এসেছে। কিন্তু ৬৭ সালে সে সকল কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল যখন জানা গেল, শুক্রের পৃষ্ঠদেশের তাপ মাত্রা ৮০০ ডিগ্রী (ফাঃ)—যেটা সীসার দ্রবণাঙ্কের (melting point) কাছাকাছি।

অতএব, শুক্রেও জীবন নেই,—অন্ততঃ পৃথিবীতে জীবন বলতে আমরা যা বুঝি তা নেই।

শুক্রকে পেছনে রেখে পৃথিবীর আকাশ অতিক্রম করে চলে গেলাম মঙ্গলের দিকে। **মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর** প্রায় অর্ধেক, ভর (mass) পৃথিবীর এক দশমাংশ। আবহাওয়া শীতল ও শুষ্ক। বাষ্পমণ্ডলে সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প রয়েছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় অত্যন্ত হালকা।

মঙ্গলের এই শুষ্ক ও শীতল পরিবেশে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভবপর। অবশ্য, জীবন বলতে আমরা কি বুঝি, তার স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। ব্যাকটেরিয়া, বা, 'ভাইরাস' ও জীবন, আবার মানুষ, তরুলতাও জীবন বলে পরিচিত। বিজ্ঞানীরা যখন জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বলেন, তখন অনিবার্য ভাবেই ধরে নেওয়া হয় যে তাঁরা মানুষ, বা অন্যান্য উন্নত জীবের অস্তিত্বের কথাই বলছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে জীবনের সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। এককোষ ভাইরাস থেকে

শুরু করে উন্নততর প্রাণীকুল, সব কিছুই তাঁরা জীবন বলে মেনে নেন।

মঙ্গলের আকাশ-পথ দিয়ে চলে যাবার কালে আমি শুধু সাগ্রহে খুঁজে বেড়াচ্ছি একটি সমুদ্র—। কেননা, জীবনের সব উপাদানই রয়েছে এখানে। শুধু প্রয়োজন একটি অতি বিস্তীর্ণ জলাধার, পৃথিবীতে যাকে আমরা সমুদ্র বলে অভিহিত করে থাকি। অন্ততঃ শতকোটি বছরের পুরাতন একটি সমুদ্রের সন্ধান পেলে আমি ধরে নিতে পারব এখানে জীবন-সৃষ্টির মহাপর্ব শুধু শুরু হয়নি,—অনেক অধ্যায় তার অতিক্রান্তও হয়ে গিয়েছে। বাজপাখীর মতো দৃষ্টি নিয়ে আমি মঙ্গল গ্রহের সারা দেহ খুঁজে বেড়ালাম। কিন্তু একটি সমুদ্র দেখতে পেলাম না। গ্রহটির এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে জমাট বাঁধা কার্বণ ডায়োক্সাইড।

অতএব, পৃথিবী ছাড়া সূর্য মণ্ডলের অন্য কোন গ্রহে উন্নততর জীবন নেই।

দূরে এক সৌভাগ্যবতী সূর্যালোকে কেবলই হাসছে। সে আমার পৃথিবী।

বৃহস্পতির দিকে

মঙ্গল থেকে বৃহস্পতির পথে এক বিরাট ফাঁক। সেখানে কোনই গ্রহ নেই। অথচ, মঙ্গলের কক্ষপথের ঠিক বাইরে একটি গ্রহের অস্তিত্ব আশা করেছিলাম। তার বদলে দেখলাম, বিপুল সংখ্যক গ্রহাণু, বা, asteroids সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কোনটি বা কয়েক ফুট লম্বা, কোনটি বা কয়েক মাইল। মাঝে মাঝে এ সকল গ্রহাণুর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, এবং তারই ফলে, অথবা মঙ্গলের পরবর্তী গ্রহ বৃহস্পতির অভিকর্ষের টানে এ সকল গ্রহাণু কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর দিকে চলে যায়। পৃথিবীর আকাশে সেটা উল্কাবৃষ্টি।

এরপর ছুটে চললাম অতিকায় গ্রহগুলির দিকে। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্ ও নেপচুন—দেখলাম সূর্যের অতিকায়-ভৃত্যরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলছে। এদের ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় পাঁচ থেকে দশগুণ বেশী, ওজনে শত শত গুণ ভারী। এদের দেহের উপাদান মূলতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। যে কোন কারণেই হোক, পৃথিবী ও সূর্যের নিকট গ্রহগুলিতে এসকল পদার্থের প্রাচুর্য নেই।

বৃহস্পতির সামনে এসে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় ১১ গুণ বড় এবং পৃথিবীর তুলনায় ৩১৮ গুণ ভারী। এর অভিকর্ষের টান এত প্রবল যে, আদি বাষ্পমণ্ডলে যে সকল গ্যাস নিয়ে তার জন্ম হয়েছিল, আজ এতদিন পরেও তা অপরিবর্তিত রয়েছে। এমনকি, সর্বাপেক্ষা হালকা হাইড্রোজেন হিলিয়ামও পালিয়ে যেতে পারে নি। পৃথিবীর আদি বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন শুধু একক হিসাবেই ছিল না, মিশ্র পদার্থরূপেও—যেমন, এ্যামোনিয়া, মিথেন ও জলীয় বাষ্প—ছিল এবং পৃথিবীতে জীবন বিকাশের ব্যাপারে এগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও ছিল।

পৃথিবীর জীবন-বিবর্তনের ব্যাপারে তাদের গুরুত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং দীর্ঘকাল আগেই তারা পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহে আজও তারা রয়ে গিয়েছে। অতএব স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে, এই অতিকায় গ্রহটি জীবন বিকাশের পথে অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায় শুরু করেছে কি? এই সহজ প্রশ্নটির কোন সহজ জবাব কেউ দিতে পারেন না। বৃহস্পতির দিকে তাকিয়ে বার বার প্রশ্ন করলাম। কোন জবাব নেই।

শুধু দেখে নিলাম ও জেনে নিলাম, তরল হাইড্রোজেনের এক অতিকায় গোলাকার দেহ আপন মেরুদণ্ডের ওপর প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছে এবং সেভাবেই সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। আরও দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর মতো কোন কঠিন কাঠামো তার দেহে নেই। হাজার

হাজার মাইল উঁচু গ্যাসপুঞ্জের নিচে ওই তরল হাইড্রোজেন সাগরের প্রায় ২৫ হাজার মাইল স্থান জুড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ঝড় বয়ে চলেছে। কোন কোন সময় সে ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪ শত কিলোমিটার পর্যন্ত বেড়ে যায়। বৃহস্পতির উর্ধ্বতন বাষ্পমণ্ডলে শতকরা ৮২ ভাগ রয়েছে হাইড্রোজেন, ১৭ ভাগ রয়েছে হিলিয়াম।

বৃহস্পতির দেহের অন্তর্কেন্দ্রে তাপমাত্রা রয়েছে ২৯,৭০০ ডিগ্রী—এই তাপমাত্রায় কোন কঠিন পদার্থ থাকতে পারে না।

বৃহস্পতি এক জটিল রহস্যের মতো রয়েছে সূর্যলোকে, যার সঙ্গে অন্য কোন গ্রহের কোন মিল নেই। বারটি উপগ্রহ নিয়ে সে আপন এক 'রাজ্য' সৃষ্টি করে বসে আছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সৌর লোকের অভ্যন্তরে বৃহস্পতি আর একটি "ক্ষুদে সৌরলোকের" অধীশ্বর।

প্লুটোর আকাশে

সূর্য মণ্ডলের প্রান্তিক প্রহরী প্লুটো। যদিও প্রায় ৫০ বছর আগে গ্রহটি আবিষ্কৃত হল, তথাপি প্লুটো সম্পর্কে আজও অনেক কিছুই অজানা। আপন কক্ষপথে সে যখন সূর্য থেকে দূরতম স্থানে পৌঁছায় তখন দূরত্ব ৪ শত কোটি মাইল। আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রায় পৃথিবীর মতোই। কিন্তু সে এতদূরে রয়েছে যে সূর্যের আলো ও তাপের অতি সামান্য অংশই প্লুটোর গায়ে লাগে। আমি এক চিরশীতল রাজ্যের সীমানায় এসে গিয়েছি। এখানে এই প্রান্তিক রাজ্যে এসে আমি সমগ্র সূর্যমণ্ডলের আয়তনটি একবার বুঝে নিতে চেষ্টা করছি। কত বড় এই সূর্য সাম্রাজ্য? একটু ঘুরপথে তার জবাব দেওয়া যেতে পারে। একটি আলোক রশ্মি সূর্য থেকে পৃথিবীতে পৌঁছুতে লাগে ৮ মিনিট—এই একই গতিতে সূর্যমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেতে আলোকরশ্মির লাগবে ৬ ঘণ্টা। এই মাপে সূর্যমণ্ডলের ব্যাস হচ্ছে ১২ শত কোটি কিলোমিটার। কিন্তু, এটাই সূর্য-সাম্রাজ্যের

বিশালতার অভ্রান্ত পরিচয় নয়। সে পরিচয় আসছে একটু পরেই। এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি সূর্য—কয়েকটি গ্রহ ও উপগ্রহ, উল্কা এবং সময়ে অসময়ে কয়েকটি ধূমকেতু ছাড়া এই বিরাট সাম্রাজ্যে আর কিছু নেই। এক অপরিসীম শূন্যতার রাজ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু, তাও প্রতি ঘনফুটে মাত্র দুটি-একটি। আর কিছু নেই।

মহাজাগতিক হিমলোকের দিকে

প্লুটো প্রদক্ষিণ শেষ করে আমি চলে যাচ্ছি এক হিম ও অন্ধকার রাজ্যে। ডাচ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ উর্‌ট্ (Oort) যাকে নাম দিয়েছেন Cosmic cold storage, বা, মহাজাগতিক হিম-ঘর। এ এক বেওয়ারিশ অঞ্চল-একাধিক আলোকবর্ষ যার ব্যাপ্তি। এক আলোকবর্ষ হচ্ছে ৫.৮৮০,০০০,০০০,০০০ মাইল অথবা সহজ কথায় ৬০ হাজার কোটি মাইল। সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে এক বছর ছুটে চললে এই দূরত্ব অতিক্রম করা হয়। মহাজাগতিক হিম ঘরে যেমন সূর্যের আলো পৌঁছয় না, তেমন সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্র আলফা সেনটুরির আলোও পৌঁছয় না। পৃথিবীর কোন শীতলতা বা, কোন অন্ধকার দিয়ে এই পরিমাপ চলে না।

'প্লুটোকে' ছাড়িয়ে এসে এক অতি বিস্তীর্ণ কক্ষপথে আমি সূর্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করছি। আমার সামনে পৃথিবী মুছে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছি একমাত্র সূর্যকে। এখান থেকে মহাজাগতিক হিমলোক থেকে সূর্যকে একটি আলপিনের মতো দেখাচ্ছে।

কিন্তু এই হিমরাজ্য জুড়ে অসংখ্য ধূমকেতু, অন্ধকারের মধ্যেও তাদের গভীরতর কৃষ্ণবর্ণ চেহারাগুলি আমার সামনে ছুটে চলছে। কী অভিশপ্ত এই ধূমকেতুরা! ওরা চেয়েছিল সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান হতে, পারেনি। প্রথম ব্যর্থতার পর তারা চেয়েছিল অন্ততঃ গ্রহরূপে

মহাকাশে ভেসে থাকতে, তাও পারল না। সেখানেও ব্যর্থতা! যে সকল আদি বস্তু নিয়ে গ্রহগুলি গড়ে উঠেছে, তা দিয়েই ওদের দেহও গড়ে উঠেছে। কিন্তু, এমনই ব্যর্থতায় ভরা ওদের জীবন যে ওরা নির্বাসিত হল মহাজাগতিক হিমলোকে। কুয়াশার মধ্যে মোষগুলি যেমন এক ছায়াময় অস্তিত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক সেভাবেই ওদের জীবন চলছে। অনন্তকাল ধরে ওরা সূর্য প্রদক্ষিণ করছে—। মহাজাগতিক এসকল ক্রীতদাসের সংখ্যা কত? বিজ্ঞানী উরটের হিসাব $১০^{১৯}$ — ১০ এর ১৯ ঘাত। সূর্য প্রদক্ষিণ করতে করতে ধূমকেতুরা অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে সূর্য মণ্ডলে, সূর্যের অভিকর্ষ বন্ধনে বাঁধা পড়ে তারা উপবৃত্ত পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। প্রদক্ষিণ করতে করতে তারা ধীরে ধীরে সূর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রতিবারেই আপন দেহের কিছুটা আকাশে উল্কারূপে ছড়িয়ে দিয়ে আবার হিমলোক বেষ্টন করে চলে যায়। এটাই তাদের বিধিলিপি—। তারপর একদিন নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে তারা সূর্যের অগ্নিমুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ক্রীতদাস জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়। আবার কারও কারও এমন সৌভাগ্যও ঘটে—সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে তারা বৃহস্পতির আকাশে চলে যায়। বিপুলদেহ বৃহস্পতি তাদের কাছে টেনে নিয়ে পরমুহূর্তে বৃহত্তর উপ-বৃত্ত পথে তাদের ঠেলে দেয় ছায়াপথের দিকে। হিমলোক থেকে মুক্তি পেয়ে তারা ছায়াপথের কোথায় চলে যায়, কেউ জানে না।

আমার এক পাশে সূর্য, অন্য পাশে আর এক নক্ষত্র 'আলফা-সেনটুরি—'। মধ্যবর্তী এই অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যে সংখ্যাতীত ধূমকেতু সূর্যের বন্ধনেই বাঁধা রয়েছে। 'আলফা-সেনটুরি' চাইছে ধূমকেতুদের টেনে নিতে, দুই এক ক্ষেত্রে তার চেষ্টা সফলও হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ধূমকেতু এতদূরে ও সূর্যের বজ্রবন্ধনে বাঁধা রয়েছে। বাঁধা থাকবে অনন্ত কাল, অন্ততঃ যতদিন না সূর্যের মৃত্যু ঘটছে। রাজার রাজ্যের

সুযোগ নিয়ে বন্ধনমুক্ত ধূমকেতুরা কে কোথায় চলে যাবে, কেউ বলতে পারে না।

অতএব, *সূর্য-সাম্রাজ্যের আয়তনের যে হিসাব ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে, তার সংশোধন প্রয়োজন। কেননা, মহাজাগতিক হিমলোকও তারই সাম্রাজ্যের অধীন। এই হিমলোকসহ হিসাব করলে সৌর মণ্ডলের ব্যাস হচ্ছে ১,০০০,০০০,০০০,০০০ কিলোমিটার। একটি আলোকরশ্মি চল্লিশ দিনে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। অতএব সৌরমণ্ডলের diameter. বা, ব্যাস হচ্ছে এক আলোক-মাসেরও বেশী।

সূর্য এত দীর্ঘায়ু পেল কি করে?

সূর্যদর্শন শেষ করে আমি মহাজাগতিক হিমলোকের দিকে ছুটে যাচ্ছি—কিন্তু, বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটে নি। কী ঘটছে ওই সূর্যদেহে যার ফলে এত তাপ, এত আলো বিকিরণ করেও সে ফতুর হচ্ছে না। কী সেই যাদু মন্ত্র যা সূর্যকে অন্ততঃ সভ্যতার ইতিহাসের কয়েক হাজার বছর ধরে প্রায় সমানই শক্তিশালী রেখেছে—?

এই প্রশ্নের জবাব খোঁজা হল প্রায় দু শতাব্দী ধরে এবং অবশেষে পার্থিব পরমাণুর জীবনের মতই ওই অপার্থিব প্রশ্নের জবাব মিলেছে। বাস্তবিক, মহাকাশের সহস্রকোটি নক্ষত্রের তেজ ও দীপ্তির ইতিহাসও একই ছকে বাঁধা রয়েছে।

প্রথমে মনে করা হত, কয়লার উনুন জ্বালাবার মতো একটা কিছু ব্যাপার ঘটছে সেখানে। অথবা, অন্য কিছু জ্বালানীও হতে পারে। কিন্তু, সন্দেহ দেখা দিল মজুত কয়লার হিসাব নিয়ে—যে পরিমাণ আলো ও তাপ সূর্য বিকিরণ করছে, সেই হিসাবটি সামনে রেখে দেখা গেল এ হারে খরচ হলে সূর্যের তিন চার শত বছরের বেশী বেঁচে

থাকা সম্ভবপর নয়। অথচ, এতে, জানা কথা যে সূর্য আরও অনেক বেশী দিন ধরেই পৃথিবীর আকাশে রয়েছে। বাতিল হয়ে গেল ওই তত্ত্ব।

ওই তত্ত্বের শূন্য স্থানটি কিছুকালের জন্য দখল করে রইল উল্কা-তত্ত্ব। বলা হল, এই আগুন ও আলো বিতরণ করতে গিয়ে সূর্য দেহের যা ক্ষয় হচ্ছে, উল্কা-পিণ্ডরাই তা ক্রমাগত পূরণ করে চলেছে। কিন্তু, এখানেও এক জটিল সংকট। বর্ষিত উল্কার পরিমাণ সারা বছর এক হতে পারে না। যদি কোন সময়ে উল্কাপাতের পরিমাণ বেড়ে যায় তবে সূর্যের 'ভর' বেড়ে যাবে—অর্থাৎ সূর্যের দেহটি আরও ভারী হয়ে উঠবে। এই সম্ভাবনার পরিণতি হিসাবে পৃথিবীর ওপর টান বেশী পড়বে এবং কক্ষপথে পৃথিবীর বিচরণের গতি বেড়ে যাবে। বছরটি ৩৬৫ দিনে শেষ না হয়ে, ধরা যাক, ৩০০ দিনেও শেষ হতে পারে। কিন্তু, শতাব্দীর পর শতাব্দীর হিসাব নিয়ে দেখা গেল, পৃথিবীর বার্ষিক গতির তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঘটেনি। অতএব, এটিও বাতিল হয়ে গেল।

অতঃপর অত্যন্ত স্বল্পায়ু একটি তত্ত্ব আসর জমিয়ে রাখল। বলা হল, সূর্য-সংকুচিত হচ্ছে,—এদের এই সংকোচনই সূর্যের তাপ ও আলোর উৎস। বাইরে থেকে মনে হল, তত্ত্বটি অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ। কিন্তু, অঙ্কের হিসাবে গরমিল ধরা পড়তেই তাও তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে গেল।

আপাতদৃষ্টিতে ক্ষয় ও ক্ষতির উর্ধ্বেই কি সূর্য এবং সমগ্রভাবে নক্ষত্র-জগৎ চিরকাল বেঁচে থাকবে? প্রশ্নটির জবাব পাওয়া গেল অন্য পথে, এই শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছরে পরমাণু বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির মধ্যে। ১৯১১ সালে Rutherford দেখিয়ে দিলেন, পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে একটি পারমাণবিক কেন্দ্রীন (nuclers), পরমাণুর সমগ্র ভরটি কার্যতঃ ওখানেই কেন্দ্রীভূত। কেন্দ্রীয়নকে

প্রদক্ষিণ করছে ইলেকট্রন—। কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যাচ্ছে,— তা ওই ইলেকট্রনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ারই ফলশ্রুতি।

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ চিত্র।

১৯১৩ সালে Niels Bohr উপহার দিলেন তাঁর বিখ্যাত পরমাণু মডেল। পরমাণুর অভ্যন্তরের নানা দৃশ্য দেখা গেল। দেখা গেল, ওই কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রন প্রচণ্ড শক্তিতে বাঁধা রয়েছে এবং তার তুলনায় ইলেকট্রনের সঙ্গে তাদের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। এটার নাম দেওয়া হল binding energy বা বন্ধন-শক্তি। এ অবস্থায় ওই বন্ধন যদি ছিন্ন করা যায়, অথবা, কেন্দ্রীনকে আরও ক্ষুদ্রাংশে ভেঙ্গে দেওয়া যায়, তবে এই বন্ধন-শক্তি পালিয়ে যাবে: অথবা, মুক্তি পাবে। আবার অপর কোন কোন অবস্থায় এই কেন্দ্রীন অন্য কেন্দ্রীনের সংগে যুক্ত হবে।

ভর ও শক্তির তুল্যতা।

কিন্তু, প্রশ্ন এই যে, এই বন্ধন-শক্তি এল কোথা থেকে? পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি অভ্রান্ত বিধান রয়েছে যাতে বলা হয়েছে শক্তি (Energy) সৃষ্টিও করা যায় না বা, ধ্বংসও করা যায় না। তার রূপান্তরটুকুই আমরা করতে পারি। শক্তি-বিজ্ঞানের সেটাই মূল কথা। তবে, এই বন্ধন-শক্তি এল কোথা থেকে? এর জবাব রয়েছে বিশেষ আপেক্ষিক-তত্ত্বের পঞ্চম সমীকরণের মধ্যে; $E = mc^2$। (e = শক্তি, m = ভর এবং c = আলোকের গতি)। আসলে এই সমীকরণে বলা হচ্ছে, কেন্দ্রীন যে বন্ধন-শক্তিকে মুক্ত করে দিচ্ছে, তা তার আপন দেহের খানিকটা বিলুপ্ত করে দিয়েই।

কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিট্রনের যে বিন্যাস রয়েছে তার পরিবর্তন সাধনকেই বলা হয়, পরমাণবিক বিক্রিয়া বা nucle reaction।

তত্ত্বের দিক থেকে পরমাণু বোমা, পরমাণু চুল্লী এবং হাইড্রোজেন বোমার মূলগত সত্য ওই সমীকরণের মধ্যেই লুকানো রয়েছে। আইনস্টাইন অপর একটি কথাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন—'ভর' (mass) বলে যার পরিচয়, আসলে, সে শক্তি বা, energy-রই "ঘনীভূত রূপ"।

আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার মাইল—সংখ্যাটি বিরাট—কিন্তু c^2 হবে আরও বিরাট। অতএব দেখা যাচ্ছে অতি সামান্য পরিমাণ 'ভর' ও বিপুল পরিমাণ শক্তির তুল্য মূল্য। দেখা যাচ্ছে এক গ্রাম 'ভর' নিজের মধ্যে ২১,৫০০,০০০,০০০ কিলো ক্যালরি শক্তি লুকিয়ে রেখেছে। 'ভর' কে যখন আমরা নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত করি, তখনই এই বিপুল পরিমাণ শক্তি আমাদের হাতে আসে। নাগাশাকির বিস্ফোরিত পরমাণু বোমার মাত্র এক শত গ্রাম 'ভর' বিলুপ্ত করতে হয়েছিল।

আসলে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা হাতে আসার বহুদিন আগেই তার সম্ভাবনাদি বিজ্ঞানীরা জানতেন। সূর্য-দেহে যুগপৎ পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ চলছে। প্রথমটি পারমাণবিক বিক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি তাপ-পারমাণবিক। এই পারমাণবিক-তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলেই বিপুল পরিমাণ আলো ও তাপ বেরিয়ে আসছে আপন দেহের খানিকটা বস্তু সত্তা নিশ্চিহ্ন শেষ করে দিয়ে সে আমাদের শক্তি-সত্তা উপহার দিচ্ছে—যার সহজ নাম হচ্ছে আলো ও উত্তাপ।

প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য তার দেহের ওজন ৪৬ লক্ষ টন কমিয়ে ফেলছে—তাপ ও আলো হিসাবে তার এক অতি নগণ্য ভগ্নাংশ পৃথিবীর কাজে লাগে। বৃহৎ অংশই মহাকাশে ছিটিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এল ১৯৩৮ সাল। Bethe ও Weizsacker সূর্য-গহ্বরের চুল্লিটির আরও সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক বিবরণ উপহার দিলেন। দেখিয়ে দিলেন সূর্যের এবং সমগ্র-

ভাবে প্রতিটি নক্ষত্রের দেহাভ্যন্তরে পরমাণুর সংযোজন (fusion) চলছে। এবং চারটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন (৪ টি প্রোটন) সংযোজিত হয়ে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রীন (২ টি প্রোটন + ২টি নিউট্রন) গড়ে উঠছে। যেহেতু হিলিয়াম কেন্দ্রীনের 'ভর' ৪টি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের সম্মিলিত 'ভর'-এর তুলনায় অনেক কম, সেজন্যই প্রশ্ন উঠতে পারে ওই 'ভর' গেল কোথায়? জবাব, সে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আলো উত্তাপ, বেতার তরঙ্গের মধ্যে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এত কথা বলার পরে একথা সত্য হয়ে রইল, যে সূর্য নিজেকে ক্ষয় করেই এই শক্তি যোগাচ্ছে, অথবা একথাও বলা যায়, সূর্য নিজেকেই ক্ষয় করে ফেলছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, এক শত কোটি বছরে সূর্য তার দেহের শতকরা এক ভাগ খেয়ে ফেলবে। অন্য যে সকল ক্ষয় ক্ষতি ঘটছে, সেগুলি হিসাব করে মোটামুটি একথা বলা যায়, ১৫০০ কোটি থেকে ৩ হাজার কোটি বছরের মধ্যে সূর্য আকাশ থেকে মুছে যাবে।

আমি সূর্য সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অন্ধকার রাজ্যের দিকে ছুটে যাচ্ছি, আর ভাবছি, ১৫০০ কোটি বছর! সেও অনেক! কিন্তু, সেদিন পৃথিবীও মুছে যাবে। না, পৃথিবী মুছে যাবে না, মুছে যাবে পৃথিবীর জীবন।

বিদায় সূর্যলোক, বিদায়!

সূর্য থেকে ৩৬০ কোটি মাইলেরও বেশী দূরবর্তী এই মহাজাগতিক হিমলোকে থেকে আমি অনন্তকাল সূর্য প্রদক্ষিণ করে কাটাতে পারি। আমার এক পাশে সূর্য, অন্যপাশে আর এক মাঝারি গোছের নক্ষত্র, নাম যার "আল্‌ফা-সেনটুরি" বা আল্‌ফা "মহিষাসুর"—। উভয়ের অভিকর্ষ-টান এখানে এত দুর্বল যে ওরা কেউ আমাকে টেনে নিতে পারে না।

দুই বিরাট সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী এই বে-ওয়ারিশ অঞ্চলে কেউ

আমার গায়ে হাত দিতে পারে না। সেদিক থেকে, এটা আমার এক মুক্ত জীবন সর্বপ্রকার শাসন ও শৃঙ্খলের বাইরে আমি চলে এসেছি।

সূর্য-সাম্রাজ্য বেষ্টন করে একাধিক আলোকবর্ষ জুড়ে যে হিমলোক রয়েছে, সেখান থেকে আপনারা এই বেতার-ভাষণ শুনেছেন।

"মহাজাগতিক হিমলোকে" থেকে আমি বিরামহীন সূর্য সাম্রাজ্য প্রদক্ষিণ করছি। আচ্ছা, এমনটি যদি হয়, সূর্যের অভিকর্ষ আমাকে টেনে নিল। তবে, আমি আবার হাজির হব সূর্যের সামনে, ধূমকেতুদের মতো উপ-বৃত্ত, বা অধিবৃত্ত পথে সূর্য প্রদক্ষিণ করে চলব। পৃথিবীর কত লক্ষ, বা, কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে—আমি বার বার সূর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। প্রতিবারেই সূর্যের আরও নিকটবর্তী হ'ব। এবং অবশেষে নির্বাসিত ও অভিশপ্ত ধূমকেতুদেরই মতো সূর্য-গহ্বরে প্রবেশ করে এই অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটাব।

আর এমনও হতে পারে: ওপাশের নক্ষত্র আল্ফা-মহিষাসুরের দিকে আমি একটু ঝুঁকে পড়লাম। সে অবস্থায় আমি চলে যাব ছায়াপথের দিকে। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য-প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথের দিকে।

সেদিক থেকে আমাকে ইশারায় ডাকছে আল্ফা মহিষাসুর (৪.২৯ আলোকবর্ষ), বারনারড (৫.৯৭); উলফ ৩৫৯ (৭.৭৪) লুব্ধক, বা সিরিয়াস (৮.৭) ৬১ সিগনি (১১.১) প্রকিয়ন (প্রশ্বা) —১১.৩; কাপতিন (১২.৭) ভান ম্যানেন (১৩.২) Altair (১৫.৭) শহরের রাজপথে আলোক স্তম্ভগুলি যে ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক সে ভাবেই মহাকাশের শূন্যতায় নির্দিষ্ট ব্যবধানে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রগুলি আমাকে প্রলুব্ধ করছে' ইশারায় বলছে: 'এসো চলে এসো'। লুব্ধক তার মহান সৌন্দর্যে আরও লোভনীয়, প্রশ্বা স্তিমিত গৌরবে লজ্জাবতী।

অপরপাশে সূর্য সাম্রাজ্য। নিজের অজ্ঞাতেই সেদিকে তাকালাম। কিন্তু কোথায় সেই তেজোদীপ্ত রাজ পুরুষ? সে একটি নগণ্য আলোক-বিন্দু মাত্র। আর, আমার পৃথিবী? সে যে কোথায় কোন দিকে ছিল, বুঝবার কোন উপায় নেই। নিশ্চিহ্ন সে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবু, বার বার সেদিকেই তাকাই। নেই, সে কোথাও নেই—।

সূর্য-সাম্রাজ্য প্রদক্ষিণ করছি। কত সহস্র কোটি বছর ধরে ব্রহ্মাণ্ডের এই বিবর্তনের ইতিহাসটি যেন আমার সামনে ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। হায় রে, কোন সূক্ষ্মতম অস্তিত্বে ব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম কোন এক কোণে দাঁড়িয়ে আমি যদি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি দেখতে পারতাম কাল-প্রবাহের সেই উৎস-মুখ। সেদিন সূর্য বা কোন নক্ষত্রের জন্ম হয় নি। গ্রহমণ্ডলও নয়। অসীম শূন্যতার মধ্যে নীহারিকা বা তারকাপুঞ্জও ভেসে ওঠে নি। মহাকাশ-মহাকাল জুড়ে অন্তহীন শূন্যতা, সেই শূন্যতার গভীর কৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম কণিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবর্ণনীয় শীতলতার মধ্যে সেই গ্যাসীয় অস্তিত্ব জমাট বেঁধে রূপ পেল নীহারিকায়—সহস্র কোটি নক্ষত্রের সম্ভাবনা নিয়ে নীহারিকা আরও কত শত কোটি বছর কাটিয়ে দিল। তারপর অকস্মাৎ আর এক ঘটনা উদ্দেশ্যহীন, উদভ্রান্ত হাইড্রোজেন হিলিয়াম পরমাণু—তার ক্ষুদ্র ও নগণ্য অভিকর্ষ দিয়ে টেনে নিল আর একটি পরমাণুকে। ভর একটু বেড়ে গেল, দুজনের মিলিত শক্তি টেনে নিতে শুরু করল অন্যান্য পরমাণুদের সৃষ্টি হ'ল একটি পিণ্ড। সেই পিণ্ড আবার টেনে নিতে শুরু করল অন্য পরমাণুদের। সৃষ্টি হল একটি প্রবাহ, একটি আলোড়ন। নক্ষত্র ভ্রূণ অন্ধকারের মধ্যেই অন্যান্য বস্তু হাতড়ে বেড়াতে শুরু করল। শুরু হল প্রচণ্ড আলোড়ন। তাপ-প্রবাহ। এ পর্যন্ত ছিল শুধু অভিকর্ষের ভূমিকা। সেই অভিকর্ষই এখন হাইড্রোজেন

পরমাণুর আগুন জ্বালিয়ে দিল। তখনও গভীর অন্ধকারের মধ্যে নীলবর্ণ নক্ষত্রশিশু যেন হা করে আকাশের সমস্ত কিছু গিলতে শুরু করল।

বহু আলোক-বর্ষ বিস্তৃত স্থান জুড়ে এক একটি গ্যাসের স্তূপে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে গ্যাসগুলি জমাট বাঁধতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, অভিকর্ষের নিয়মে তারা প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হতেও লাগল।

মেঘস্তূপে জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে যেভাবে বৃষ্টিরূপে নেমে আসে, ঠিক সে ভাবেই একটি গ্যাসপুঞ্জে যুগপৎ সহস্র কোটি নক্ষত্রের জন্ম হয়। একটি মেঘ থেকে যেমন কখনো একটি বা দুটি ফোঁটা পড়ে ওঠে না,—ঠিক তেমনই একটি গ্যাসপুঞ্জ থেকে কখনও একটি বা দুটি নক্ষত্রের জন্ম হয় না।

সেদিন যদি ব্রহ্মাণ্ডের কোন সুদূরতম প্রান্তে দাঁড়াতে পারতাম তবে দেখে নিতাম অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে সহস্র কোটি নীল নক্ষত্রের ফুল যুগপৎ ফুটে উঠল। শুধু তাই নয়, এও দেখতে পেতাম, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তারা স্ফীতদেহ হয়ে শুধু একে অন্যের দিকে হাত বাড়িয়েই ক্ষান্ত হল না,—মহাকাশকে তারা প্রায় ঢেকেও ফেলল। জন্ম মুহূর্তে তাদের সকলের প্রায় একই চেহারা, একই প্রকৃতি। হাসপাতালের "বেবি রুমে" যেমন ভাবীকালের দেবতা ও দানব, কবি, দার্শনিক ও পকেটমার—এক সঙ্গেই শুয়ে থাকে। এও অনেকটা তাই। ভাবীকালের বিস্ময়কর বৈচিত্রের কোন আভাষই ও সকল শিশু চরিত্রে থাকে না, তেমনই শিশু নক্ষত্রকে দেখেও বুঝে নেবার কোন উপায় নেই কে ভাবীকালে দানব হবে, অথবা কে ভাবীকালে একটি অনুজ্জ্বল ও রিকেট নক্ষত্র হবে, বুঝবার কোন উপায় থাকে না।

কিন্তু সব নক্ষত্রই চেষ্টা করে অমিত জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠতে। যারা পারল, তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্যাস ও ধূলিকণা আত্মস্থ করে

নিল। যারা অনেক দূরে পড়ে রইল, তারা মহাকাশের শীতলতায় জমাট বেঁধে গ্রহরূপে গড়ে উঠল। কিন্তু, মহারথী নক্ষত্রদের অভিকর্ষ-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারল না।

যাদের মূলধন কম, গ্রহের মর্যাদাও যারা পেল না, তারা আদি বস্তু পিণ্ডরূপে নিক্ষিপ্ত হল মহাজগতের এই হিমঘরে। ধূমকেতুরূপেই তাদের পরিচয়।

পৃথিবীর জন্ম-বৃত্তান্তের কাহিনী পড়ছি—

মহাজাগতিক হিমলোকের এই ধূমকেতুর রাজ্য থেকে আমি সূর্য-সাম্রাজ্য প্রদক্ষিণ করে চলছি। সূর্য ও পৃথিবীর জন্ম-বৃত্তান্তের সেই মহাভারতের একটিব পব একটি পৃষ্ঠা আমার সামনে খুলে যাচ্ছে।

ব্রহ্মাণ্ডের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশে আরও নক্ষত্র ভেসে উঠতে শুরু করল। ৪৫০ কোটি বছর আগে ছায়াপথের এক নক্ষত্র-কিরণ প্রান্তদেশে আদি হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম কণিকা জড়ো হয়ে সৃষ্টি করল সূর্যকে। সূর্যের সঙ্গে একই সময়ে জন্ম নিয়েছে, এমন নক্ষত্রের সংখ্যাও কম নয়। আজও ছায়াপথের প্রান্তে, অথবা কেন্দ্রস্থলে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে।

কিন্তু, সূর্য সেদিন এককভাবে জন্মায়নি। একই সময়ে অনেকগুলি সূর্য (নক্ষত্র) জন্ম নিয়েছে। জন্ম নিয়েছে ঝাঁকে ঝাকে। মহাকাশ-মহাভারতের দ্বিতীয় অধ্যায়। সূর্যের জন্মদিনে যদি তার সামনে দাঁড়াতে পারতাম, তবে দেখতে পেতাম, দূরের এই 'আলফা' মহিষাসুর, বারনার্ড ও প্রশ্বার মতোই আরও দশ সহস্রাধিক নীল নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে আমাদের ছায়াপথের একটি নক্ষত্র বিরল বাহুতে।

এদের মধ্যে যে কোন কারণেই হোক, দু-একটি 'নব তারা', বা 'নোভা'ও জন্ম নিয়েছে। আসলে এরা মোটেই নব তারা নয়, কিন্তু

যেহেতু প্রাচীন যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এদের দেখে আকাশে নতুন তারার আবির্ভাব হয়েছে বলে মনে করেছিলেন, সেজন্যই আজও ওদের পরিচয় 'নব-তারা' রূপেই।

এ সকল 'নব-তাবার' মৃত্যু ঘটে, বলতে গেলে আঁতুড় ঘরেই—অবশ্য, মহাজাগতিক সময়ের হিসাবে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ওরা এমন প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত ও আবর্তিত হতে থাকে যে, ভারসাম্য নষ্ট হয়ে তারা শত সহস্র বা লক্ষ খণ্ডে বিস্ফোবিত হয়ে যায়।

সূর্য-কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়। সূর্য সেই অকাল-মৃত নক্ষত্রেব দেহের অংশগুলির যতটা পারে আত্মস্থ করে নিয়ে আরও স্ফীতদেহ হয়ে উঠল। যে সকল অংশের নাগাল পেল না, সেগুলিকে সে ঠেলে দিল অনেক দূরে। সেখানকার শীতলতায় তারা গ্রহরূপে গড়ে উঠল। পৃথিবীর হাড়-মাস সব কিছুই এসেছে সেই 'নব-তারা থেকে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, এক হতভাগ্য নক্ষত্রের স্বপ্ন দিয়ে শুধু এই পৃথিবী নয়, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, অর্থাৎ সব ক'টি গ্রহের জন্ম কাহিনী বচিত হলো।

এখনও সূর্য তাব অনাবৃত দীপ্তি নিয়ে আকাশে ওঠে নি। তার আলো তখনও এত ক্ষীণ যে পৃথিবীতে এসে পৌছায় নি।

মহাকাশের কোন দূরতম প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেদিন যদি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পারতাম, তবে দেখতাম, ওই অভিশপ্ত নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে মুহূর্তের জন্য লক্ষাধিক আলোক-বর্ষে বিস্তৃত ছায়াপথে দূঢ়তম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর আকাশে প্রথম সূর্যোদয়ের আগে বহু লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীকে কাটাতে হয়েছে মহাকাশের অন্ধকারে; শীতলতায়। অন্ধকারের মধ্যেই পৃথিবীর জন্ম এবং অন্ধকারের মধ্যেই একদা পৃথিবীর মৃত্যু।

মহাকাশ-মহাভারতের এই অধ্যায়টি পড়ে মাত্র শেষ করেছি।

ইতিমধ্যে কতবার যে আমি সূর্য-সাম্রাজ্য প্রদক্ষিণ শেষ করেছি, তার কোন হিসেব নেই। ওদিকে, আলফা মহিষাসুর আমাকে ডাকছে। ইঙ্গিতে, আভাসে বলছে: চলে এসো এদিকে। আমি তোমাকে অনন্ত ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাব, যা কিছু দেখতে চাও, তাও দেখাব। চলে এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়ালাম। গতি বৃদ্ধিকারী রকেটের সুইচটির সামনে দাঁড়ালাম। রকেটের গতি যদি সেকেণ্ডে মাত্র ৭ মাইল বাড়িয়ে দিই, তবে সূর্যালোকের অভিকর্ষ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে "আলফা-মহিষাসুরের" আকাশে।

সুইচের ওপর হাত রাখলাম। পেছনে পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকাই। মায়াকারী বোধ হয়, পেছন থেকে আমাকে ডাকছে। কিন্তু কোথায় আমার পৃথিবী? তার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। এমন কি, সূর্যকেও একটি পিণ্ডের মাথার মতো দেখাচ্ছে।

না, আর কোন কথা নয়। সজোরে সুইচটি টিপে ধরলাম। ডায়েলটি ঘুরে ঘুরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় এসে দাঁড়াল।

সূর্যলোক থেকে বিদায়। আমি অন্য এক নক্ষত্রলোকে প্রবেশ করছি। পৃথিবী মুছে গিয়েছে অনেক আগেই। এবার সূর্যও মুছে গেল।

আলফা-সেনটুরি বা আলফা-মহিষাসুরের রাজ্যে—

'আলফা-সেনটুরি' বা 'আলফা-মহিষাসুর'। আমি মহিষাসুরের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কেন তার এই নাম? বুঝলাম না। মহিষাসুর, বারনার্ড, লুব্ধক ও প্রশ্বা—রাজপথের আলোকস্তম্ভের মতো ওরা নির্দিষ্ট আলোক-বর্ষের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।— আলফা-মহিষাসুর পীতবর্ণ—কিন্তু আরও সামনের দিকে তাকিয়ে কত বিচিত্র বর্ণের নক্ষত্র দেখছি। রামধনুর সপ্ত বর্ণের সব কয়টি বর্ণের

নক্ষত্রই যেন আমাকে দেখে হেসে উঠল। আমি কি তবে আলোর উদ্যানে ঢুকে পড়েছি যেখানে নীল পদ্মের পাশেই শ্বেত পদ্ম— আবার শ্বেত-পদ্মকে ঘিরে অসংখ্য রক্তজবা,—সহস্র কোটি নক্ষত্র নিজেদের মধ্যে ওই সপ্তবর্ণ ভাগাভাগি করে নিয়েছে? বুঝতে পারলাম না। আমার চোখের সামনেই একটি নীলপদ্ম রক্তজবা হয়ে উঠল। এটাই তার জীবন-বিবর্তন। বক্তজবা ক্রমশঃ হরিদ্রাভ হয়ে ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। কেন? সহস্র কোটি আলোব মালা দুলছে। কিন্তু আমি দেখছি 'আলকা-মহিষাসুরকে'। তিনটি নক্ষত্রের একটি জোট। দুটি পীতবর্ণ, একটি রক্তবর্ণ। একটি মাত্র বাষ্পপুঞ্জ ও ধূলিকণা থেকে যুগপৎ তাদের জন্ম হয়েছিল। জন্মদিন থেকেই তারা পারস্পরিক অভিকর্ষেব টানে একে অন্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

'আলকা-সেনটুঁ' বা 'মহিষাসুবের' আকাশপথ দিয়ে রকেট ছুটে চলছে। গাত্রবর্ণ সূর্যের মতোই পীতাভ, গাত্র তাপও প্রায় তাই।

কনিষ্ঠের গাত্রে পীতবর্ণেব তীব্রতা কম। কনিষ্ঠতম বক্তবর্ণ, যেন খানিকটা ক্রোধান্বিত।

মেজ কর্তা ২০ লক্ষ মাইল দূরবর্তী কক্ষপথে বড় কর্তাকে প্রদক্ষিণ করছেন। আবার বড় কর্তাও প্রদক্ষিণ করছে মেজ কর্তাকে।

এই পারস্পরিক প্রদক্ষিণ শেষ হয় পৃথিবীর সময়ের মাপে ৮০ বছরে।

বড়দের এই পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময়েব মধ্যে থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছেন ছোটবাবু।

আকৃতির দিক থেকে মহাজাগতিক সংসারে তিনি নগণ্য। দুইয়ের জোট থেকে ১ শত কোটি মাইল দূরে দশ লক্ষ বছরে একবার বড় কর্তাদের প্রদক্ষিণ তিনি শেষ করে আসেন।

তিনটি নক্ষত্র মিলে আলকা 'মহিষাসুরের' যে জোট পড়ে উঠেছে

তাদের গ্রহ নেই, থাকতে পারেও না। কেন না, গ্রহরা কখন কোন্ শরীকের প্রজা হবেন, তার স্থিরতা নেই। যেই গ্রহটি বড় কর্তার প্রজারূপে, ধরা যাক, এক হাজার বছর ধরে নিজের পরিচয় দিয়ে এসেছে, সে অকস্মাৎ দেখা পেল মেজ কর্তার সংসারে ঢুকে পড়তে যাচ্ছে—। বড় কর্তা এই ব্যাপার কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না—তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে ওই প্রজাকে বেঁধে রাখতে যাবেন—মেজ কর্তাও নিশ্চয়ই ছাড়তে চাইবেন না—দুই নক্ষত্রের অভিকর্ষের টানে গ্রহটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে মিলিয়ে যাবে, তার অস্তিত্বই থাকবে না।

আলফা-মহিষাসুরের আকাশ অতিক্রম করে যাচ্ছি। তিন নক্ষত্রের এই জোট-বাঁধা তেমন ভাল লাগেনি। জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে ছায়াপথের সহস্র কোটি আলোর দ্বীপ ভাসছে—বিচিত্র বর্ণের সে সকল আলোর ইতিহাসও বিচিত্র।

যে সকল নক্ষত্র মহাজাগতিক সময়ের হিসাবে সবেমাত্র জন্ম নিয়েছে তারা নীলবর্ণ।

যারা প্রথম কৈশোরের উচ্ছলতায় দাপাদাপি করে চলেছে তারা বক্তজবা।

কৈশোর অতিক্রান্ত নক্ষত্ররা পীতবর্ণ। আবার যা প্রবীণ, অথবা যারা মৃত্যুশয্যায় তারা লোহিতবর্ণ।

যৌবনের উদ্দাম দীপ্তি নিয়ে যারা ধীর ও স্থির, তারা শ্বেতবর্ণ। অন্য ভাষায়, ওরা জ্বলন্ত ইস্পাতের মতো। মৃত্যুর পরে প্রাণহীন মৃতদেহগুলি কৃষ্ণবর্ণ;—কোন কোন সময়ে সামান্য শ্বেতাভ।

বারনার্ডের দিকে ছুটে চলেছি। আলফা-মহিষাসুরের পীতবর্ণ দুয়ের জোট দেখে বুঝতে পারলাম, ওরা সবেমাত্র কৈশোর অতিক্রম করেছে।

'আলফা-মহিষাসুরদের' সাম্রাজ্য থেকে চলে গেলাম 'বারনার্ডের'

আকাশে। একটি নিঃশব্দ নক্ষত্র—অন্য কারো সংগে সে কোনরূপ জোট বাঁধে নি। সূর্যলোক থেকে দূরত্ব ৬ (ছয়) আলোক-বর্ষ। আকৃতিতে সূর্যের চেয়ে ছোট,—প্রভা সূর্যের তুলনায় অনেক কম। সূর্যের বহিরঙ্গের তাপমাত্রা যেখানে ৬ হাজার ডিগ্রী (সেঃ) সেখানে বারনার্ডের তাপমাত্রা মাত্র সাড়ে চার হাজার ডিগ্রী। সূর্যের রঙ যেখানে পীতবর্ণ, সেখানে বারনার্ডের রঙ হচ্ছে ঈষৎ রক্তিমাভ।

নক্ষত্র-সমাজে প্রায় অপাংক্তেয় এই নিঃসঙ্গ তারকাটির আকাশে এসে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি ওর গ্রহদের। বারনার্ড ছোট ও নিষ্প্রভ—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ওর কাছে আমার প্রশ্নের শেষ নেই—। অনেকগুলি গ্রহ নিয়ে ওর সংসার। দুটি গ্রহ ত বৃহস্পতির সমান। একটি গ্রহ রয়েছে যা' আয়তনে পৃথিবীর সমান। এতগুলি গ্রহের কোন একটিতে কি জীবন শুরু হতে পারে না? সে সকল গ্রহের কি কোন সমুদ্র রয়েছে—অথবা, কোন গ্রহের বাষ্পমণ্ডলে কি নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ও অক্সিজেন—এক কথায়, জীবনসৃষ্টির উপাদানগুলি রয়েছে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন নিয়ে আমি দাঁড়ালাম বারনার্ডের সামনে। নিজের অজ্ঞাতেই চিৎকার করে উঠলাম, কে আছ ওখানে? বলে দাও, তোমার গ্রহে জীবনের কোন সূত্রপাত তুমি দেখেছ কিনা।

জীবন সন্ধানে মহাকাশে

বারনার্ডদের পর অনেকগুলি ছোট ও অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের দেখা মিলল। তাদের কথা আমি কিছুই বলছি না। তাদের দেখেও যেন দেখছি না। বারনার্ডকে একটু বেশী নজর দিয়ে দেখেছি এই কারণে যে সেখানে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কেউ আশা পোষণ করে থাকেন। সেজন্যই তার দিকে একটু ভাল করে তাকিয়েছি। পাইনি, কিছুই পাইনি। ষোলটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে 'লুব্ধক'। দীর্ঘপথ অপরিসীম শূন্যতা, বলবার মতো কিছুই নেই। অবসরটুকু আমি কাটাতে চাই জীবন নিয়ে নানা কথায়।

একটির পর একটি সূর্য-সাম্রাজ্য অতিক্রম করে চলেছি আমি,—(নক্ষত্ররাও এক একটি সূর্য) তাদের পৃথিবীগুলি (পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ) আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোথাও আমি জীবনের কিছুমাত্রও সন্ধান পাচ্ছি না। বারনার্ড নক্ষত্রের আঙিনা পার হয়ে আরও কত নক্ষত্রের আঙিনার পাশ দিয়ে চলে এলাম,—কিন্তু জীবনের সামান্য কলরবও আমি শুনতে পাচ্ছি না। বারবার বেতার সংকেত পাঠাচ্ছি ;—কিন্তু প্রতি-সংকেত নেই। আমার পাঠানো বেতার-তরঙ্গ মহাকাশের শূন্যতায় মিলিয়ে যাচ্ছে। রাডার দিয়ে চেষ্টা করলাম,—কিন্তু চড়াই-উৎরাই গভীর খাদ ছাড়া আর কিছু নেই—। প্রতিফলিত রাডার-তরঙ্গ বারবার সেই কাহিনীই বলছে।

প্রতিটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্রেরই গ্রহ দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু প্রাণের কোন আভাস নেই।

ইনফ্রা-রেডরশ্মি ছুঁড়ে মারলাম। তৃণ-গুল্ম বা সে ধরনের কিছু আছে কিনা, তা-ও আমি দেখতে চাইলাম।

কিন্তু জীবন বলতে আমরা কি বুঝি ?

জীবনের কোন সর্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নেই। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ জীবন সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ ধারণা নিয়েই চলেন।

যখনই অন্য গ্রহে জীবনের কথা বলা হয়, তখন অধিকাংশ মানুষ পৃথিবীর মানুষের মতোই একটা কিছু অনুমান করে নিয়ে থাকেন। এমনই অরণ্য, তরুলতা, এবং প্রাণিকুল। বিজ্ঞানীরা যখন বলে থাকেন, "অন্য গ্রহে জীবন থাকলেও থাকতে পারে"—তখন আমাদের মনের সামনে এমনই জীবন-ধাত্রী আর এক পৃথিবীর চিত্র ভেসে ওঠে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই অর্থে কথাটি কখনও ব্যবহার করেন না।

এমন অনেক মানুষ আমাদের মধ্যে রয়েছেন যাঁরা পোকা-মাকড়কেও জীবন বলতে অনিচ্ছুক—কেন না ওরা স্তন্যপায়ী নয়।

প্রজাতি সৃষ্টির জন্য যাদের যৌনক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না, তাদের জীবন বলে স্বীকার করে নিতেও কুণ্ঠার অবধি নেই। কিন্তু সমগ্র জীব জগতকে এক স্থানে জড়ো করতে পারলে দেখা যেত, সন্তান-সৃষ্টির জন্য যৌনক্রিয়া অতি অল্পক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। একটি মানবদেহে সদাচঞ্চল, সততঃ কর্মব্যস্ত কোষের সংখ্যা হচ্ছে আনুমানিক $১০^{১৪}$ অথবা দশের ১৪ ঘাত। মূল উৎসমুখে গিয়ে দেখা যাবে মানব-দেহের কোষ আর তরুলতা ও প্রাণিকুলের কোষের মধ্যে তেমন কিছুই পার্থক্য নেই—। তেমনই একটি বর্তুলাকার কেন্দ্রীনকে ঘিরে রয়েছে আর একটি বহু-বিচিত্র কর্মক্ষেত্র যার নাম দেওয়া হয়েছে Cytoplasm.

মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যাবে এক বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড,—পৃথিবীর কোন শিল্প-সংস্থায় এমন সুশৃঙ্খলা, এমন কর্মব্যস্ততা দেখা যাবে না। মুহূর্তে মুহূর্তে প্রোটিন সৃষ্টি হচ্ছে,—কেন্দ্রস্থলে বসে ডি এন এ নির্দেশ পাঠাচ্ছে—। আর এন এ সেই বার্তা নিয়ে চলে যাচ্ছে Cytoplasm এর ধারে—একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, অফ-ডে, বা ছুটি-ছাটার প্রশ্নই নেই। একটি কোষ তার প্রতিচ্ছবি হিসাবে আর একটি কোষ সৃষ্টি করছে। কেন্দ্র-শক্তি এরকম কয়েক কোটি নির্দেশ নিয়ে বসে আছে—কখন কোনটি জারি করতে হবে, সেটাও তার নখ-দর্পণে। আমরা বেঁচে আছি, কি মরে গিয়েছি, সে কথাটাই শুধু আমরা জানি—। কিন্তু, প্রতিটি কোষের ভেতরে থেকে যে মানুষের কোষকে মানুষ সৃষ্টি করতে বলছে, অথবা, বিড়ালের কোষকে বিড়াল সৃষ্টির নির্দেশ পাঠাচ্ছে, বলতে গেলে তাকে আমরা আজও ভাল করে চিনি না। মানুষ বা জীবজন্তুর ক্ষেত্রে যা সত্য, তরুলতার ক্ষেত্রেও তা সমানভাবেই সত্য।

গ্রহের পর গ্রহ যাচাই করে চলেছি। কোন সাড়াশব্দ নেই।

কেউ সংকোচে বা দম্ভভরে বলছে না,—"এই যে আমরা আছি"—।

ইতিমধ্যে আমি আর একবার ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের খোলা পাতাটি পড়ে নিচ্ছি। Sprectroscope আবিষ্কারের দিন থেকেই আমরা জেনে এসেছি, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র একই রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ প্রায় সম-হারে ছড়িয়ে আছে।

ওই যন্ত্রটি আমাকে বলে দিয়েছে এবং এখনও বলছে, ব্রহ্মাণ্ডের যেখানেই যাও না কেন, পৃথিবীতে যে সকল পদার্থের সঙ্গে তোমার নিত্য দিনের পরিচয়, তাই রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্রে, নীহারিকায় ও ছায়াপথে। সেই হাইড্রোজেন, লোহা, ক্যালসিয়াম কারবন—ইত্যাদি। মহাজগতে এমন একটি পদার্থ তুমি খুঁজে পাবে না যা তোমার পৃথিবীতে নেই—অথবা একথাও বলা যায়, তোমার দেহে, তোমার মুল ধমনীতে, মস্তিষ্ক-কোষে বা তোমার অন্ত্রে এমন একটি কণা পদার্থও নেই,—যা একদা অনন্ত আকাশে বিচরণ করে আসে নি।

মহাবিশ্ব পরিচয়ের সেই খোলা পাতাটিতে আরও রয়েছে: তোমার এই অভিযানে অসংখ্য নীহারিকার দেখা মিলবে। নীহারিকার দেহের দিকে তাকিয়ে যা দেখবে, তা একদিক থেকে পৃথিবীরই বায়ুমণ্ডল—সেই অক্সিজেন, নাইট্রোজেন,—হাইড্রোজেন এবং অন্য দু-একটি পদার্থ (জ্যোতির্বিজ্ঞানী Bowen-এর সিদ্ধান্ত)—।

রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের এককণাও তুমি দেখতে পাবে শত-কোটি আলোক-বর্ষ দূরের ছায়াপথেও—সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটে এসে যে আজ তোমার চক্ষুপটে আঘাত করল, সেও জ্বলন্ত লোহা, ক্যালসিয়াম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি কাহিনী নিয়েই এসেছে।

আনুপাতিক হারে তফাৎ থাকতে পারে তথাপি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র রাসায়নিক-গঠনের প্রকৃতি একই।

একটি গভীর নীলবর্ণ শিশু-নক্ষত্রের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছি। পৃথিবী থেকে দেখা যায় না, এমন কি পৃথিবীর অতি শক্তিশালী দূরবীনেও সে ধরা পড়ে না। ইচ্ছা হল ভাল করে তাকিয়ে থাকি। দেখে নিই।

কিন্তু মহাবিশ্ব পরিচয়ের খোলা পাতাটি আমাকে দুর্নিবারভাবে টানছে। কী করে পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটল, চারশত কোটি বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে সে লিখে রেখেছে সম্ভবতঃ চল্লিশটি বাক্যের মধ্যে। মহাকাশের অনন্ত শূন্যতায় ভাসমান হাইড্রোজেন রশ্মি-কণিকা কুড়িয়ে নিয়ে নক্ষত্র সৃষ্টি করল নিজেকে। তার অভ্যন্তরে এমন বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল, যা মানুষ হাইড্রোজেন বোমা তৈরির ক্ষেত্রে আয়ত্ত করেছে। সেই নক্ষত্র-চুল্লীতে অগ্নিজঠরে বহু সহস্র কোটি তাপমাত্রায় হাইড্রোজনের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীনযুক্ত হয়ে গড়ে তুললো হিলিয়াম, একই পদ্ধতিতে হিলিয়াম থোক বেরিলিয়াম—বেরিলিয়াম হিলিয়ামের কেন্দ্রীনকে আত্মস্থ করে গড়ে তুলল কারবন, কারবন থেকে অক্সিজেন—এ ভাবেই লোহা, সোনা এবং ইউরেনিয়াম।

একটি মৌলিক পদার্থ থেকে আর একটি মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির কালে কি ভাবে প্রোটন স্থানচ্যুত হয় এবং কী ভাবেই বা নিউট্রন সেখানে জাঁকিয়ে বসে আর একটি মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করে, সেই জটিল অথচ আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের কাহিনীর মতো রোমাঞ্চকর অধ্যায়টি আমি অনিচ্ছার সঙ্গেই এড়িয়ে যাচ্ছি।

সেই নক্ষত্র হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে গেল, তার অগ্নিজঠরের স্বর্ণ-দানা তাম্রকণিকা, ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য পদার্থ ছড়িয়ে পড়ল মহাকাশে। ওড়িশার তালচেরের ওপর দিয়ে কোনদিন পায়ে হেঁটে গিয়েছ কি? ওই তালচের ছিল একদিন দক্ষিণ মেরু মহাদেশে, ভেসে ভেসে চলে এসেছে হিমালয় বা শিবালিক পর্বতের ধারে। অতি ক্ষুদ্র গুল্ম-ফাসিলে সে কাহিনী লেখা রয়েছে। কিন্তু এক হাজার

কোটি বছর আগে সে ছিল কোথায়? ছিল মহাকাশে, বিস্ফোরিত নক্ষত্রের দেহাবশেষে। যদুগোড়ার ইউরেনিয়াম খনি বা মুসাবনীর তাম্র ভাণ্ডার? সেও সেই বস্তুস্তূপের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল।

সাধারণভাবে ব্রহ্মাণ্ডের গঠন-পদার্থ এবং পৃথিবীর গঠন-পদার্থের মাঝামাঝি রয়েছে জীবন-গঠনের পদার্থগুলি। ব্রহ্মাণ্ডে শতকরা ৯০ ভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে ৬ জাতের পরমাণু—হাইড্রোজেন (H) হিলিয়াম (He), কারবন (C), নাইট্রোজেন (N), অক্সিজেন (O) এবং নিয়ন (Ne)—সাধারণভাবে আপনার আমার জীবন এবং আমার পোষা কুকুরটি অথবা আমার বাগানের রজনীগন্ধার শতকরা ৯০ ভাগই ওই ছয়টি পদার্থ দিয়েই গড়ে উঠেছে। কিন্তু যা বলছিলাম বিস্ফোরিত নক্ষত্রের দেহাবশেষগুলি জমাট বেঁধে মহাকাশের শীতলতায় গড়ে উঠল গ্রহ – অন্য অনেকগুলি গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীরও জন্ম হল।

পৃথিবীব জন্ম হয়েছে সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে। সূর্যের জন্ম তখনও হয়নি। এক ঘনীভূত গ্যাসস্তূপের আবরণ সরিয়ে যেদিন সূর্য আত্মপ্রকাশ করল এবং পৃথিবী যেদিন তার স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ শুরু কবল সেদিন তার আকাশে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল জলীয় বাষ্প (H_2O), মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং হাইড্রোজেন—।

এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী J.B.S. Haldane এবং সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী Oparin স্বতন্ত্রভাবে এক তত্ত্বগত মতবাদ উপস্থিত করলেন যে, তিনশত কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদি আকাশ ও সমুদ্রে যে পরিবেশের মধ্যে রাসায়নিক বিবর্তন শুরু হয়েছিল, যন্ত্রাগারে তা সৃষ্টি করে দেখা যাবে না কেন? অ-প্রাণ রাসায়নিক পদার্থ থেকে জৈবিক অণুসৃষ্টির ব্যাপারটি হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখার যে পদ্ধতি তাঁরা বাতলে দিলেন, সেই পথ ধরেই অগ্রসর হলেন মারকিন জীববিজ্ঞানী Urey ও Miller।

তাঁরা দুজনে আদি পৃথিবীর আকাশে বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিয়ে পেলেন গ্লিসাইন, অ্যালেবাইন, অ্যাসপারটিক এসিড প্রভৃতি সহজ-গঠন অ্যামিনো-এসিড যা জীবন সৃষ্টিরই মূল উপাদান। পৃথিবীর আদি যুগের আকাশে বিরামহীন প্রচণ্ড বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ জীবনের সূচনা করে দিয়েছিল। অনুরূপ ভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ এক্স-রশ্মিপাতের ফলে উৎপন্ন হল আর একটি অ্যামিনো এসিড "অ্যাডেনাইন"।

কোটি কোটি বছর ধরে এ সকল পদার্থ আদি সমুদ্রে জমে উঠেছিল, তৈরী করেছিল Haldane-এর ভাষায় তপ্ত "আদিম জীবন-সালসা"।

আদি সমুদ্রের সালসাটি ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠল এবং তার ফলে অ্যামিনো-এসিড বা জৈব অণুগুলি পরস্পরের কাছে চলে এল। পারস্পরিক সংঘাতে কোন কোন অণু একেবারেই চূর্ণ হয়ে গেল। আর যারা মিলিত হল, তাদের মধ্যে একটি রাসায়নিক বন্ধন গড়ে উঠল। সহজ-গঠন অণুগোষ্ঠীর স্থলে গড়ে উঠল জটিল-গঠন অণুগুলি। কোটি কোটি বছর ধরে এই কাণ্ড চলেছে। অবশেষে এমন এক জটিল-গঠন অনু-গোষ্ঠী গড়ে উঠল যারা নিজেদের প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারে,—পরিবেশ থেকে খাদ্য টেনে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, সেটাই জীবন-কণিকার জীবন-সংগ্রাম। পরবর্তী পর্যায়ে অতিকায় অণুগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল, জলাভূমি বা সমুদ্রের তরল পরিবেশ এ ব্যপারে তাদের সহায়তা করল। তারা এখন অখণ্ড একক। সৃষ্টি হল পৃথিবীর আদি জীবন-কোষ। পরবর্তী অধ্যায়ে বৃহত্তর বিকাশের দিকে যাত্রা। এককোষ থেকে বহুকোষ। এক জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে অন্য ও নতুন জীবন। নিউক্লিক অ্যাসিড কোষের কেন্দ্রস্থলে বসে অন্য নিউক্লিক অ্যাসিডকে নির্দেশ দেবার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে।

যা ছিল মহাকাশে জড় কণিকা-রূপে, মহাসমুদ্রে তাই হয়ে উঠল

জীবন-কণিকা। এক অবয়বহীন বস্তুস্তূপ মহাসমুদ্রের নীচে কতকাল লুকিয়েছিল। ইতিমধ্যে বায়ুমণ্ডলে কারবন ডায়োকসাইড গ্যাস ভেঙে অক্সিজেন মুক্ত হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয় অক্সিজেন ভেঙে গিয়ে Ozone সৃষ্টি হল বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে গিয়ে সে এমন এক আবরণ সৃষ্টি করল যাতে করে প্রাণঘাতী বিকিরণ সমুদ্র-বক্ষে বা সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করতে পারল না। অবয়বহীন জীবন-স্তূপগুলি সমুদ্রোপকুল থেকে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত মহীসোপান (Continental shelf) ধরে ধরে এগিয়ে চলল উপকূলের দিকে। অথবা বলা যায়, মহাসমুদ্রের অন্ধকার থেকে পৃথিবীর উপকূলের আলোকের দিকে। এক একটি সোপানে এসে তার কত যুগ প্রতীক্ষা! —এক এক পরিস্থিতিতে এক একটি অঙ্গ—এক একটি সোপানে দাঁড়িয়ে পরবর্তী সোপানকে যাচাই করে দেখা। এক একটি মহীসোপান অতিক্রম করে যখন সে পৃথিবীর উপকূলে, তখন পৃথিবী তাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছে। না, এখন থেকে তার আহার্য যোগাবে "সামুদ্রিক সালসা" নয়, যোগাবে অক্সিজেন এবং অন্যান্যরা। মহাসমুদ্রে যেগুলি তার খাদ্য ছিল এখন সেগুলি তার কাছে পরিত্যাজ্য। জীবন-বিবর্তনকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা না করে যাঁরা গ্রহান্তর থেকে অতি-মানব আমদানী করছেন, তাঁরা একটি অতি কঠিন সমস্যার হাস্যকর সরলীকরণে আনন্দ পাচ্ছেন। এবং সেজন্যই বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। গত কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছরে মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ দেখে যাঁরা বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে পড়ছেন এবং সেজন্যই যাঁরা "গ্রহান্তরের মানবদের" মস্তিষ্ক এনে এই প্রশ্নের সমাধান করতে চাইছেন, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, জীবন-বিবর্তনের ইতিহাসে এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছে যখন সামুদ্রিক জীবন-সত্তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরিবেশের উপযোগী শ্বাসযন্ত্র তৈরি করে

নিয়েছে,—অথবা মাতৃগর্ভের নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচে থাকার জন্য সে 'ফুল' বা placenta তৈরি করে নিয়েছে। প্রাণী বা তরুলতা পৃথিবীর পরিবেশে যে সংগ্রাম করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশকে অনুকূল করে নেবার ব্যাপারে তাদের যে নিজস্ব দানও রয়েছে, সে কথা বিস্মৃত না হলে দেবানুগৃহীত কোন সত্তার কল্পনাও করা যায় না কিন্তু সে কথা থাকুক।

সৌরমণ্ডলের জীবন-বঞ্চিত গ্রহরা

মহাবিশ্ব পরিচয়ের জীবনতত্ত্বের "পুনশ্চ" অধ্যায়টির দিকে আমার চোখ পড়ল। মহাকাশে ভাসমান একই গ্যাসপুঞ্জ থেকে উদ্ভূত বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন কেন পারল না জীবন সৃষ্টি করতে? এই অতিকায় গ্রহগুলির আয়তন এত বড় এবং এরা সূর্য থেকে এত দূরে যে, এদের উর্ধ্বের বাষ্পমণ্ডল অতিমাত্রায় শীতল। সেজন্যই আদিম পরমাণুগুলি ওদের অভিকর্ষ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি। পৃথিবী এবং সূর্যের অন্যান্য নিকটবর্তী গ্রহগুলি আকারে ছোট—উর্ধ্বের বায়ুমণ্ডলও তপ্ত। মুক্ত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম তাদের আকাশ থেকে আজও অনায়াসেই পালিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর গড়ে ওঠার দিনে নিশ্চয়ই অধিকতর ভারি গ্যাসগুলি পালিয়ে গিয়েছে। অতএব যারা পড়ে রইল—অর্থাৎ মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং জল (H_2O)—অর্থাৎ কারবন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন—তাদের পক্ষে জীবন-সৃষ্টির কাজে মেতে ওঠার প্রতিবন্ধক অনেকটাই সরে গেল। এর মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর হল কারবন পরমাণু—ওর দৈহিক গঠনই এমন যে, অন্য পরমাণুর সঙ্গে জোট বাঁধার অতুলনীয় ক্ষমতা এর রয়েছে। পৃথিবীর তরুলতা, জীবদেহ থেকে শুরু করে শর্করা, মদ্য—সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে কার্বন। অন্ততঃ দশ লক্ষ কার্বন-যৌগিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে,—সম্ভবতঃ ৫ লক্ষ কার্বন-যৌগিক কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রাগারে

উৎপাদন করা হয়েছে। প্রকৃতি কার্বনকেই পৃথিবীর জীবন-সৃষ্টির অন্যতম মূল উপাদানরূপে গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর যেদিকেই তাকানো যাক, তার জীবন-ক্ষেত্রের সর্বত্র ওই কার্বন। এটা সম্ভবপর হয়েছে তার চরিত্রের দরুন, সে অন্য সকল পরমাণুর সঙ্গে অনায়াসেই মিশে যায়। কার্বন-ভিত্তিক জীবনের পর্যালোচনায় মনে ওঠে সিলিকনের কথা। তুলনায় মিলেমিশে চলার ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ। তথাপি অন্য জগতে, বিশেষ করে সে জগত যদি অতি তপ্ত বা অতি শীতল হয়, তবে সেখানকার বিশেষ পরিস্থিতিতে সিলিকন-নির্ভর জীবন গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোথায় সে পৃথিবী ? এমন পৃথিবী যদি নিতান্তই থাকে, তবে সেখানে জীবনের রূপই বা কি ? অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। কিন্তু সম্ভাবনায় রোমাঞ্চকর আপাততঃ সে প্রশ্নটি থাকুক। মহাবিশ্ব পরিচয়ের নাতিদীর্ঘ জীবন-অধ্যায়টির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবশেষে তাকালাম সামনের দিকে। ইতিমধ্যে কত সহস্র বা লক্ষ নক্ষত্র-জগৎকে পেছনে রেখে আমি চলে এসেছি, তার কোন হিসাব নেই।

বুঝতে পারছি আমি এগিয়ে যাচ্ছি হংসমণ্ডলের দিকে—যে মণ্ডলের সুদূরতম প্রান্তে রয়েছে সূর্য-সাম্রাজ্য।

কিন্তু আমার সামনে ফুটে উঠছে একটি নীল নক্ষত্র। তবে কি আমি লুব্ধকের কাছাকাছি এসে পড়েছি ? কিন্তু এখনও প্রায় পুরো একটি আলোকবর্ষ দূরে সে রয়েছে।

অবশেষে আমি লুব্ধকের আকাশে

এক একটি আলোকবর্ষ অতিক্রম করে যাচ্ছি। অবশেষে দাঁড়ালাম 'লুব্ধকের' (Sirius) আকাশে। পৃথিবীর আকাশে এটাকে উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে চিনে এসেছি। এখন সামনে দেখতে পাচ্ছি সূর্য থেকে কিছুটা বড় এক নীলবর্ণ নক্ষত্র। সূর্য অপেক্ষা ২১ গুণ বেশী

দীপ্তিশীল এই নক্ষত্রের শান্ত ও সংযত রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। শুনেছি বহু যুগ আগে মিশরীয়রাই লুব্ধককে প্রথম আবিষ্কার করেছিল। জেনেছিল নীলনদের পলিমাটির বন্যা নেমে আসার আগে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে আকাশে লুব্ধক এসে দাঁড়ায়। নীল-উপত্যকার শস্য-শ্যামল রূপের অধিকর্তা লুব্ধককে আজ এত কাছে থেকে দেখে মনে হল তাঁরা একটুও বাড়িয়ে বলেননি।

সূর্য থেকে নয় (8·6 light years) আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে বলে আমরা ওর আসল চেহারা কোনদিনই দেখতে পাইনি। কিন্তু লুব্ধকের মাধ্যমে আমরা মহাকাশের অদৃশ্যদের সন্ধান পেয়েছি। উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৪৪ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী Bessel দেখতে পেলেন, প্রতিবেশী তারকাদের মধ্যে লুব্ধক কেমন যেন একটি তরঙ্গায়িত পথ ধরে চলেছে। তাঁর আশঙ্কা হল, 'লুব্ধক' তাহলে একক নয়— তার নিশ্চয়ই কোন সঙ্গী আছে যা তার গতিপথে ব্যত্যয় ঘটায়। কিন্তু কোথায় সে প্রতিবেশী-নক্ষত্র? কাছাকাছি কোথাও তেমন কোন নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ল না। গ্রহ ইউরেনিয়ামের গতিপথের কে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, অদৃশ্য অভিকর্ষের সে সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হল নেপচুন। এটা দুবছর পরের কথা। কিন্তু লুব্ধকের সঙ্গীটিকে খুঁজে বের করতে লাগল আরও বিশ বছর। কিন্তু আজ এ কী দেখছি? সূর্য অপেক্ষা একুশ গুণ দীপ্তিশীল নক্ষত্র লুব্ধক। সে জোট বেঁধেছে এমন এক নক্ষত্রের সঙ্গে যার দীপ্তি লুব্ধকের দীপ্তির মাত্র দশ সহস্রাংশ। অতএব বুঝে নিতে কষ্ট হল না, সঙ্গীটির নক্ষত্র সমভর রয়েছে, গ্রহসম রয়েছে আয়তন। তাই যদি হবে তবে তার দেহের ঘনত্ব হবে জলের ঘনত্বের তুলনায় হাজার হাজার গুণ বেশী।

সেদিন এই অবস্থাটি বিজ্ঞানীরা স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারেন নি। আবার বিশ বছর অপেক্ষা করতে হল, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের দিন পর্যন্ত। বোঝা গেল, লুব্ধকের সংগীটির এই অভিশপ্ত জীবনের

কাহিনী। তার দেহের আয়তনের তুলনায় পদার্থগত ঘনত্ব এত বেশী যে, সে তার আপন দেহনির্গত আলোকরশ্মিকে টেনে রাখে, বিকশিত হতে দেয় না। তাই লুব্ধকের অনামা ও অখ্যাত সংগীটি এত নিষ্প্রভ। সব তার আছে, কিন্তু আপন দেহের ভারে সে এমনই জর্জরিত যে, সে আত্মবিকাশের পথ পাচ্ছে না।

'প্রশ্বা'কে দেখলাম

ওই ছায়াপথ, পৃথিবীর আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের দিকে ছুটে চলেছি—। চলার পথে এক-একটি নক্ষত্র-সাম্রাজ্য সামনে আসে, পেছনে চলে যায়—জ্যোতিঃলোক তবুও আমাকে ডাকছে। পথে পথে কত নক্ষত্র দেখে চলেছি আমার সামনে প্রশ্বা (Procyon)—Canis minor Constellation-এর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র—সংগে রয়েছে আর একটি অনুজ্জ্বল সাথী। উভয়ে মিলে একটি যুগল নক্ষত্র। জীবনে তারা এক, মৃত্যুতেও তাদের একই শয্যা। বহু দূরে উজ্জ্বল তারকাটিকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে অনুজ্জ্বল তারকাটি যাই, এগিয়ে যাই। সামনে এসে গেল Altair.

পৃথিবী থেকে, সূর্য-সাম্রাজ্য থেকে ১৬টি আলোক-বর্ষ অতিক্রম করে এসেছি। দাঁড়িয়েছি Altair-এর সাম্রাজ্য-সীমানায়। একটি শ্বেতপদ্মের দু'পাশে দুটি রক্তজবা। শ্বেতবর্ণের নক্ষত্র এই প্রথম দেখলাম। এই প্রথম দেখলাম, শ্বেতবর্ণ নক্ষত্রকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে চলেছে দুটি রক্তজবা—অন্য কথায়, আলফা Altair-কে প্রদক্ষিণ করছে বিটা ও গামা Altair। তিন নক্ষত্রের একটি জোট। পৃথিবী থেকে শুধু আলফা অর্থাৎ শ্বেত পদ্মটিকেই দেখা যায় আকৃতিতে সূর্যের তুলনায় বেশ কিছু বড়—কিন্তু ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকে সূর্য অপেক্ষা দশ গুণ বেশী।

আমি ছুটে চলেছি এক নক্ষত্রলোক থেকে অন্য নক্ষত্রলোকের দিকে। বিরামহীন এই যাত্রা। কত নক্ষত্র সামনে এল, বিস্তৃত ও বিস্তৃততর সাম্রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করে আমি অন্ধকারের যাত্রী চলেছি ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলের দিকে—যেখানে রয়েছে ধনুরাশি নক্ষত্রপুঞ্জ।

পৃথিবীর সময়ের মাপে কত বছর বা কত শতাব্দী শেষ হয়ে গেল, তবুও আমি আমার নিশানার নাগাল পাচ্ছি না।

উত্তর-আকাশে ধ্রুব নক্ষত্র, অনড় ও স্থির। বিহ্বলতাহীন স্নেহ-দৃষ্টিপাত করে সে ইসারায় বলছে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে আমি সমুদ্র-যাত্রীদের পথ দেখিয়ে এসেছি। আজও তোমাকে তাই দেখিয়ে দিতে চাই। ছায়াপথ ধরে এ প্রান্তে চলে এসো—বৃত্তাকার পথ-পরিক্রমায় তুমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবে দক্ষিণে কালপুরুষের কাছে।

দুইপাশে অসংখ্য আলোর দ্বীপ, বর্ণনাতীত রাজসমারোহ—তার মধ্যে বহু আলোক বর্ষ বিস্তৃত এই অন্ধকার সমুদ্রে আমার যাত্রা। এক এক সময় মনে হয়, যদি কোন নক্ষত্র তার অভিকর্ষের হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে রাখত, তবে আমি একটি কৃত্রিম উপগ্রহরূপে তাকে প্রদক্ষিণ করে চলতাম। সেই নক্ষত্রকে ভালবাসতাম—সূর্যকে যেমন করে একদিন ভালবেসেছিলাম, আমার নতুন বন্ধন-কর্তাকেও ঠিক সেভাবেই আমি ভালবাসব।

নিজের অজ্ঞাতেই এক এক সময় পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকি। পৃথিবীর কথা মনে হয়—কিন্তু কোথায় পৃথিবী? অন্তহীন জ্যোতিষ্ক-লোক তাকে মুছে ফেলেছে, সূর্যও নেই—নেই দিন-রাত্রি, সময় বা কাল বলতে কিছু নেই। নেই দিক—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ—কিছু নেই। এক অনন্ত শূন্যতার রাজ্যে আমি উপবাসী। নিস্তব্ধতায় ক্লান্ত। আজ কোথায় সেই মহাসঙ্গীত? প্রাচীনকালের দার্শনিকরা

মহাকাশের যে সঙ্গীত শুনেছিলেন, তার একটি কণাও যদি আজ ভেসে আসত! শব্দহীন এই রাজ্যে আমার বক্ষস্পন্দনই শুধু একমাত্র অস্তিত্ব—গভীর মনোযোগ দিয়ে আমি তা শুনে যাই।

কে যেন টানছে, বুঝতে পারছি না—

হঠাৎ মনে হল, কী এক অদৃশ্য ও কঠিন শক্তি যেন রকেটটিকে টেনে ধরছে, এগোতে দিচ্ছে না। প্রথমটায় চমকে উঠলাম। কিন্তু শুধু রকেটটাই নয়, আমার হাত ও পা যেন চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলছে। মহাকাশের ভারহীনতা ক্রমশঃ কমে কমে যাচ্ছে···। তবে কি, অদৃশ্য বল্‌গা ধরে কেউ রকেটটিকে টেনে রাখতে চাইছে?

এ কোন অভিকর্ষ? ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। রকেটের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০, ১৫, ২০ মাইল বাড়িয়ে দিয়ে সে টান ছিঁড়ে ফেলতে চাইলাম। পারলাম না। রকেটটি নামছে,—খুব ধীরে যদিও, তথাপি বুঝলাম, রকেটটি নিচের দিকে নেমে পড়ছে। নিকটতম নক্ষত্র রয়েছে অন্ততঃ ৪ আলোকবর্ষ দূরে—সেই নক্ষত্রের কোন গ্রহের টানেই কি আমি বাঁধা পড়তে চলেছি? বুঝতে পারলাম না।

প্রতিটি যন্ত্রপাতির গতি শিথিল হয়ে চলল। Altimeter বা উচ্চতামাপক যন্ত্রটি আমাকে নিঃশব্দে ও নির্ভয়ে জানিয়ে দিল, তোমার রকেটটি নেমেছে একটি সমতল ভূমিতে। ওর কাঁটাটি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে শূন্য মার্গে চলে এল।

বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত আমি চীৎকার করে উঠলাম। পুলকে বা ভয়ে; ইচ্ছা হল উৎকণ্ঠিত আবেগে আমি আর্তনাদে মহাকাশকে জানিয়ে দিই—"অবশেষে আমি সেই গোধূলি পৃথিবীর সন্ধান পেলাম, যা কোন সূর্যের সংগে অভিকর্ষ বন্ধনে বাঁধা নেই। যা আন্তর্নক্ষত্রলোকের যাযাবর পথিকরূপে অনন্তকাল ধরে ছুটে

বেড়াচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী Shapely বর্ণিত সেই কল্প-পৃথিবীর প্রথম নাগরিক আমি।

আমার প্রথম কাজ হবে, সেই পৃথিবীকে একটি নামে অলঙ্কৃত করা। আমি তাঁর নাম রাখলাম 'অপরা' (আসলে এই নামটি দিয়েছেন সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীনরেন্দ্র নাথ মিত্র)।

প্রথম উচ্ছ্বাসে দিশাহারা আমি জ্যোতিষ্কলোকের দিকে চিৎকার করে বলে উঠলাম, শোন তোমরা—আন্তর্নক্ষত্রলোকের এক ছায়াময় জগতের নাম আজ থেকে হল 'অপরা'।

নিশ্চয়ই কেউ আমার কথা শোনে নি,—তবুও সেই গোধূলি জগতের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর এক সন্তান চীৎকার করে জানিয়ে দিল: 'অপরাকে' আমি খুঁজে পেয়েছি, অথবা এও তোমরা শুনে রাখতে পারো, 'অপরা' আমাকে খুঁজে পেয়েছে।

আন্তর্নক্ষত্রলোকের অন্ধকারে ছুটে চলা পৃথিবী 'অপরা'র প্রথম মানব নাগরিকের কাছ থেকে তোমরা জ্যোতিষ্কলোকের অধিবাসীরা-শুনে রাখ, পৃথিবীর এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর স্বপ্নে দেখা ছায়া-পৃথিবীটি আমি খুঁজে পেয়েছি ছায়াপথের এক প্রান্তে সূর্যলোক থেকে শত আলোকবর্ষ দূরে ধনুরাশি নক্ষত্রমণ্ডলের কাছাকাছি কোথাও।

রকেটের উঁচু মাথার কুঠুরি থেকে নীচের দিকে তাকালাম। যতদূর সম্ভব দিগন্তের দিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলাম। সত্যই এ এক গোধূলি-জগৎ। দূর-দূরান্তের নক্ষত্র থেকে সামান্য আলো আসে সত্য, কিন্তু তা দিয়ে ওর অন্ধকার মুছে যায় না। তবুও কোন কোন অঞ্চলে চাপ চাপ আলো। আলো ও অন্ধকারের মিশালো জগৎ। দাবার ছকের মতো কাটা। যেখানে মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে আছে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম বা অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ, সেখানে আলো। যেখানে এগুলি নেই সেখানে বোধ হয় অন্ধকার। একটা

পুরো পৃথিবী এভাবে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্যভাগে বিভক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু আমি কি এই পৃথিবীতে নামব? ইতিকর্তব্য স্থির করে উঠতে পারছি না।

এই অনন্ত গোধূলির মধ্যে দূরে একটি পাহাড়ের মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, পাহাড়ই, কতটা উঁচু, বা কতটা তার ব্যাস, ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। তবুও একটি নামকরণ করা গেল—"মহাশৃঙ্গ" (নামকরণ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র)—তারই ঠিক সামনে জলাশয়ের মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র, নদী বা হ্রদ কোন্ পর্যায়ে এটি পড়ে বুঝতে পারলাম না। তবুও নাম দেওয়া গেল "নিথর সমুদ্র" (নামকরণ, নরেন্দ্র নাথ মিত্র)।

নিচে তেজস্ক্রিয় মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকে দেখতে পেলাম, অত্যন্ত পুরু একটি গ্যাসীয় স্তর আমার রকেটের মাথা ছাড়িয়ে আরও অনেকটা উপরে উঠে গিয়েছে। উপরের দিকে তাকালাম, এই গ্যাসীয় স্তর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি গ্যাসীয় স্তর শুরু হয়েছে।

আরও ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম নক্ষত্রগুলি বিপুল বেগে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে—পৃথিবীতে কোন দিন এটা দেখিনি। কারণ নিশ্চয়ই এই যে 'অপরা' তার 'মহাশৃঙ্গ' ও 'নিথর সমুদ্র'কে নিয়ে বিপুল বেগে ছুটে চলেছে, যার তুলনায় নক্ষত্রগুলির গতি অত্যন্ত কম। মহাকর্ষ-বন্ধনহীন এক মুক্তজগৎ কি অবশেষে পৃথিবীর সন্তানটিকে কাছে টেনে নিল! অবশ্য সেটা 'অপরা'র নিজস্ব অভিকর্ষের জোরেই।

কোথায় যাচ্ছে অপরা?

কোথায় যাচ্ছে 'অপরা'? কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না।

'অপরা'র বুকে পা ফেলার মুহূর্ত থেকে এ প্রশ্ন আমি শতবার করে এসেছি। কিন্তু মহাজগতে এমন কেউ নেই যে এই প্রশ্নের জবাব দেবে। শুধু দেখতে পাচ্ছি সহস্র আলোর রাজ্যের মধ্য দিয়ে যে কৃষ্ণবর্ণ পথরেখাটি চলে গিয়েছে সে পথেই 'অপরা' ছুটে চলেছে। গতি তার সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ মাইল।

কোন নক্ষত্রের কোন অভিকর্ষ একবার যদি হাত বাড়িয়ে তার নাগাল পায়, তবে আর রক্ষা নেই। এই উদ্দাম ও উন্মত্ত বিলাসের অবসান ঘটে সে গ্রহরূপে বন্দী হয়ে যাবে। মহাকাশে যাযাবর পাখী সেদিন নক্ষত্রের খাঁচায় বন্দী হবে।

গোধূলি জগৎ আমাকে ডাকছে—

রকেটের চূড়ায় কুঠরিতে বসে অনেকক্ষণ আমি নিচের এই স্বপ্ন-জগৎ দেখলাম কিন্তু আমি কি এই পৃথিবীতে পা ফেলব? নিচের ঐ গোধূলি আমাকে ডাকছে। রকেটের মই ধরে নিচে নামতে যাচ্ছি,—কিন্তু বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আমি যেন একটি পাখীর পালকের মতো আকাশে ভাসতে চাইছি।

শক্ত হাতে মইটিকে জড়িয়ে ধরে অনেক চেষ্টার পর মাটিতে পা ফেললাম। কিন্তু, পা দুটি যেন শূন্যে ভেসে চলছে।

অবশেষে সেই পৃথিবী। আমি হেঁটে চলছি, কি ভেসে বেড়াচ্ছি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। দুইয়ের মাঝামাঝি একটি অবস্থা।

এই এক রাজ্য যেখানে বাষ্প আছে কিন্তু কোন প্রবাহ নেই। 'অপরা'র সারা দেহ জুড়ে তাপ-সাম্য বিরাজ করছে। সমস্ত কিছু অচঞ্চল।

পৃথিবীতে জীবন-অভ্যুদয়ের পূর্বযুগে সেখানে সমুদ্র-সংগীত ছিল, ছিল অরণ্যের পত্রকলরব। এখানে তার কিছুই নেই।

এই পৃথিবীর দেহ থেকে উত্থিত আলোক-রশ্মি প্রতিহত হচ্ছে

ঊর্ধ্বের বাষ্পস্তরে। পীতবর্ণ সে বাষ্পস্তর, তার ঊর্ধ্বে আরও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কৃষ্ণবর্ণ আর একটি স্তর।

মনে হচ্ছে একটি সু-উচ্চ গম্বুজের নিচ দিয়ে আ। ম চলেছি, ঊর্ধ্বে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে আমার ছায়া পড়েছে। ছায়াটি যেন অতিকায় মাকড়সার মতো সেই বাষ্প জালে আটক পড়েছে। দৃশ্যটি দেখে আমি হেসে উঠলাম।

দূরে সামান্য দূরে পাহাড়টির পাদদেশ দেখতে পাচ্ছি— অবশ্য খানিকটা আংশিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন পাহাড়টির পুরো চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু, এমনই আর একটি দিনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। পঞ্চাশ কোটি বছর আগে কুমারী পৃথিবীর প্রথম রূপ-সজ্জা দিনে পর্বতের ভূমিকাটি আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। পর্বতশৃঙ্গ মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে দেখে অরণ্যের ফুলের গাছগুলিও মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল অরণ্যের তরুলতা সেদিন বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস গিলে ফেলে অক্সিজেন মুক্ত করে দিল। গৈরিকবসনা রিক্তরূপা কুমারী পৃথিবী সেদিন ধীরে ধীরে তার দেহাবরণ পালটে নিয়ে রূপবতী হয়ে উঠল ভাবছি, আর মাকড়সাটিকে দেখছি। দেখছি মাকড়সাটি ম্লান আলো ও অন্ধকারের দাবার ছকের উপর দিয়ে কোন রকমে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার মাথার উপরে এই ছবি, আমার ছবি।

সে ভাবেই এগিয়ে গিয়ে পাহাড়টিতে ঠোকর খেলাম। তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু, শিলাস্তূপকে কঠিন বন্ধনে বাঁধতে পারলাম না।

দূরে রকেটটি দেখতে পাচ্ছি—তার চূড়াটি রয়েছে বাষ্পমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের অন্ধকারের মধ্যে।

একটি শিলাখণ্ডকে জড়িয়ে ধরে উঠতে গেলাম। কিন্তু কিছুটা উঠতেই পড়ে গেলাম। সেখান থেকে তাকালাম বিপরীত দিকে।

মৃত্তিকা থেকে অসংখ্য আলোর স্তম্ভ উঠে গেছে উর্ধ্বদিকে। কিন্তু, খানিকটা উঠেই তারা অন্ধকারের মধ্যেই মুছে গিয়েছে।

ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে আলোকস্তম্ভগুলিকে জড়িয়ে ধরি, কিন্তু সেটি নিছক এক স্বপ্নবিলাস। কোথা থেকে এ সকল স্তম্ভ সৃষ্টি হয় বুঝলাম না, তবে অনুমান করছি, মৃত্তিকা গর্ভ থেকে কোন অজানা গ্যাস উঠে আসছে এবং তা মৃত্তিকাবক্ষে তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্তর অতিক্রম করার কালে এ ব্যাপার ঘটেছে। একবার মাথার ওপরে বাষ্প স্তরের তলদেশে মাকড়সাটির দিকে তাকিয়ে থাকি। পরমুহূর্তেই ওই গ্যাসস্তরের ফাঁক দিয়েই আকাশের দিকে তাকাই।

জোনাকি পোকার ঝাঁক

এক ঝাঁক—সংখ্যায় সহস্রাধিক হবে—জোনাকি পোকা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। আসলে ওবা জোনাকি পোকা নয়। এক ঝাঁক ক্ষুদে নক্ষত্র। ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করতে এই পথ অতিক্রম করে গেল।

মহাশৃঙ্গকে জড়িয়ে ধরে আমি এই দৃশ্য দেখছি। 'অপরা'র বুকে অন্ধকার অংশে এসে দাঁড়ালাম, তাকালাম উর্ধ্বপানে। মাকড়সাটিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না আবার বাষ্প-মণ্ডলে ভেসে চলি, মাঝে মাঝে 'অপরা'র বুকে হালকা পা ফেলে এগিয়ে চলি।

বাষ্প-মণ্ডলটিও আলো-আধারে বিভক্ত। এ এক বিচিত্র জগতে পা ফেলেছি আমি। গ্যাসগুলির পরিচয় আমি যদি জানতে পারতাম! কিন্তু, বেশ বুঝতে পারছি, এমন হালকা অভিকর্ষ ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম থাকা অসম্ভব। তবে কি কারবন ডায়োক্সাইড, নাইট্রোজেন ও অকসিজেন? তাও ঠিক বলতে পারি না। এ্যামোনিয়া আছে কি? এ্যামিনো-এসিড যদি থাকেই তবে জীবন-সম্ভাবনাও থাকতে পারে।

কিন্তু সে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা এখন থাকুক। এক বিচিত্ররূপী পৃথিবীকে আমি দেখে নিই। অনেকটা যেন হামাগুড়ি দিয়েই চলে গেলাম জলাশয়ের দিকে ইতিপূর্বে যার নাম রাখা হয়েছে "নিথর সমুদ্র"।

চলে এলাম সমুদ্রের ধারে। মাথার ওপরে সেই ছায়াটি এখনও রয়েছে। স্বপ্নজগতে জলাশয়টি স্বপ্নের রূপ নিয়েছে। কোথাও কোথাও জলতল থেকে উত্থিত স্তিমিত আলোক-রশ্মি উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে। খানিকটা উঠে বাষ্পস্তরের সীমানা স্পর্শ করে বেঁকে এসেছে জলবক্ষের দিকে। জলতলে নিশ্চয়ই তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম, বা লিথিয়াম।

সেখানে দাঁড়িয়ে তাকালাম সেদিকে যেদিক থেকে জলপথটি এসেছে। কিন্তু, এ কী! রামধনু সপ্তবর্ণের সহস্র তোরণ—জলপথের এক তটভূমি থেকে অন্য তটভূমি পর্যন্ত প্রসারিত! যতদূর দৃষ্টি যায় তোরণের পর তোরণ এবং তার নিচ দিয়ে এই জল-পথটি চির-অচঞ্চল অবস্থায় বিরাজ করছে।

দৃশ্যটি দেখে আমি উল্লাসে ফেটে পড়েছি। ইচ্ছা হল, ওই সহস্র তোরণের নিচ দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে আমি এগিয়ে চলি! মাথার ওপরে তাকিয়ে আমি এতক্ষণ নিজের ছায়া দেখেছি। কিন্তু আর ব্যঙ্গ চিত্র নয়। নিথর সমুদ্রের জলীয় বাষ্প যেন আমার জন্যই এ সকল তোরণ নির্মাণ করেছে।

এগিয়ে গেলাম। অঞ্জলি ভরে জল তুলে নিলাম। ছুঁড়ে দিলাম উপরের দিকে। আমি যেন এক সাবালক শিশু। জলবিন্দুগুলি উঠে গেল প্রায় তিনশত মিটার উপরে, সেখানে গিয়ে অত্যন্ত শীতল পরিবেশে তারা যেন ফুলকপির মতো আকাশে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল—তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল সমুদ্রের দিকে। তুষারের টুকরোর মতো। আমি কি এক অবোধ শিশু হয়ে গেলাম? একটি

পাথরকুচি হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম—সে যে কোথায় উড়ে গেল দেখা গেল না।

আবার অঞ্জলি ভরে জল তুলে নিলাম, ছুঁড়ে দিলাম মহাশৃঙ্গের দিকে। জল বিন্দুগুলি কি মহাশৃঙ্গের শিখর স্পর্শ করতে পারল? বুঝলাম না।

বাম থেকে এবার তাকালাম দক্ষিণ দিকে—নিথর সমুদ্রকে অসংখ্য রামধনুর তোরণ দিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে—। এক অবোধ শিশু সেই তোরণদ্বার দিয়ে ছুটে চলতে গিয়ে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

আবার 'নিথর সমুদ্রে' হাত ডুবিয়ে দিতে গেলাম। কিন্তু নিরস্ত হলাম। হাত গুটিয়ে নিলাম। কেন জানি, আমার মনে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা, একদা পৃথিবীতে যা ঘটেছিল, এখানে হয়তো তারই পুনরাবৃত্তি শুরু হয়ে থাকবে। পৃথিবীর সমুদ্র জলে জীবনের আদি সূচনা। সেই জল সেদিন যদি কারও হাতে পড়ত, তবে কি সেই আদি জীবন-কোষ বিধ্বস্ত হয়ে যেত না? শতকোটি বছর ধরে জীবন নিয়ে প্রকৃতি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে, তাতে সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটলেও কি এ জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত না? অতএব হাত গুটিয়ে নিয়ে চলে এলাম রকেটে। সেখান থেকেও দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য আলোর তোরণ, এবং আলো-আঁধারের ছকে গড়ে ওঠা 'অপরা'কে।

আমি আদি যুগের অভিযাত্রী

কী এক মোহময় অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসেছে। আজ নক্ষত্রলোকে ছুটে-চলা এই পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন আদি যুগের সমুদ্র অভিযাত্রী রূপেই দেখতে পাচ্ছি। ম্যাগেলান, বা কুক, অথবা ভাসকো-ডা-গামা। এক ক্ষণভঙ্গুর জাহাজে চড়ে অজ্ঞাত সমুদ্রের কালো-জলে ছুটে চলেছি আমি। 'অপরা' আমাকে কোথায় নিয়ে

যাচ্ছে, জানি না। অন্ধকারে মহাসমুদ্রে ভাসমান আলোর দ্বীপগুলির কোন একটির সঙ্গে যদি তার সংঘর্ষ ঘটে, তবে কী হবে? জানিনা, কিন্তু ভয়ে শিউরে উঠছি। কেননা, এটা এমন এক অর্ণবপোত যার গতির ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আদি যুগের অভিযাত্রীরা এতটা অসহায় ছিলেন না। কিন্তু এই অসহায়ভাব অনুভূতি একেবারেই মুছে গেল যখন দেখলাম ছায়াপথের তোরণদ্বার দিয়ে 'অপরা' ঢুকে পড়েছে। ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে ও বামে কত যে নক্ষত্র কে তার হিসাব রাখে? অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। 'অপরা' এদের মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ প্রণালীপথে ছুটে চলেছে। তাকালাম এই দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডের শেষ প্রান্তের দিকে। ২৫০০ কোটি আলোক-বর্ষে বিস্তৃত এক নক্ষত্রচক্র বিপুলবেগে আবর্তিত হচ্ছে। সেই আবর্তন পথে পৃথিবী থেকে দেখা নক্ষত্র মণ্ডলগুলিও আবর্তিত হচ্ছে - কে যে কোথায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, আবার কে যে কখন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এই মাত্র আমি ছিলাম সিংহরাশি মণ্ডলে পরমুহূর্তেই আমি উপস্থিত রয়েছি কন্যামণ্ডলে—। সীমাহীন মহাজগতের এই এক অদ্ভুত খেলা।

পৃথিবীর ছায়াপথ থেকে আপনারা এই বেতার-বিবরণ শুনছেন। মহাজাগতিক বেতার-তরঙ্গের যে কোন দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আপনাদের রেডিও রিসিভারটিকে বেঁধে নিন।

সমগ্র ছায়াপথটিকে একবার দেখে নিলাম। সর্পিল গঠন জ্যোতির্মেখলা আপন পুচ্ছ দিয়ে নিজের মস্তক স্পর্শ করতে চাইছে। দেখছি এক আবর্তনশীল মহাচক্র, যার বাহুবৃত্ত জুড়ে রয়েছে ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র।

এদের মধ্যে কোথাও আমার সূর্য নেই, পৃথিবী নেই। কোন যন্ত্রগণক এই বিপুলতা ও বিশালতার মধ্যে আমাকে বলে দিতে পারবে না কোথায় রয়েছে সূর্য, অথবা কোন্ দিকে রয়েছে পৃথিবী।

তথাপি নিজেকে আমি এক দিকহীন সমুদ্রের নির্ভীক নাবিক রূপে কল্পনা করেই ছুটে চলেছি। সামনে এক অতি প্রশস্ত কৃষ্ণ পথ, অসংখ্য জ্যোতিষ্কের সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে নিতান্তই একটি বে-ওয়ারিশ এলাকা। 'অপরা' সেই এলাকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বরী। এই আমার ছায়াপথ, রাজপথ। পথের দুই পাশে আলোর মালা, অধিকাংশই পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। পৃথিবী তাদের থেকে শুধু এক শ্বেত আভাসই দেখা যায়।

দেখছি আন্তর্নক্ষত্র মণ্ডলের পথের দুধারে গ্যাসপুঞ্জ অলসতায় ভেসে বেড়াচ্ছে। এদের দেখলেই আমার ভাবিকালের কথা মনে হয়। ভাবিকাল—যেদিন এ সকল গ্যাসপুঞ্জের ভেতর থেকে আরও কত নক্ষত্রের দীপ জ্বলে উঠবে।

মহাজাগতিক যাদুঘরে ঢুকলাম

কিন্তু ওই তোরণ পথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই ছায়াপথ যেন ছায়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যে এই সর্পিল ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল তাও বুঝতে পারছি না।

পেছনে, অনেক দূরে মেগেলান মেঘপুঞ্জে এমন এক নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি যা সূর্যের তুলনায় ছয় লক্ষ গুণ বেশী উজ্জ্বল,—বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন S Doradus।

'অপরা' যে আমাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। সে কি যাচ্ছে ধনুরাশি মণ্ডলের দিকে, যেখানে রয়েছে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দু? সেই কেন্দ্র-বিন্দুটিকে মাঝখানে রেখেই এই ছায়াপথ, এই দ্বীপব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত হচ্ছে। সৌরমণ্ডল থেকে ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে এই স্থানটি। আমার স্থির বিশ্বাস, আমি সেই ধনুরাশি মণ্ডলেই এসে গিয়েছি। আমি জানি এবং আমাকে বলেও দেওয়া হয়েছে, ছায়াপথ দ্বীপব্রহ্মাণ্ডে যা



আমার স্থির বিশ্বাস, আমি ধনুরাশি মণ্ডলে এসে গিয়েছি। আমি জানি এবং আমাকে বলেও দেওয়া হয়েছে, ছায়াপথ দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু দর্শনীয় এখানেই দেখা যাবে। দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড কাহিনীর সব কয়টি অধ্যায় নিয়ে এখানকার ইতিহাস। মহাজাগতিক এক যাদুঘরে মৃত নক্ষত্রের কঙ্কাল থেকে শুরু করে নক্ষত্র শিশুর ভ্রূণ পর্যন্ত সব কিছুই রয়েছে। (পৃষ্ঠা ৫৬) ছবি : আমেরিকান স্কাই-ল্যাব। কলকাতার মারকিন তথ্যকেন্দ্রের সৌজন্যে।



'নীহারিকা বলাকার' প্রান্ত দেশ থেকে ছায়াপথের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে—'কালপুরুষ' মণ্ডল। সেই মণ্ডলের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'অশ্বমুণ্ড নীহারিকা' গভীর কৃষ্ণবর্ণ এক মেঘস্তূপের প্রান্তিক এলাকা জুড়ে নক্ষত্ররা এমনভাবে ফুটে রয়েছে যে একটি অশ্বমুণ্ডের মতই দেখাচ্ছে (১২৬ পৃষ্ঠা) ছবি ঃ উইলসন পালোমার মানমন্দির।

কিছু দর্শনীয় তা ওখানেই দেখা যাবে। দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড কাহিনীর প্রায় সব কয়টি অধ্যায় নিয়েই এখানকার ইতিহাস। মহাজাগতিক এক যাছুঘরে প্রাচীনতম নক্ষত্রের কঙ্কাল থেকে শুরু করে নক্ষত্রশিশুর ভ্রূণ পর্যন্ত সব কিছুই রয়েছে। বাস্তবিক আমি সব কিছুই এখানে দেখতে পাচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছি, নক্ষত্ররা তাদের বয়স অনুযায়ী এখানকার এপাড়া ওপাড়া দখল করে বসে আছে। যারা বয়সে তরুণ, উজ্জ্বলতম নীল নক্ষত্ররা রয়েছে সভামণ্ডলের বাইরে, কুণ্ডল বাহু জুড়ে। সর্বাধিক প্রাচীন, স্খলিতযৌবন নক্ষত্ররা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে দখল করে রয়েছে ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চল। ঘোর রক্তবর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। আর মাঝ-বয়সী প্রৌঢ়রা দখল করে রয়েছে, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল। মাঝ-বয়সীদের মধ্যে কিছু কিছু তরুণ নক্ষত্রও কি করে যেন অনুপ্রবেশ করেছে।

কুণ্ডলবাহুর বাইরে যেখানে নীলবর্ণের তরুণ নক্ষত্রদের ভীড়, সেখানকার গ্যাস ও ধূলিপুঞ্জের মধ্যে আজও নক্ষত্রশিশুরা জন্ম নিচ্ছে।

কিন্তু সামনে এ কি দেখছি আমি! আমার বাম পাশে সহস্র সূর্যসম দীপ্তিশীল এক নক্ষত্রকে মাঝখানে রেখে দশ হাজারেরও বেশী নক্ষত্র মৌমাছির ঝাঁকের মতো দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। সেদিক থেকে দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে আর এক দৃশ্য। একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র তার মৃত্যু দশায় এসে পৌঁছেছে। সহস্রকোটি বছর ধরে আলো ও উত্তাপ ঢেলে দিয়ে সে আজ ফতুর, তা সত্ত্বেও সে বাঁচার চেষ্টা করছে। নির্বাপণের পূর্বে দীপশিখার মতো সে জ্বলে উঠল, আপন দেহকে লক্ষগুণ বিস্তারিত করে সে ওই নক্ষত্রের ঝাঁকটিকে ঢেকে ফেলল।

নক্ষত্র শিশুদের খেলা

মহাজাগতিক যাদুঘরে দৃশ্যের পর দৃশ্য। ওপাশে কয়েকটি নীল বর্ণের তরুণ নক্ষত্র এখনও নিজেদের কক্ষপথ খুঁজে পায়নি, তাই একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে, একে অন্যকে স্থান চ্যুত করে তার শূন্যস্থানটি দখল করছে। প্রচণ্ড সংঘাতে এক শিশু অন্য শিশুকে নিশ্চিহ্ন করে সবেমাত্র রাজা হয়ে বসেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর এক যৌবনপ্রমত্ত নক্ষত্র এসে ওদের সব কয়টিকে আপন দেহের মধ্যে টেনে নিয়ে বিস্ফারিত আনন্দে লক্ষ বা কোটি গুণ দীপ্তিশীল এক মহাতারকা রূপে ভেসে উঠল। ওই শিশুঘাতী মহাদানবকে দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম।

আবার সেই স্বর্ণভ্রমরের ঝাঁক

'অপরা' আমাকে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে। আবার সেই এক ঝাঁক স্বর্ণ-ভ্রমর। আগে ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন কাছাকাছি এসে দেখতে পাচ্ছি, এক লাখ, বা তারও বেশী স্বর্ণ-ভ্রমর জোট বেঁধে মহাকাশে ভেসে চলছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন ওরা নক্ষত্রপুঞ্জ বা ইংরাজিতে Star cluster। একদা এক গ্যাসপুঞ্জ থেকে যুগপৎ এক লক্ষ স্বর্ণ ভ্রমরের জন্ম হয়েছিল। রক্ত-মাংসের সম্পর্ক প্রকাশ পাচ্ছে তাদের পারস্পরিক অভিকর্ষের মধ্যে দিয়ে। বিজ্ঞানীরা সত্যি কথাই বলছেন। বর্তুলাকার এই পুঞ্জটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে লোহিতবর্ণের একটি নক্ষত্র। এ ছাড়া নাকি অন্য নক্ষত্রপুঞ্জও আছে যারা তেমন আঁটো আঁটো বন্ধনে বাঁধা নেই। তাদের বলা হয়, Open cluster—বা, মুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ।

সূর্যলোক থেকে তিনশত আলোকবর্ষ দূরে বৃষরাশি নক্ষত্র মণ্ডলে লক্ষাধিক স্বর্ণ ভ্রমর এখনও মহাকাশে আমার সামনেই উড়ে চলছে। ওরা যাচ্ছে কি হংস মণ্ডলের দিকে? ঠিক ধরতে পারছি না।

ক্ষীণ মেঘছায়ায় ঢাকা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র আলকিয়নকে (Alcyon) চিনে নিতে কষ্ট হল না। সূর্যের তুলনায় পাঁচ শত গুণ বেশী উজ্জ্বল এই মহাসূর্যকে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক সূর্য আবর্তিত হচ্ছে, ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করছে।

বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, এক [illegible] নীল লাল পাখী উড়ে যাচ্ছে। পরস্পরের আকর্ষণে তারা এমন ভাবে বাঁধা রয়েছে যে সামান্যতম বিশৃঙ্খলাও সেখানে নেই। আমি জানি [illegible] সূত্রের এই বন্ধন চিরকাল ওদের এভাবে বেঁধে রাখতে পারবে না। মহাকাশে একদিন তারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। ছায়াপথ প্রদক্ষিণ শেষ হয়ে গেলে দেখা যাবে লক্ষাধিক ভ্রমরের ঝাঁকের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে এই [illegible] পুরুষ অধিকর্তা Alcyon ও তার সঙ্গী [illegible] নক্ষত্র [illegible] পরস্পরের কাছাকাছি [illegible] গ্রহ, [illegible] পর্যন্ত [illegible] চমৎকার চলছে। [illegible] একদিন এই ঝাঁকের [illegible] নক্ষত্র [illegible] আকস্মিক [illegible] পরস্পরের কাছে চলে [illegible], [illegible] বন্ধনের [illegible] বিপর্যয় [illegible] ছায়াপথ [illegible] নক্ষত্রগুচ্ছ ও নক্ষত্রপুঞ্জের [illegible] পারবে। একটি ভ্রমরের [illegible] ভ্রমর [illegible] খুলে দেবে। কিন্তু [illegible] কথা [illegible] এক [illegible] পরিবার, [illegible] অবিচ্ছিন্ন [illegible], [illegible] ছায়াপথ জুড়ে [illegible] চক্র [illegible] ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুর চতুর্দিকে [illegible] স্বর্ণ ভ্রমরের দল [illegible],—কিন্তু [illegible] অন্য নক্ষত্ররা, নক্ষত্রপুঞ্জ [illegible] ঝাঁকটি [illegible] থেকে একটি ভ্রমরকে ছিনিয়ে [illegible] নক্ষত্রেরও রয়েছে। ওরা শিকারীর [illegible]

মহাকাশে উড়ে চলে এই স্বর্ণ [illegible] দল [illegible], আর ভাবছি, আশঙ্কিত হচ্ছি। শিকারীর নিষ্ঠুর হাত যদি ওদের মধ্যে

ছুটি বা একটিকে ছিনিয়ে নেয়! ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে ওই যূথবদ্ধ জীবন? বরং দেখা যাবে, পিতৃপরিচয়ে যারা ছিল এক সংসারে তারা এখন সহস্র, বা লক্ষ সংসার পেতে বসেছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ব্যাপারটি ঘটবে একশত কোটি বছর পরে। এটা মোটেই কোন সান্ত্বনা নয়। ভাবীকালে অভিযাত্রী এই ধনুরাশি-মণ্ডলে এসে ওদের কাউকেই খুঁজে পাবেন না। লক্ষ বা লক্ষাধিক নক্ষত্রের দল বেঁধে উড়ে চলার কাহিনী সেদিন নেহাতই একটি স্মৃতিকথা।

কিন্তু, আজ আমার কাছে এটাই পরম সত্য, লাল ও নীল ভ্রমরের একটি ঝাঁক নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় উড়ে যাচ্ছে। Alcyon ও অন্যান্যদের আমি দেখতে পাচ্ছি। সবাই সূর্য অপেক্ষা বহু শত গুণ বেশী আলো দেয়। ওই ঝাক থেকে যে আলো আসছে, তা এক কোটি সূর্য সাম্রাজ্যকে আলোকিত করে দিতে পারে।

এতক্ষণে তারা বহু দূরে বহু আলোক-বর্ষ দূরে চলে গিয়েছে। আমি তাকিয়ে রইলাম সেদিকে—।

একটি নক্ষত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে

নিজেকে আমি সুদূর অতীতকালের এক দুঃসাহসী সমুদ্র-অভিযাত্রীরূপে কল্পনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছি এবং এক দুঃসহ আনন্দ ও পুলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। সেই দিকহীন সমুদ্র, 'অপরা' আমার অর্ণবপোত। কিন্তু, তবুও একটি পার্থক্য রয়েছে। কোন দ্বীপ বা কোন মহাদেশ লক্ষ্য করে সে চলছে না। এক দিশাহারা, দিগভ্রান্ত সমুদ্রপোতের অধিনায়ক আমি। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে একের পর এক আলোর দ্বীপ দেখে চলেছি। তাদের এক বর্ণ, এক চেহারা—অধিকাংশকেই পৃথিবী থেকে দেখিনি। কিন্তু, ওপাশে 'অভিজিৎ' (Vega) ও 'শ্রবণার' (Altair)

মাঝামাঝি জায়গায় ওটা কি দেখা যাচ্ছে? বিজ্ঞানীরা যাকে 'পালসার' বা স্পন্দনশীল নক্ষত্র বলে থাকেন, আমি কি তারই একটা দেখতে পাচ্ছি?

প্রসার, সংকোচন এবং আবার প্রসার, ছন্দের মতো চলছে। তুলনা চলে আমাদের বুকের স্পন্দনের সংগে। কিন্তু, এই স্বল্পোজ্জ্বল তারাটি আমাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছে। পৃথিবী থেকে দেখা যায় না যদিও, কিন্তু তার এই স্পন্দন একদা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের অনিদ্রার কারণ হয়ে উঠেছিল। আজ তাকে মুখোমুখি দেখলাম। ১৯৬০ সালের কথা। সেদিন অকস্মাৎ খবর পড়ল, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কে যেন বেতার-স্পন্দন ছড়িয়ে দিচ্ছে মহাকাশে এবং তা পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। আমরা তৎক্ষণাৎ ধরে নিলাম, অন্য কোন পৃথিবী থেকে প্রযুক্তি বিদ্যা, বিশেষ করে, বেতার-বিদ্যায় অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিশীল কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে বেতার-বার্তা পাঠাচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল, মহাকাশের যে আহ্বান শোনার জন্য আমরা কান পেতে ছিলাম, অবশেষে কি তাই এসে পৌঁছুল!

এই বেতার-ভাষার পাঠোদ্ধার করে যা কিছু একটা জবাব পাঠাতে হবে। কিন্তু, তার আগে জানতে হবে তার ঠিকানাটি। মহাকাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হল, কিন্তু বেতার-বার্তা প্রেরকের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া গেল না। ঠিকানা যখন পাওয়া গেল, তখন বোঝা গেল, ওটি একটি ভুয়া বার্তা এবং তার বিশেষ কোন অর্থও নেই। বুদ্ধিবৃত্তিশীল কেউ মহাজগৎ থেকে এই বার্তা পাঠায় নি। পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সংগে এই মজার খেলা চালিয়েছে একটি ক্ষুদে নক্ষত্র যার অবস্থিতি 'অভিজিৎ' (Vega) ও 'শ্রবণার' (Altair) মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তার বুকের স্পন্দনই বেতার-তরঙ্গে

রূপায়িত হয়ে পৃথিবীতে এসে পৌছুচ্ছে। সমস্ত কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নির্ভুল বেতার-সংকেত পেয়ে আমরা কল্পনার প্রাসাদ তৈরি করেছিলাম, ভেবেছিলাম, আর এক জগতের 'মানুষ'—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় উন্নত—আমাদের বান্ধবতাপিয়াসী। 'অভিজিৎ' ও শ্রবণার' মধ্যবর্তী অঞ্চলে সেই দুষ্টু রাখাল বালকটিকে। আমি দেখলাম, সে একটি 'পালসার' (Pulsating star), অথবা, বলা যায় ধসে-পড়া নক্ষত্র, অথবা, অন্য পরিচয়ে একটি 'শ্বেত বামন' অথবা 'নিউট্রন তারকা'।

সূর্যের মতো যারা স্পন্দনহীন স্থির নক্ষত্র, তারা দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির মধ্যে একটা কিছু সামঞ্জস্য করে নিয়ে চলছে। গ্যাসীয় দেহের অভিকর্ষ তার দেহে অভ্যন্তরমুখী চাপ দিয়ে নক্ষত্রটিকে সংকুচিত করে দিতে চায়, আবার নক্ষত্রের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন হিলিয়াম পারমানবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রতিক্ষণেই তাকে বাইরের দিকে প্রসারিত করে দিতে চাইছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পারমানবিক জ্বালানী নিঃশেষিত না হচ্ছে, ততদিন ভার-সাম্য বজায় থেকে নক্ষত্র-দেহও মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে জ্বালানীর-ঘরে টান পড়ে, তখন বিকিরণ হ্রাস পেয়ে অভিকর্ষ প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে, আদি অবস্থায় যে আয়তন নিয়ে তার জীবন শুরু হয়েছিল তা' ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে ক্ষুদ্রাকার হয়ে যায়। অবশ্য নক্ষত্রের পুরোপুরি নির্বাপণের সময় তখনও দূরে রয়েছে—ফলে নক্ষত্র-দেহের ইলেকট্রনগুলি তখনও ছুটাছুটি করে চলে এবং অভিকর্ষের সঙ্গে কিছুটা সমতা রেখেই তারা চলতে পারে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় এটা হল নক্ষত্রের 'শ্বেত বামন' অবস্থা। আমরা সাধারণ লোকেরা এটাকে বলতে চাই, মৃত্যুর আগে 'নাভিশ্বাস'। ভাবতে বিদ্‌ঘুটে লাগে, 'শ্রবণা' ও 'অভিজিৎ'-এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত এক ক্ষুদ্রাকৃতি নক্ষত্রের তরঙ্গায়িত

নাভিশ্বাস'কেই আমরা একদিন 'মহাকাশের আহ্বান বলে মনে করে ঠকেছিলাম।

এখানে সূর্যের কথাও এসে যাচ্ছে। চার লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল যার দেহের ব্যাসার্ধ, সে যখন ছয় হাজার মাইলের মধ্যে চলে আসবে, তখন আমরা তাকে 'শ্বেত বামন'রূপেই দেখব। তাকিয়ে রইলাম এই অনুজ্জ্বল ক্ষুদে নক্ষত্রটির দিকে। ভাবলাম, ওকে একটি নাম দিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে ওকে পরিচিত করে রাখি। কিন্তু, পরমুহূর্তেই নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। কেন না, একদিন যে ছিল সূর্য-সম দীপ্তিমান, অথচ, কেউ তাকে স্বীকার করল না, মহাকাশ মানচিত্রে যার কোন স্থান হল না, আজ তাকে নাম-ভূষিত করতে গেলে সেটা বিদ্রূপই করা হবে। জ্যোতিষ্কের মৃত্যু-দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক, চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মৃত্যুর আগে সে আর একটি দৃশ্য দেখাবে। নির্বাপণের আগে দীপশিখার মতো সে জ্বলে উঠবে। গভীর রক্তবর্ণ হয়ে উঠবে এবং ক্রমশঃই বিস্ফারিত হয়ে সে 'অভিজিৎ' ও 'শ্রবণা'কে' ঢেকে ফেলবে। তারপর, ধীরে ধীরে নিঃশব্দ মৃত্যু।

কিন্তু, এটা গেল সূর্যের ন্যায় অকুলীন নক্ষত্রের কাহিনী। সূর্য অপেক্ষা সহস্র গুণ বড় অতিকায় নক্ষত্রগুলির মৃত্যু-ও অন্য রকম। পরিণতি হিসাবে উভয়েরই ভাগ্য এক, কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনের মতো মৃত্যুও অনুল্লেখ্য। কিন্তু, রাজার মৃত্যু তেমন নিঃশব্দে আসে না। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশনে সে মৃত্যু প্রচারিত হয়, আসল কান্না ও নকল কান্না এক হয়ে শোক-পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়—সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি হবার পরে আসে আসল মৃত্যু।

অতিকায় দানব নক্ষত্রগুলির ক্ষেত্রে ওদের কেন্দ্রস্থলে এমন চাপ পড়ে যে, প্রোটনের সংগে ইলেকট্রনের বিক্রিয়ায় উভয়েই

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সংগে সংগে তাদের চাপও অদৃশ্য হয়। পড়ে থাকে শুধু নিঃসঙ্গ নিউট্রন। এই অবস্থায় এখন কিছু থাকে না যা অভিকর্ষকে রুখতে পারে। ফলে, দানব-নক্ষত্র—যারা সূর্য অপেক্ষা অনেক বেশী গুণ বড়—সংকুচিত হয়ে, এমন রূপ নেয়, যাকে বলা হয়, 'নিউট্রন তারকা'। অনামা এবং পৃথিবী থেকে অ-দেখা ওই মুমূর্ষু নক্ষত্রটি কি 'পালসার'? না, 'নিউট্রন-তারকা'—? পৃথিবীর দিকে আজও সে যে বেতার-তরঙ্গ পাঠাচ্ছে, তা এখানে বসেই আমি ধরতে পাচ্ছি।

কিন্তু, তার অভিকর্ষ-তরঙ্গ কি নেই? থাকলে তা কোথায়? এত কাছে এসেও আমি তা ধরতে পারছি না কেন? অথচ, আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে (Theory of General Relativity) পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, অভিকর্ষ-শক্তিও তরঙ্গ-রূপেই প্রবাহিত হয়ে থাকে। ওরা আলোর তরঙ্গ ও বেতার-তরঙ্গের সমধর্মী।

পরমুহূর্তেই তিনি আরও পরিষ্কার ভাবেই বলে দিয়েছেন, খুঁজে দেখো মহাকাশে অতিকায় নক্ষত্রদের মৃত্যু-শয্যায়।

খুঁজলাম, 'শ্রবণা' ও 'অভিজিৎ'-এর মধ্যবর্তী ওই অনামা নক্ষত্রটিতে অভিকর্ষ-প্রবাহ খুঁজে পেলাম না। সূর্য অপেক্ষা হাজার গুণ বড় নক্ষত্রও যে পরিমাণ অভিকর্ষ-তরঙ্গ পাঠায়, তা এত ক্ষীণ যে ধরা যায় না। সেজন্য চাই একটি মহারাজ-নক্ষত্র, সূর্য অপেক্ষা দশ হাজার গুণ বড়।

আমি আগেই বলেছি, মহাকাশের 'মৃত্যুঘরে' আমি প্রবেশ করেছি—মহাকাশের যা কিছু দর্শনীয়, তা কয়েকটি আলোক বর্ষে বিস্তৃত ধনুরাশি থেকেই দেখা যাবে। 'নিউট্রন তারকা'র সন্ধানে তাকালাম পার্শ্ববর্তী নীহারিকা 'কর্কটে'র দিকে। বিস্মিত হলাম। সেখানে সত্যিসত্যিই এক মহারাজ-মহানক্ষত্রের মৃত্যুদৃশ্য দেখতে

পাচ্ছি। সূর্য অপেক্ষা দশ হাজার গুণ বড় এক মহাসূর্যের স্পন্দন বেতার-তরঙ্গরূপে আসছে—সংগে সংগে তার অভিকর্ষ তরঙ্গও। উল্লসিত হয়ে উঠলাম। কারো মৃত্যুতে উল্লসিত হওয়া সুরুচিবিরুদ্ধ। একথা আমি জানি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলে উঠলাম জয় হোক মহারাজ মহানক্ষত্রের। চিরজীবী হোন। নিউট্রন তারকারূপে তোমাকে আমি চিনে রাখলাম। তুমি শুধু বেতার তরঙ্গ, একস্-রশ্মি ও গামার রশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছ না, ছড়িয়ে দিচ্ছ অভিকর্ষ তরঙ্গও।

ওখানেই 'পালশার' বা স্পন্দনশীল নক্ষত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য। সূর্যদেহের তুলনায় যে নক্ষত্রের দেহ দেড়গুণ বড়, তার জীবন সমাপ্তি আসে অন্য পথে। আগেই ত আমি বলেছি, সাধারণ লোকের মৃত্যু এবং অসাধারণ লোকের মৃত্যু—দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। শোকযাত্রা, কালো ব্যাজ ধারণ, আসল কান্না ও নকল কান্নার সহাবস্থান সব মিশিয়ে সে এক বিরাট ব্যাপার।

সূর্যের তুলনায় দেড়গুণ বড় যে নক্ষত্র, সে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে,—সমগ্র ছায়াপথকে ক্ষণকালের জন্য আলোকিত করে তুলবে। না, শুধু এই ছায়াপথই বা বলব কেন? দূরান্তর আরও অনেক ছায়াপথ আলোকিত করে সে খানিকটা হালকা হ' যাবে—তখন তার পরিচয় নিউট্রন তারকারূপে।

এই তারকা যখন আরও ঘনীভূত হতে থাকবে, তখন মহাকাশে সৃষ্টি হবে অন্ধকূপ—তার দেহের ভর এত বেড়ে যাবে যে সে তার আলোক রশ্মিগুলিও ছাড়তে পারবে না। সে এক অভিশপ্ত অস্তিত্ব, আলো আছে, অথচ নেই বিকিরণের ক্ষমতা। যেন মেদবহুল একদেহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে, মেদ ছেড়ে না দিয়েই—ফলে, তার চলবার শক্তি একেবারেই নেই। সে যা কিছু সামনে দেখছে তাকেই নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখন থাক সে কথা।

আমার কৌতূহল, মহারাজের আসল মৃত্যু ঘটবে কতকাল পরে? কাউকেই সামনে পাচ্ছি না যে প্রশ্নটি তুলতে পারি। দূরে দেখতে পাচ্ছি নীহারিকা কর্কট। তাকেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে নিরুত্তর। সামনে দাঁড়িয়ে আছে 'সর্বজ্ঞ', এক মানব-যন্ত্র। অগত্যা তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সেও সঠিক জানে না। নীহারিকা কর্কটের উচিত ছিল এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া—কেননা, তার জন্মের ইতিহাসও এমনই এক নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের ইতিহাস।

*   *   *

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন পথরেখা ধরে অপরা এগোচ্ছে। কোন্ সীমাতীত রহস্যের তটভূমিকে নিশানা করে সে ছুটে চলেছে, তাও জানি না। আর পৃথিবী? সেখানে মাস-বর্ষ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সহস্রাব্দের চিহ্নলিপি অতিক্রম করে ছুটে চলেছে। যেতে যেতে আমাকে ডাকছে। আমি উন্মনা হয়ে উঠি। ফিরে তাকাই, কিন্তু কোথা থেকে যে ডাক আসছে, বুঝতে পারছি না। সমস্তটাই প্রহেলিকা। অপরার বুকে অন্তহীন গোধূলির মতোই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

*   *   *

মহারাজ মহানক্ষত্রের দিকে আবার তাকালাম। বুঝতে পারলাম, মহারাজের আসল মৃত্যু ঘটতে এখনও এক হাজার কোটি বছর। সবে মাত্র নাভিশ্বাস উঠেছে—এর পরে আসবে 'নিউট্রন তারকা' পর্যায়—তারপর আসবে 'অন্ধকূপ' পর্যায়—অনেক, অনেক পর্যায় পার হয়ে তবে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি। 'অপরা' এতদিন এখানে অপেক্ষা করতে রাজি নয়—সে ছুটে চলেছে এমন এক পথকে নিশানা করে যে পথের সঙ্গে তার কোন পরিচয়ই নেই,—যে পথে আর কোনদিন হয়তো সে আসবে না। বিচিত্ররূপিণী আমাকে তার বিচিত্র জীবনের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে কোথায় যে যাচ্ছে, কেউ তা বলতে পারে না। 'সর্বজ্ঞ' ত নয়ই।

আমার সঙ্গী-সাথীরা

এবার আসুন, আমার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এ কাজটি সমাধা করা উচিত ছিল অনেক আগেই, পৃথিবী থেকে যাত্রার মুহূর্তেই, সূর্যমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার কালেও একবার মনে হয়েছে ওদেব সঙ্গে পবিচয কবিয়ে দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন—তবুও আলসেমি কবেই কাজটি কবা হয় নি। চারদিকের ব্যাপারগুলি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ধেনুমণ্ডলে প্রবেশের মুখেও এই অবশ্য কর্তব্যটি ভুলে গেলাম। আপনারা মাপ কববেন, কিন্তু মনে রাখবেন, এই অভিযানে যিনি আমাব প্রধান সহায়ক, প্রধান পরামর্শদাতা, সেই সর্বজ্ঞ মশাই এ ব্যাপাবে ঘুণাক্ষবে আমাকে কিছু বলেন নি। যিনি সর্ববিষয়ে আমাকে চালিত কবাব দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন, তিনি এই প্রাথমিক করণীয় কাজটিই বিস্মৃত হলেন! এ সকল সঙ্গী-সাথী কেন যে আমার সঙ্গ নিয়েছেন, ঠিক বলতে পারব না, তবে তাঁদের পবিচয় শুনে যদি আপনারা বুঝে নিতে পারেন, সেটাই ভাল হবে।

প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন 'টেলিসকোপ'—আকাশ-আকাশেব দিকে গলা উঁচিয়ে থাকতেই উনি অভ্যস্ত—মাটিব পৃথিবী বা পৃথিবীর ধূলিকণার দিকে উনি নজর দেন না। তিন শত বছর আগে গ্যালিলিওর দিন থেকেই উনি বিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত-প্রাণ। দূরের জিনিসকে উনি বড করে দেখান—দূরকে নিকট করে তোলার মোহ-বিদ্যা আয়ত্ত করে উনি এক সর্বজয়ী দূর-দ্রষ্টা।

এবার দেখুন স্পেকট্রোস্কোপ, বাংলায় যাকে আপনারা ডেকে অভ্যস্ত 'বর্ণালী' নামে। ইনি আবার টেলিস্কোপের উপরও এক ধাপ

টেক্কা দিয়েছেন,—ইনি দূরের নক্ষত্র-অগ্নিস্তূপে কি জ্বলছে, লোহা, কার্বন বা ক্যালসিয়াম—তা বুঝে নেবার জন্য আপনার চোখের ওপর ছবি ফেলবেন—নানান বর্ণের ছবি। এর অনেক কাজ রয়েছে, কিন্তু বড় কাজ হল, উনি নক্ষত্রের হৃদ্‌পিণ্ড, তার জরায়ু এবং এমন কি তার রক্ত চলাচলের গতিপথটিও বাতলে দিতে পারেন—টেলিস্কোপের মতো প্রাচীনতার ঐতিহ্য নেই যদিও, তথাপি বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-গোষ্ঠীতে উনিও কুলীনের পিঁড়িই পেয়ে থাকেন। আপনারা ওঁকে অবশ্যই বেশী ঘাঁটাবেন না। উনি এক নির্ভুল বিশ্লেষক—সোনার সঙ্গে অন্য ইতর ধাতুর খাদ মেশানো রয়েছে কি না এবং মেশানো থাকলেই বা তার পরিমাণ কত, একবার তাকিয়েই তিনি তা বুঝে নেন। আপনারা আজ হয়তো মনেও করতে পারছেন না, সাদা যে সাতটি বর্ণের যোগফল, একথাটা ত প্রথম ধরিয়ে দিয়েছিলেন উনিই।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারে আমি অহেতুক বেশী সময় নিচ্ছি—কেন না, ওদের আপনারা ভাল করেই চেনেন—এর পর আমি আরও সংক্ষেপেই বলছি।

ইতিমধ্যে আপনারা শুনে রাখুন, ধেনুমণ্ডলের যে অঞ্চলটি দিয়ে 'অপরা' এখানে ছুটে চলছে, সেখানে তেমন দর্শনীয় কিছু নেই—। যেন অনুর্বর এক মরুভূমি—নক্ষত্রের ফুল এখানে নেই। উপমাটি বোধ হয় ভুল হল,—বলা উচিত ছিল, দশটিরও বেশী আলোকবর্ষে বিস্তৃত এক অন্ধকার সমুদ্রপথে অপরা ছুটে চলছে—২২টি আলোকবর্ষ দূরে অল্প কয়েকটি নক্ষত্র মিলে একটি নক্ষত্র দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করে রয়েছে,—এখানে এসে সম্ভবত ওটিই অপরার নিশানা, মহাসমুদ্রে "আলোকস্তম্ভ"।

এবার দেখুন, রেডিও টেলিস্কোপ—বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে নবাগত—এখনও উল্লেখযোগ্য কোন ঐতিহ্যের অধিকারী ইনি নন।

কিন্তু নবাগত হলেই বা কি ? আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান-সভায় অখণ্ড বিপ্লবের মন্ত্র শোনালেন। পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়সও নয়,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মহাকাশের দিকে তিনি একটি জানালা খুলে দিলেন। নিজে ত সর্বক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন, অন্যদেরও সেদিকে তাকাতে বলছেন,—বলছেন, দেখো, দেখো, Radio-universe বা বেতার ব্রহ্মাণ্ড। ইনি বলতে চাইছেন, দূরের জ্যোতিষ্ককে তোমার মুঠোর মধ্যেই নিয়ে এস বা তার গায়ের রঙ দেখে তার কোষ্ঠিপত্রই রচনা কর, কিছু আপত্তি করছি না, কোনকালে করবও না—কিন্তু মহাকাশে অথবা শত কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব থেকে ক্রমাগত যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ আসছে, তার উৎসমুখের খবর একমাত্র আমিই বলে দিতে পারি। হাজার কোটি বছর আগে ওই নক্ষত্রের দেহে যে জ্বালা ধরেছিল এবং তরঙ্গ-রূপে আপন দেহের খানিকটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে কেমন স্বস্তি পেয়েছিল, তা জানতে চাও ত তাকাও আমার রাজছত্রের দিকে।

কথাটি ঠিক, উনি যেখানেই যান, মাথায় থাকে এক প্রচণ্ড ছাতা, ইংরাজিতে antenna—বাংলা করা হয়েছে 'আকাশ তার'—কিন্তু আমার মনে হয়, ওটাকে তরঙ্গ-আধার বললেই উপযোগী হয়।

এই মহাকাশ অভিযানেও তিনি তাঁর সেই সুপরিচিত রাজছত্র নিয়ে এসেছেন,—আপনারা নিশ্চয়ই রকেটের চূড়ায় সেটা দেখে থাকবেন।

এর পর আসুন, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। ওকে সঙ্গে আনার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। কেন না, অমন স্পর্শকাতর জাত-কুলীন যন্ত্র অল্পই আছে। অল্প দিন হল উনি এসেছেন, জন্ম-তারিখ ঠিক আমার মনে নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। উনি আসা মাত্র আর একটি মহাজগতের দোর খুলে গেল—ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অণু-পরমাণু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের রহস্য একেবারে উন্মোচিত হয়ে গেল। এই নতুন যন্ত্র হাতে নিয়ে

জীবনের বংশগত ধারাবাহিকতা, সোজা কথায়, মানুষের ছেলেটি কেন মানুষ হয়—অথবা বিড়াল ছানাটি কেন বিড়ালই হয়, আকৃতি ও প্রকৃতিতে এই নিয়ম-শৃঙ্খলার বিধান, বা codeটি কি, 'দুরূহ ভাষার ততোধিক দুরূহ লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হল। যে ক্ষুদ্রতম স্তরে মাইক্রোস্কোপ ঢুকতে পারে না, ইলেকট্রন-প্রবাহের চোখ নিয়ে তিনি সেই অন্ধকারে ঢুকেছেন,—ক্ষুদ্রতম জিনিসকে পাঁচ লক্ষ গুণ বড় করে অন্ততঃ একটি মোটামুটি ধারণাও দিয়েছেন।

এর পর দেখুন, ইনফ্রা-রেড টেলিস্কোপ।—টেলিস্কোপ যেখানে প্রবেশ করতে পারে না, উনি সেখানেও প্রবেশ করতে পারেন। ধরুন, পুরোপুরি গ্যাসে ঢাকা একটি নক্ষত্র—। টেলিস্কোপ ওখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবে—কিন্তু "ইনফ্রা-রেড"এর সন্ধানী দৃষ্টি ওই গ্যাসপুঞ্জ ভেদ করে ভেতরকার জ্যোতিষ্কটি দেখে এসে তার হুবহু চিত্র আপনার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবে।

মনে আছে, বৃহস্পতি ও শুক্রের গ্যাসীয় আবরণ ভেদ করে তাদের আসল চেহারা দেখে আসার কৃতিত্ব ওদেরই। এর পর দেখুন "এনসেফেলোগ্রাফ"—আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রগুলি ঠিকমত কাজ করছে কি না, তাই দেখছেন উনি। দূর থেকেই দেখতে পান, মাথার সঙ্গে বেঁধে দিতে হয় না বা কোন 'গ্রাফ'-এ স্নায়ু-প্রবাহের তরঙ্গায়িত গতিও লিপিবদ্ধ হয় না—ইনি আমার মস্তিষ্কে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা দেখলে তা গোপনে জানিয়ে দেন সর্বজ্ঞ মশাইকে। এ ছাড়া আরও অনেক সঙ্গী রয়েছেন, তাঁদের কথা আমি এখানে বিশেষ বলছি না। এবার আসুন, সর্বজ্ঞ মশাইয়ের (নামকরণ—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ) সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এই অভিযানে আমার সর্বক্ষণের বন্ধু, পথ-প্রদর্শক এবং হয়তো বা আরও বেশী কিছু—একটি মানব যন্ত্রের হাতে আমি সমর্পিত। মানবরূপী যন্ত্র—এ মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। Robot বললে

তাকে ছোট করা হয় বলে আমিও ওর সে পরিচয় আপনাদের কাছে দিচ্ছি না। কিন্তু কেন তাঁর নাম সর্বজ্ঞ রাখা হল, সেটা শীঘ্রই আপনারা বুঝতে পারবেন।

সাতাশটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত দ্বীপপুঞ্জের কথা নিশ্চয়ই আপনারা ভোলেন নি। সেটা এখনও বেশ দূরে রয়েছে। নিজের চোখে তা দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্ঞের চোখ দিয়েও তা যাচাই করে নিলাম। 'অপরা' যখনই কোন নক্ষত্রের পাশ দিয়ে এগোতে থাকে অথবা কোন নক্ষত্রের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখনই তার—অর্থাৎ ওই মানব-যন্ত্রের চোখদুটি চাঞ্চল্যে নেচে ওঠে।

অন্যরা যা' করছে, যা' দেখছে—তিনি তার শুধু হিসাবই রাখছেন না, তিনি সেগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তেও পৌঁছুতে পারেন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে যদি কোন জীবাণুর চিত্র হাজির হয় অথবা রেডিও টেলিস্কোপ যদি কোন বেতার-তরঙ্গ কুড়িয়ে আনে, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে জমা হয় তাঁর ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কটি যে ইলেকট্রনিক-নির্ভর সে কথা হয়তো তিনি বিশ্বাস করতেও চান না। কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলে তিনি প্রয়োজনবোধে টেলিভিসন পর্দার ওপরে আমার জন্য তা হাজির করে থাকেন। সমস্ত যন্ত্রপাতি মিলে প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষাধিক তথ্য তাঁর মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে জমা হয়ে যাচ্ছে—আরও সোজা কথায় বলতে গেলে অন্যরা যা দেখছে তিনি তাই তাঁর স্মৃতিতে বেঁধে রাখছেন। বিরামহীন বিদ্যুৎ-স্পন্দন তাঁর মস্তিষ্কের চৌম্বক টেপ-এ দাগ রেখে চলেছে। তিনি Co-ordinator বা সমন্বয়-সাধক। প্রত্যেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানা হয়ে গেলে আসে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ডাক। তিনি ভুল করেন না,—তাঁকে আমি বুঝে নিই তাঁর চোখের বর্ণ দিয়ে। কটা লালবর্ণ বলে দেয় সর্বজ্ঞ মশাইয়ের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ ঘটেছে। শান্ত সবুজবর্ণ বলে দেয় সর্বজ্ঞ মশাই তাঁর

অপরিসীম ব্যস্ততার মধ্যেও শান্ত ও পরিতৃপ্ত রয়েছেন। চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল চোখের রঙ বলে দেয়, একটা কিছু আশঙ্কা। বিপদের পূর্বাভাষ তিনি পাচ্ছেন—পাচ্ছেন, রেডিও টেলিস্কোপ বা সাইক্লোট্রন যন্ত্রের কাছ থেকে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, এতগুলি যন্ত্রের ওপর তদারকি করতে হচ্ছে বলে সর্বজ্ঞ মশাই মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে ওঠেন—কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তেই হয়তো একটি ইনফ্রা-রেড তারকার অস্তিত্বের সংবাদ তাঁর মস্তিষ্কে পৌঁছে গিয়েছে, তিনি আবার তৎপর হয়ে উঠলেন।

কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্য দিয়ে 'অপরা' যাচ্ছে, মাঝে মাঝে তা আমার চোখ এড়িয়ে গেলেও সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক একটি মস্তিষ্ক তার চৌম্বক টেপ-এ তা গেঁথে নেয় এবং আমার মনে কোন প্রশ্ন জাগলেই টেলিভিসনের পর্দায় তার ছবি উঠে যায়। তবে কি সে অনুভূতিশীল? সম্ভবত তাই। আমি ঠিক বলতে পারছি না। এমন কি, দীর্ঘ সময়ের ঘনিষ্ঠতাও আমাকে এ সম্পর্কে কোন পরিষ্কার কথা বলতে পারে নি। তবে, এটাও আমি লক্ষ্য করেছি, তার স্নায়ুতন্ত্রগুলি যে আসলে চৌম্বক-টেপ-মাত্র, একথা মনে করিয়ে দিতেই সে যেন সরমে মরে গেল। সংকুচিত হয়ে উঠল—তার চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

আসলে সর্বজ্ঞ মশাই ভাবীকালের এবং নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর এক প্রতীক। যা আসছে বা যা প্রায় এসে গিয়েছে, তারই প্রতীক হয়ে তিনি আমার সঙ্গ নিয়েছেন। দেখামাত্র তাঁকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ভালবেসেছি একটি যন্ত্রকে নয়। যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যে ভাবীকাল আগমন প্রতীক্ষায় রয়েছে, তাকেই।

সর্বজ্ঞ মশাই আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসকও বটে। আমার অন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, হৃদ্‌পিণ্ড বা ফুসফুসে কোন রকম বৈকল্য দেখা দিলে আমার মস্তিষ্কে সেই বার্তা পৌঁছুবার সংগে সংগে সর্বজ্ঞ মশাইও তা জানতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি চোখ রাঙিয়ে ওঠেন এবং আমি তা বুঝে নিই।

আমার সারা দেহ জুড়ে অসংখ্য ধমনীতে অসংখ্য টেলিভিসন ক্যামেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—চিনির দানার চেয়েও ছোট এ সকল ক্যামেরা প্রতি মুহূর্তে আমার দেহযন্ত্রের পরিবর্তনশীল ছবি পাঠাচ্ছে সর্বজ্ঞের মস্তিষ্কে। আমি জানতেও পারি না,—আমার চেয়ে, আমার মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক ভাল্ করে আমার খবর রাখে ওই অপদার্থ বিদঘুটে যন্ত্রটি—যাকে আমি আদর করে ডাকি সর্বজ্ঞ। তাই সত্যিকারের রোগাক্রান্ত হওয়ার বা বাইরে রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠার অনেক আগেই তিনি জানতে পারেন, সংখ্যাতীত দেহকোষের প্রোটিন কারখানায় কি সমস্যা দেখা দিয়েছে, এনজাইম কারখানায় কেন 'লক-আউট' চলছে, কেন রক্তের লোহিত কণিকাগুলি উৎপাদন বন্ধ রেখে সব কিছু অচল করে দিচ্ছে, শ্বেত কণিকারাই বা কেন 'বিপ্লবের' ধ্বজা তুলে বসে রইল, কাটা ঘায়ের নির্দিষ্ট স্থানটিতে হাজিরা দিল না,—আমার দেহের সর্বত্র সে বার্তা পৌঁছুবার অনেক আগেই সর্বজ্ঞের কাছে তা ধরা পড়ল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর যান্ত্রিক হত বাড়িয়ে একটি,—মাত্র একটি বড়ি তুলে দিলেন, যার নাম দেওয়া যাক all purpose tablet, সর্বরোগহর বটিকা। ভাবীকালের চিকিৎসা-বিজ্ঞান হতে চলেছে এই package deal—বা পুঁটুলি বাঁধা ব্যবস্থা। Penicilin-এর Broad spectrum বলছে, এগিয়ে যাও এই পথে—আমি ত অন্ততঃ বিশটি রোগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি—একটু রকম ফের করে অবশ্যি। এর সঙ্গে জুটিয়ে নাও radio-active isotope—বা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

খুঁজে দেখো, পরমাণু চুল্লীতেই একদিন তুমি এটা পেয়ে যাবে। এটাও ভাবীকাল, যা রয়েছে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে, ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দৃষ্টিতে, তা নিয়ে আর কিছু বলা শোভন হবে না! কিন্তু ওই পুঁটুলি বাঁধা" চিকিৎসা-ব্যবস্থা সর্বজ্ঞের কাজ অনেকটা হালকা করে দিয়েছে—প্রতিটি মুহূর্তে যার মস্তিষ্ক দশ লক্ষাধিক বিদ্যুৎ-স্পন্দন গ্রহণ করছে,

বিশ্লেষণ করছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছুচ্ছে, তার পক্ষে এই দায়িত্ব হয়তো অসহনীয় হত।

কিন্তু, এর কোনটাই খুব বড় কথা নয়। আমার জীবনে, অর্থাৎ আমার এই যাযাবর যাত্রাপথে সর্বজ্ঞ আমার অভিভাবক। আমি আগেই বলেছি, সর্বজ্ঞকে দেখতে হবে ভাবীকালের পটভূমিকায়, অবশ্যম্ভাবী সার্থকতার মধ্যে। তার মুখে ভাষা দেওয়া যেত কিন্তু ইচ্ছা করেই দেওয়া হয় নি। একটি মাত্র কথা ছাড়া তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না। আমি যতদূর শুনেছি, তাকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে নিষ্ঠুরের মতো তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে—। শুধু একটি মাত্র কথা তার মুখে আটকে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রকে বঞ্চিত করা হয়েছে—তাকে কিছুতেই 'মানুষ' হতে দেওয়া হবে না—সে চিরকাল থাকবে প্রযুক্তি ও মানব-সভ্যতার ক্রীতদাস হয়ে। কিন্তু পৃথিবীব যন্ত্রবিদ্‌রা একটি কাজ করেছেন—। আমার মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করছে কি না, অর্থাৎ মহাকাশ ও মহাকালের প্লাবন-আলোড়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি আমার মস্তিষ্ক বিকল হয়ে যায়, যদি ভুলেযাই পৃথিবীর কথা, মানুষের কথা, ত্রিমাত্রিক বিশ্ব থেকে চতুর্মাত্রিক এই ছায়াজগৎ যদি আমার স্নায়ুযন্ত্রটিকে অক্ষম, অবশ ও অকর্মণ্য করে দেয়, সে আশঙ্কায় সর্বজ্ঞকে এমনভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে (programmed), পৃথিবীর সময়ের মাপে প্রতি পঁচিশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র সর্বজ্ঞ তার যান্ত্রিক গলা কাটিয়ে চিৎকার করে আমাকে জানিয়ে দেবে—

"তুমি পৃথিবীর সন্তান"

স্বাতি, তুমি অনির্বচনীয়া!

আপনারা মহাকাশ থেকে এই ধারা-বিবরণী শুনছেন। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একটি দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে রহস্যময়ী অপরা এগিয়ে যাচ্ছে। বাম পাশে, বোধ হয় 'অভিজিৎ' (Vega)—হাঁ, অভিজিৎ। আমি ওকে অনেক কাল ধরেই চিনি। একটি অপরিণত অবোধ শিশু একটি শীর্ণ জলস্রোতে লনচে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। যাওয়াটা তার কাছে বড় কথা নয়, বড় কথা হল, নদীতটের দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে চলা। কিন্তু মজার কথা হল এই, এপারের দৃশ্য যখন সে মন দিয়ে দেখছে, তখন তার চোখকে ফাঁকি দিয়েই ওপারের দৃশ্য অন্তরালে চলে যাচ্ছে। আবার ওপারের দিকে তাকাতেই এ পারের দৃশ্য ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে শুরু করল। ডান পাশের নক্ষত্র-কাহিনী যখন আমি পড়ছি, তখন বাম পাশে কত বিস্ময় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল. বুঝতেই পারলাম না। অপরা আমাকে মহাকাশের সে অঞ্চলে নিয়ে এসেছে যেখানে চাঁদের পুরাকাহিনী বর্ণিত সপ্তবিংশতি পত্নীরা রয়েছেন। তাঁরা এখানকার একটি পাড়া দখল করে রয়েছেন বলে আমি আগেই শুনেছি—। তার মধ্যে দ্বাদশটি পত্নী দক্ষরাজের কন্যা। কী যে তাদের অপরাধ, জানি না। কিন্তু চাঁদ বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠেই ওদের সকলকে চালান করে দিলেন প্রায় চল্লিশটি আলোকবর্ষ দূরে। ওদের কুল বজায় রাখা ছাড়া চাঁদের আর কোন আইনগত কর্তব্য ছিল না নাকি? তবুও তিনি ওদের জন্য একটি কাজের মত কাজ করেছেন,

আমাদের মাসগুলির নাম তিনি ওদের নাম অনুসারে রেখেছেন :— বিশাখা—বৈশাখ ; জ্যেষ্ঠা—জ্যৈষ্ঠ ; পূর্ব আষাঢ়া—আষাঢ় ; শ্রবণা—শ্রাবণ, ভদ্রা—ভাদ্র ; অশ্বিনী—আশ্বিন ; কৃত্তিকা—কার্তিক ; মৃগশিরা—অগ্রহায়ণ ; পুষ্যা—পৌষ ; মঘা—মাঘ ; ফাল্গুনী—ফাল্গুন ; চিত্রা—চৈত্র। রোহিণী ছিলেন এই পত্নীকুলের প্রধানা। এই তের জনের বাইরে রয়েছে স্বাতী, সপ্তবিংশতি পত্নীর অন্যতমা। স্বাতী আমাকে দেখে যেন হেসে উঠল। ওর সম্পর্কে নানাদেশে নানা কাহিনী রয়েছে— চাঁদের এই অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে নাকি কোন এক মহামুনির একটি গোলমেলে সম্পর্ক ছিল,—চাঁদ সেটা টের পেয়েই তাঁকে সোজা চালান করে দিলেন সেই নির্বাসন-দ্বীপে যেখানে আগেই তাঁর দ্বাদশ পত্নী নির্বাসিত রয়েছে। এ সম্পর্কে হলফ করে আমি কিছুই বলতে পারছি না—কেননা, মহাজাগতিক মামলা-মোকদ্দমার নথিপত্র আমার হাতে আসে নি। আর ব্যাপারটি 'ডিভোর্স', না 'জুডিসিয়াল সেপারেশন', সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিও অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে। কাগজপত্রগুলি হাতে এলে পর একটা 'হেবিয়াস কর্পাসের' মামলা যে ঠুকে দেওয়া যেত, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আর, চাঁদের চরিত্রটিও যে সন্দেহের ঊর্ধে নয়, সে তো শ্রোতারা নিশ্চয়ই জানেন। কোন এক কড়া মেজাজের মুনির আশ্রমের অন্দরে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে সেই ক্রোধোন্মত্ত মুনি যে ওর গালটি কামড়ে দিয়ে খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছেন, সে কাহিনীর তো নির্ভরযোগ্য রেকর্ড আপনারা দেখেছেন। মুনি বা মুনিপুত্রের সঙ্গে স্বাতীর গোলমেলে সম্পর্ক যাই থাকুক, এক সুন্দরী ব্যভিচারিণী তার অভ্যর্থনা নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। চাঁদের অন্যান্য পত্নীরা বিনা প্রতিবাদে এই অন্যায় দণ্ডাদেশ মেনে নিলেও স্বাতী তুলে দিয়েছে বিদ্রোহের পতাকা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদিনী স্বাতীই। মহাজাগতিক অন্ধকূপে প্রবেশের মুখেই দেখতে পাচ্ছি চিরকালের শৃঙ্খলিতা বন্দিনী স্বাতীকে।

স্বাতী সম্পর্কে পৃথিবীর নানাদেশে নানা কাহিনী। তার মধ্যে ভারতীয় কাহিনীটি আপনারা জানেন এবং আমিও বলেছি। নীল নদের তটভূমিতে স্বাতীর পরিচয় মহাকাশের ছিঁচকাঁদুনে আদুরে কন্যা-রূপে। সংগত কারণেই এই পরিচয় আমি স্বীকার করে নিতে পারছি না। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে প্রবাল দ্বীপমালার ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর এক রাখাল বালকের প্রেমে পড়েছিল স্বর্গের রূপসী কন্যা স্বাতী। বিধাতা তা টের পেয়ে গেলেন এবং স্বর্গের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজনে তিনি স্বাতীকে মহাকাশের অন্ধকূপের ধারে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে রেখে মহাকাশের অন্যত্র ইনস্পেকশন ট্যুরে বেরিয়ে গেলেন।

বিজ্ঞানীদের কথা হল, স্বাতী (Arctrus) একটি 'অঙ্গার তারকা' (Carbon star)। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, সূর্যের মতো একটি সাধারণ তারা। পুরাকাহিনীতে যাই লেখা থাকুক বা বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, আমার সামনে এক অপূর্ব-রূপসী তার মুখের ওড়না খুলে দাঁড়াল। কিন্তু, তা একটি মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে দেখলাম এক রুদ্রাণীকে—প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে উঠে শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখলাম, তার গলায় আরও সপ্ত সূর্যের মাণিক্য-মালা, ললাটে তার দুটি নীল নক্ষত্র. ভয়ঙ্করী তার রক্তবর্ণ লালায়িত জিহ্বা বের করে তার জীবন-ভর কলঙ্কের কাহিনী মুছে দেবার জন্য আসছে এ দিকেই, আমার দিকেই – সম্ভবতঃ আমি চাঁদের সীমানা থেকে এসেছি বলে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আবার কি হল? লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ-জটাজাল ছড়িয়ে দিয়ে ওই একচক্ষু লোহিতবর্ণা পিশাচী মহাকাশে লাফিয়ে বেড়াতে শুরু করল। জটায় জটায় সহস্র নক্ষত্রের গ্রন্থি আন্দোলিত করে বন্ধনমুক্তির নিদারুণ প্রয়াসে সে যেন ওই অন্ধকূপের প্রান্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল। পারল না। অতএব, এক নিদারুণ আক্রোশের মত্ততায়

যুগপৎ লক্ষ জ্যোতিঃ কণা তুলে আর কাউকে সামনে না পেয়ে মহাকাশের শূন্যতায় ছোবল মেরে চলল।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওর অগ্নিগর্ভে রয়েছে তেজস্ক্রিয় কার্বন এবং তার ফলেই ওর শিখাগুলি মাঝে মাঝে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে ওঠে, তার সুন্দর মুখখানা কালো মেঘে ঢেকে যায়।

বিজ্ঞানীরা একথাও বলছেন, ওর সারা দেহে ছিল নাইট্রোজেন-কণিকা, মহাজাগতিক রশ্মি এসে আঘাত করে সেই নাইট্রোজেনকে রেডিও কার্বনে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, আমি ওই ব্যভিচারিণীর ইতিহাস জানতে চাই। আমি তার বর্ণালি দেখে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দেখব। স্পেকট্রোস্কোপটি তাক করলাম স্বাতীর দিকে, তাকালাম। বন্ধন-মুক্ত প্রোটন-ইলেকট্রন প্লাজমায় থাকবে তার ব্যভিচারের প্রমাণ—। আমি তার দেহ-রক্তের শ্রেণীবিভাগ করব, এগিয়ে যাবো, নাক্ষত্রিক অয়ন-সূত্র ধরে দেখব স্বাতী সত্যই অপরাধী কিনা। আমি খুঁজে বের করব সেই ঋষি বা ঋষিপুত্রকে, স্বাতীর কপোলে কলঙ্কের টিকা এঁকে দিয়ে যে দুর্বৃত্ত পালিয়ে গিয়েছে। আমি স্বাতীর দেহের প্রতিটি রক্ত-কণিকা পরীক্ষা করব,—দেখব, সেই রক্তস্রোতে মিশে রয়েছে কিনা অন্য কারো দেহের রক্ত। স্বাতী, অগ্নিময়ি! এবার তোমার অগ্নিপরীক্ষা! যৌনরসসিক্তা স্বাতি, অন্য কারো দেহের ধাতু রয়েছে কিনা তোমার দেহে, আমি তাই দেখব। শক্ত হাতে স্পেকট্রোস্কোপটি তাক করে আমি তার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে রইলাম স্বাতীর জরায়ুর দিকে,—সেখানে সে কিছুই গোপন করতে পারবে না……। কিন্তু, হঠাৎ এ কী দেখছি! স্বাতী তার দেহের প্রতিটি অলঙ্কার ছুঁড়ে দিল মহাকাশের দিকে,—। প্রতিটি জটা ছুঁড়ে দিল লক্ষ বা কোটি মাইল দূরে অন্য নক্ষত্রদের গৃহপ্রাঙ্গণে,—তারপর তার প্রতিটি অঙ্গও সে একটি একটি করে ছুঁড়ে দিয়ে এক অস্তিত্বহীন বিভীষিকা,—। পর

মুহূর্তেই আবার সে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুড়িয়ে এনে এক কৃষ্ণবর্ণ নগ্নিকা-রূপে মহাকাশে নেচে বেড়াতে শুরু করল।

এই উন্মত্ততার মাঝে স্পেকট্রোস্কোপটি আর তার দিকে তাকাতেই পারছে না। তার বর্ণালি অসংখ্য ছেদচিহ্নে ভরে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে শোষণ-চিহ্ন এমনই এলোমেলো যে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না—। আমি হাত গুটিয়ে নিয়ে এক কৃষ্ণবর্ণা, ভয়ঙ্করীর দিকে তাকিয়ে রইলাম—। দূরে শ্রবণাকে দেখছি, দেখছি পুষ্যাকে এবং দেখছি অন্যদেরও—কিন্তু বন্ধনমুক্তির জন্য এমন পাগল হয়ে উঠতে আমি আর কাউকেই দেখছি না। বিজ্ঞানীরা যাই বলুন, এক চিরনির্বাসিতার বন্ধন-মুক্তির সংগ্রাম আমাকে মুগ্ধ করল। জানি, সে কোনদিন মুক্তি পাবে না। মহাজগতের মহাকর্ষ-বন্ধন এমনই কঠিন যে তার মুক্তির কোন সম্ভাবনাই নেই। নাম মুক্তি পেলেও তার সামনে রয়েছে যাকে বলা হয়, মহাজাগতিক অন্ধকূপ। সেখানকার অতল গহ্বর রূপসী ভয়ঙ্করীকে গ্রাস করার জন্য হাঁ করে রয়েছে।

অপরার বুকে দাঁড়িয়ে দেখছি, মহাকাশে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে স্বাতী। শেষবারের মতো তাকালাম তার দিকে। শৃঙ্খলিত ব্যভিচারিণী তার কার্বন ধোঁয়ার আবরণটি সরিয়ে ফেলে আমার দিকে তাকাল। এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি। আবার যদি কোনদিন এ পথে আসা হয়, অপরার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার সমাপ্তি দিনের আগে যদি আর একবার এখানে আসতে পারি, তবে আবার দেখব স্বাতীকে—রুদ্রাণীকে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে শ্রবণা, বিশাখা, ভদ্রা,—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি, নির্বাসিত জীবনের বিষণ্ণতায় আনত, আত্মসমর্পিত ও প্রতিবাদহীন, তাদের জন্য আমার সহানুভূতি—বিদ্রোহিনী স্বাতীর জন্য আমার ভালবাসা এবং শুধুই ভালবাসা।

মহাজাগতিক অন্ধকূপের কিনারায় পঞ্চাশটি আলোকবর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

'অভিজিৎকে' এক পাশে রেখে অন্ধকার সমুদ্র-পথে অপরা এগিয়ে চলছে— কি যে তার লক্ষ্যস্থল, জানি না, জানার কোন উপায়ই নেই। মোটামুটি এ অবস্থাটি আমি মেনে নিয়েছি। কেননা, অপরা এমন এক অর্ণবপোত যার কাছে ঝড়ঝঞ্ঝা বা বিপদের কোন অর্থই নেই। সে তার চলার পথে চলবেই। কিন্তু একটি কথা মনে উঠতেই আমি যেন ভয়ে কেঁপে উঠলাম। অপরা যেখানে প্রবেশ কবতে যাচ্ছে, সেখানে রয়েছে মহাজাগতিক নিষিদ্ধ এলাকা অথবা মহাজাগতিক অন্ধকূপ। বিজ্ঞানীদের কাছে আমি শুনেছি, অভিজিৎ-এর সীমানা পেরিয়ে অন্য নক্ষত্রের রাজ্যে প্রবেশের পথে রয়েছে একটি অন্ধকূপ। অপরা কি সেই অন্ধকূপেই ঝাঁপ দিতে চলেছে? ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না কিন্তু, চিৎকার করে উঠলাম। তাকালাম সর্বজ্ঞের দিকে। যদি ও কিছু জানে, যদি আগাম কিছু বলে দিতে পারে। কিন্তু, বিপদের কোন আভাসই নেই সেখানে। খানিকটা স্বস্তি লাভ করে তাকালাম বাইরের দিকে। বিজ্ঞান-বর্ণিত সেই মূর্তিমান ভয়াবহতা। একটি বিস্তীর্ণ এলাকা—ধরা যাক, পুরো একটি আলোক-বর্ষ জুড়ে— অন্ধকার। অপরা সেই অন্ধকারের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। আশেপাশে ছোট-বড় অসংখ্য নক্ষত্র, তথাপি এই অন্ধকার। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করছি—কেন? কেন এই অন্ধকার? হাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছি, সর্বজ্ঞের চোখে চাঞ্চল্য কাঁপছে—কিন্তু, অন্য দিকে চোখ ফেরাতেই··· আপন কক্ষে নিশ্চিন্তে বিচরণশীল এক নীল নক্ষত্র বিপুল বেগে বহু দূর থেকে ছুটে আসছে। তার আলোক-প্রভা অপরার চির-অন্ধকার পথটিকেও আলোকিত করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, অপরাও

নীলবর্ণা হয়ে উঠেছে, মহাশৃঙ্গ ও নিথর সমুদ্র,—সবাই নীল বর্ণে স্নান করছে। দৃশ্যটি আমি চমৎকার উপভোগ করছি, মুগ্ধ হয়ে উঠছি। অপরার স্বপ্নজগতে আর একটি স্বপ্নের ছায়াপাত। এমন নীলবসনা সুন্দরী আমি আগে কোনদিনই দেখিনি। আবার তাকালাম নক্ষত্রটির দিকে। নেই, সে কোথাও নেই। অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে; আমি কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ইতিমধ্যে, নীল বসনটিও কে যেন তুলে নিয়ে গেল। সে নক্ষত্র নেই, কোথাও নেই।

তাকিয়ে দেখছি, সর্বজ্ঞের চোখ দুটি তখনও চঞ্চলতায় কাঁপছে। পরমুহূর্তে আর একটি পীতবর্ণের নক্ষত্র ওই অন্ধকারের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকেও আর দেখা গেল না। এবার আর বুঝতে বাকি রইল না একটি অন্ধকূপের পাশ দিয়েই অপরা অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনে ও পিছন থেকে বিচিত্র বর্ণের হাজার হাজার নক্ষত্র এসে সেই মৃত্যুকূপে ঝাঁপ দিল। আমি কি শিশুর কান্না, বৃদ্ধের আর্তনাদ এবং যৌবনের কলরব একই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি? এখনও ঠিক বুঝতে পারছিনা। বহুদূরের আর এক ঝাঁক নক্ষত্রও ঠিক সেভাবেই উড়ে আসছে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এমনকি, বহুদূরের অন্য এক নক্ষত্রের আলো ওই পথ দিয়ে যাবার কালে মৃত্যুগহ্বর তাকেও শুষে নিল। ওরা হাসছে। খেলতে খেলতে হাসি ছড়াতে ছড়াতে আসছে। অনন্ত মৃত্যুর দোরে দাঁড়িয়েও একবার হাসছে—তারপর নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি।

এই ভয়াবহতার সামনে আমি তাকিয়ে আছি সর্বজ্ঞের দিকে—বুঝতে পারছি, ভয়ে সেও বিহ্বল। ওখানে, ওই অন্ধকারের মধ্যে এমন কেউ লুকিয়ে রয়েছে, এমন কোন অদৃশ্য শক্তি, যা মহাকাশের সবকিছুকে টেনে নেবার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

একটু এদিক ওদিক হলে, অর্থাৎ অপরা একটু ওদিকে

হেলে পড়লে আর রক্ষা নেই। ওই অন্ধকার অপরাকেও গ্রাস করবে।

আতঙ্কে যেন এতটুকু হয়ে যাচ্ছি, সর্বজ্ঞকে জড়িয়ে ধরছি এবং তাকে জড়িয়ে ধরেই, অর্থাৎ একটি যন্ত্রকে জড়িয়ে ধরেই 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে অসহায়ের মতো চীৎকার করছি—তার ওই চঞ্চল চোখের কোণে একটি স্বস্তির রেখা পড়ল কিনা, গভীর আগ্রহে তাই খুঁজছি। আবার তাকে ছেড়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকছি মহাকাশের মহাশ্মশানের দিকে—যেখানে শুধু মৃত্যু, অবলুপ্তি। বিজ্ঞানীরা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব হাতড়ে যার ঠিকানা পেয়েছেন। এটা আইনষ্টাইনের দেওয়া ঠিকানা, এই ঠিকানায় ভুল হয় না। ১৯০৫ সাল থেকে এই হাতড়ানো শুরু হয়েছে; আজও শেষ হয়নি—হয়তো আগামী এক শতাব্দীতেও হবে না। ইতিমধ্যেই মহাকাশের অন্য অঞ্চলে তাঁরা একাধিক অন্ধকুপ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু, কেন এই অন্ধকুপ? নাক্ষত্রিক বিবর্তনে এই মৃত্যু-ভূমির ইতিহাসই বা কি?

অপরার বুকে নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আমি সেই অন্ধকারে উঁকি মেরে দেখছি—অন্তহীন অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথের অপর প্রান্তে এক অতিকায় নক্ষত্রের কঙ্কাল। সূর্য অপেক্ষা দুই, বা তিন শতগুণ বড় এক নক্ষত্র তার সমস্ত পারমাণবিক জ্বালানি নিঃশেষ করে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। যার ছিল দুই বা তিন শত সূর্যের তাপ ও আলো,—তার নেই বলতে কিছুই রইল না। এক অসহায়তার মৃত্যুদশায় পড়ে সে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ল। ফলে, তার বস্তু-স্তূপ এমন ঘনীভূত হয়ে গেল যে সেখানে একটি দেয়াশলাই কাঠির ওজন প্রায় এক টন হয়ে গেল।

এ অবস্থায় তার দৈহিক পদার্থগুলি রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অভিকর্ষ শক্তিতে,—প্রবাহিত তরঙ্গে। এবং সেই অদৃশ্য শক্তির জোরেই মহাকাশে তার নাগালের মধ্যে সব কিছুকে মৃত্যু গহ্বরে টেনে

নিয়ে যাচ্ছে। সর্ব-বিনাশী একটি নক্ষত্র কঙ্কাল দেখছি, আর বারবার শিউরে উঠ্‌ছি। ওখানে ক্ষমা নেই, উদারতা নেই, একটি নক্ষত্রের মৃত্যু শত সহস্র বা, লক্ষ নক্ষত্রের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছে।

অন্ধকূপের আদি-অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে একটি কঙ্কাল শুয়ে আছে,—শুধুই একটি কঙ্কাল—আর ঠিক সে মুহূর্তেই একটি নক্ষত্র, আকৃতিতে ও প্রভায় সূর্যের সমান, ওই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিল। তবে কি সূর্যই? ঠিক বুঝতে পারছিনা; সর্বজ্ঞের দিকে তাকিয়েও কোন জবাব পেলাম না।

কিন্তু, একটি ভয় ও আশঙ্কা আমার মনের উপর পাষাণ-চাপা হয়ে রইল। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি……ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে সূর্য তার গ্রহ পরিবার নিয়ে ওই মহাশ্মশানের আকাশে উপস্থিত। প্রতিবাদহীন নিঃশব্দতায় সেই মৃত্যু গহ্বরে প্রথম প্রবেশ করল অধিরাজ সূর্য, তার পেছনে একে একে বুধ, মঙ্গল, পৃথিবী…সব ক'টি গ্রহ। হংস মণ্ডলের কাছাকাছি কোন একস্থানে এই সৌর-বিপর্যয় ঘটল। পৃথিবী একদা জেগে উঠে দেখল, তার আকাশে সূর্য নেই। মহাকাশে সূর্যকে খোঁজাখুঁজি শুরু করার কয়েক দিনের মধ্যেই পৃথিবী দেখল বুধ নেই,—আর একদিন সে দেখল, আকাশে মঙ্গল গ্রহ নেই। তারপর সেই ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ পরিণতি। অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীরও বিলুপ্তি…।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি অনন্ত আকাশের দিকে তাকাই। পৃথিবীকে খুঁজতে থাকি। কোটি নক্ষত্ররাজ্যের ওধারে কোথায় রয়েছে ওই জ্যোতিষ্করূপী কল্যাণী—যার নাম আমরা দিয়েছি পৃথিবী। সে পৃথিবীর কথা এখানে কেউ জানে না।

ইতিমধ্যে আর একটি নক্ষত্র সেই অন্ধকার কূপে ঝাঁপ দিল। একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র। এর কোন গ্রহ ছিল কি না, জানি না। পৃথিবীর মতো জীবন-ধাত্রী কোন গ্রহ? মানুষের মতো বুদ্ধিবৃত্তিশীল,

তরুলতার মতো মূক ও ধৈর্যশীল? কোথাও কোন জবাব নেই। তবুও আমি যেন কান্না শুনতে পাচ্ছি—অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে কান্না, শুধুই কান্না—সেই কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে আমি কি পৃথিবীর কান্নাও শুনতে পাচ্ছি?

এক মৃত নক্ষত্রের অভিকর্ষের অদৃশ্য হাতগুলি অপরাকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে। এক একবার আতঙ্কিত হয়ে উঠি—আতঙ্কিত হয়ে সর্বজ্ঞের দিকে তাকাই। কিন্তু, অপরা ছুটে চলেছে বহুদূরের পথ দিয়ে। সে সম্ভবত ছুটে যাচ্ছে সেদিকেই যেখান থেকে দেখা যাবে অন্য ছায়াপথ, অন্য দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড—কিন্তু, এই অন্ধকূপের অপর প্রান্ত রয়েছে কি অন্য দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডেই? ঠিক বলতে পারছিনা। অপরা আবার ছুটে চলছে নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায়, নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে।

ছায়া নক্ষত্রের সন্ধানে : দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে

শ্রোতারা মার্জনা করবেন, ইতিপূর্বে একাধিকবার কথিত ব্যাপারটি আবার উল্লেখ করছি। অন্ধকার রাতে আপনাদের মাথার উপরে আকাশের দক্ষিণ থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে যে ছায়াপথ, আলোয় আলোময় সে রাজপথের সংকীর্ণ এক অন্ধকার প্রণালী পথ থেকে আমি কথা বলছি—বলছি, পৃথিবী থেকে চার শত আলোকবর্ষ দূরে ধনুরাশি মণ্ডল থেকে। এরপর কোথায় যাব, কিচ্ছু জানি না। নিয়তি আমাকে এক যাযাবর পৃথিবীতে তুলে দিয়ে মজা দেখছে হয়তো। আমি বেরিয়েছিলাম সূর্য সাম্রাজ্য প্রদক্ষিণ করব ব'লে—সংকল্প ছিল লুব্ধককে দেখে নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে যাব। আমি তথা-কথিত মহাজাগতিক হিমঘরে ঢুকেছি, সেখানে ধূমকেতুদের গোপন আবাসে আনাগোনা করেছি, 'কোহোতোক'কে খুঁজেছি, 'হ্যালি'কে (ধূমকেতু) খুঁজেছি। পাইনি। শুনেছি তারা সূর্যলোক প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে—আর কোনদিন হিমলোকের শূন্য ঘরে তারা

ফিরবে না। একদিন সূর্যের অগ্নিগহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে তারা তাদের অভিশপ্ত ক্রীতদাস জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। তারপর, ক্রমে ক্রমে এলাম আলফা সেণ্টুরির আকাশে, বার্ণার্ডের আকাশে এবং শেষ পর্যন্ত লুব্ধকের আকাশে। সেই আকাশের হিম-অন্ধকার থেকে অপরা আমাকে তুলে নিয়ে এল এবং ছুটে চলল ছায়াপথের আন্তঃনক্ষত্র লোকের দিকে। এ আমি চাই নি; কিন্তু, যখন বুঝলাম, জ্যোতিঃ বিজ্ঞানী শ্যাপলি বর্ণিত কল্প-পৃথিবী আমাকে তুলে নিয়ে ছুটে চলছে এক নক্ষত্রলোক থেকে অন্য নক্ষত্রলোকের দিকে, তখন, প্রতিবাদও করিনি। অপরা আমাকে এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কি যে আনন্দ পাচ্ছে, বুঝি না। কিন্তু এক যাযাবর পৃথিবীর অদৃষ্টের সঙ্গে আমার অদৃষ্ট গেঁথে গিয়েছে এবং গেঁথে গিয়েছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। সর্বজ্ঞকে আমি সে কথাটি বুঝিয়ে বলেছি—কেননা, তার যান্ত্রিক মস্তিষ্ক এধরনের নিরুদ্দেশ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার মস্তিষ্ককে এখন লক্ষ বা, কোটি নক্ষত্রের বেতারতরঙ্গ কুড়োতে হচ্ছে, আরও কোটি নক্ষত্রের গ্রহগুলির কাছে প্রযুক্তি বিদ্যায় উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিশীলদের উপস্থিতির সম্ভাবনা আশা করে বেতার-লিপি পাঠাতে হচ্ছে, প্রতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি বিদ্যুৎ স্পন্দনের সঙ্কেত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সর্বজ্ঞ নিরতিশয় অস্বস্তিবোধ করছে—কিন্তু, আমিই বা কি করতে পারি? যে নিয়তি আমাকে অপরার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে, সেই নিয়তিই আবার সর্বজ্ঞকে আমার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। সেই নিয়তিই অপরাকে অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট পথে ঠেলে দিচ্ছে—কিন্তু, এ কী? সামনে যে কশ্যপী দাঁড়িয়ে আছে, দেখছি! শ্যামল, সবুজ, তৃণবর্ণ নক্ষত্র আর দেখিনি। ছায়াপথের উত্তর খণ্ডে পৃথিবী থেকে দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে দশটি আলোকবর্ষে বিস্তৃত এক শ্যামল-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীকে দেখছি আমি। ধনুর্রাশি মণ্ডল থেকে অপরা কোন্ পথে এখানে এসে

হাজির হল বুঝতে পারলাম না। সর্বজ্ঞ—যার মাথায় অপরার পথ-চিত্র আপনা থেকেই আঁকা হয়ে যাচ্ছে, সেও কোন হদিশ দিতে পারল না। বরং, এই প্রথম একটি সবুজ-বর্ণ নক্ষত্র দেখে আমার মতো সেও পুলকিত। আমি তার চোখের বর্ণ দেখে বুঝতে পাচ্ছি, মহাজাগতিক অন্ধকূপের বীভৎসতার ছবি তার স্মৃতি থেকে একেবারেই মুছে গিয়েছে—। কিন্তু, কশ্যপমণ্ডলের দ্বার পথে দাঁড়িয়ে কশ্যপী আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা হয়তো বলবেন, ওর দেহ আগাগোড়া ক্যালসিয়ামে তৈরি, তেজস্ক্রিয় ক্যালসিয়াম ওই বাষ্প-মেঘ সৃষ্টি করছে। না, ওসব আমি শুনতেই চাইনা। আমি ওই অনন্ত যৌবনের অঙ্গচ্ছেদ করতে চাই না। স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে আমি স্বাতীকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম, পারিনি। আমি ওই অনন্ত-যৌবনাকে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে চাই—তার দেহের অনু-পরমাণু বিশ্লেষণ করতে চাই না। কশ্যপীকে এক পাশে রেখে অপরা তাঁরই সাম্রাজ্য কশ্যপ মণ্ডলে প্রবেশ করছে—। সর্বজ্ঞ টেলিভিশনের পর্দায় আমাকে সেই পথ চিত্র এঁকে দেখাল।

কশ্যপ মণ্ডল। চির-যৌবনা কশ্যপীর সাদর সম্বর্ধনা। আমি পুলকিত শিহরিত হচ্ছি এ সম্ভাবনায় যে কশ্যপ মণ্ডলে 'Ghost Star' বা ছায়া নক্ষত্রদের সন্ধান মিলতে পারে। বিজ্ঞানীরা আমাকে বলে দিয়েছেন, মহাকাশের এক পরম বিস্ময় হচ্ছে ছায়া নক্ষত্র। যদি সে বিস্ময় দেখতে চাও, তবে যাও কশ্যপীর কাছে। ছায়াপথের সেই প্রাচীনতম অঞ্চলে অধিকাংশ নক্ষত্রেরই মৃত্যু ঘটেছে। সেই বিরল-বসতি অঞ্চলে আসল নক্ষত্রের মাঝে মাঝে দুচার দশটি ছায়া নক্ষত্র ও খুঁজে পাবে। আমি ছায়া নক্ষত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী মহলের একটি বহু প্রচলিত মজাদার গল্প আপনাদের শুনিয়ে রাখছি। ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতত্ত্ব ঘোষিত হবার পর যে তিনজন বিজ্ঞানী চট্ করে

ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডাচ্ বিজ্ঞানী de Sitter, অন্য জন হচ্ছেন বেলজিয়ান জ্যোতিঃ বিজ্ঞানী Lemaitre এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Minkowsky। কিন্তু তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞান জগতের অন্যতম দিক্‌পাল Eddington আপেক্ষিকতত্ত্বকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন: Non-sensical pardcxes। খবর পেয়ে de Sitter ছুটে এলেন ব্রিটেনে। Eddington-এর সংগে দুঘণ্টা কথা বললেন। দুঘণ্টা পরে যখন দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন দেখা গেল Eddington-ই আপেক্ষিকতত্ত্বের সর্ব-প্রধান ব্যাখ্যাতা।

এই ঘটনার প্রায় পনের বছর পরে আইনষ্টাইনের finite but unbounded (সীমা আছে, কিন্তু সীমানা দিয়ে বাঁধা নয়) ব্রহ্মাণ্ড চিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে Eddington American astrnomical Society-র বিজ্ঞানী-সভায় বক্তৃতায় বলছেন: We must accept univ rse as finite and unbounded We can thus imagine space to be populated not only with real stars and galaxies, but with ghosts of stars which existed 6000 million, 12,000 million, 18000 million etc years ago.

অতএব, ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীনতম নক্ষত্রদের এই মণ্ডলে আমি ছায়া-নক্ষত্রদের খুঁজছি, প্রতিটি নক্ষত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছি। কিন্তু, কোথায় তারা? প্রতিটি নক্ষত্রের সঙ্গে থাকবে এক বা, একাধিক ছায়ানক্ষত্র। আকৃতিগত কোন পার্থক্যই থাকবেনা। শুধু, ছায়াগুলির বর্ণ হবে তুলনায় অধিকতর গাঢ় রক্তবর্ণ। সে রকম একটিও দেখছি না।

কিন্তু, কেন এমন হয়? কেন এমন হবে? আইনস্টাইনের কথামতো যদি আমরা স্বীকার করে নিই ব্রহ্মাণ্ড সসীম এবং গোলাকার,

তবে ব্যাপারটি বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। গোলাকার ব্রহ্মাণ্ডে যে আলোকরশ্মি তার উৎস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোন রকম বাধা না পেলে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা শেষে সে তার উৎস-স্থলেই ফিরে আসবে, যেমন, গোলাকার পৃথিবীতে যে কেউ ক্রমাগত পূর্ব দিকে চলতে থাকবে, সে একদা পশ্চিম থেকেই আবার তার যাত্রাস্থলে ফিরে আসবে।

যে কোন নক্ষত্র থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মি পথে কোন বাধা না পেলে আবার সেই নক্ষত্রের কাছেই ফিরে আসবে, তৈরি করবে একটি প্রতিচ্ছবি। এ কাজ সমাধা করে আবার সে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমায় বেরিয়ে যাবে—ফিরে এসে তৈরি করবে আর একটি প্রতিচ্ছবি। এ ভাবেই প্রতিচ্ছবির পর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়ে চলবে—অর্থাৎ, ছায়া-নক্ষত্রের পর ছায়ানক্ষত্র। পাশাপাশি তারা চলতে থাকবে।

এমন দিন আসবে যখন আমাদের সূর্যের পাশেই আর একটি সূর্য উঠবে, ছায়াসূর্য—আবার বহু দিন পরে আর একটি ছায়াসূর্য।

* এখানে একটি কথা শ্রোতাদের আমি বলে রাখছি। Eddington বলেছিলেন, নক্ষত্রের জন্মের ছয় শত কোটি বছর পরে প্রথম ছায়ানক্ষত্রটি ভেসে উঠবে, তার পর আর একটি নক্ষত্র ১২ শত কোটি বছর পরে। তখনকার হিসাবে ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি ছিল ছয় শত কোটি আলোক-বর্ষ। কিন্তু, হাল আমলের হিসাবে সেটা অনেক বেড়ে গিয়েছে—একটি আলোক-রশ্মির ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা শেষ করতে লাগছে ১০ হাজার কোটি বছর—।

মহাকাশে সূর্যের প্রথম আবির্ভাব ৫ শত কোটি বছর আগে—অতএব ছায়াসূর্য দেখতে হলে এখনও প্রায় ১০ হাজার কোটি বছর প্রতীক্ষা করতে হবে।

বুঝতে পারলাম, কশ্যপী থেকে প্রথম যে আলোক-রশ্মি বেরিয়ে গিয়েছে সে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা এখনও শেষ করতে পারেনি—সে জন্যই কশ্যপীর পাশে ছায়াকশ্যপীকে এখনও আমি দেখতে পচ্ছিনা।

জন্মদিনের তরুণ সূর্যের ছবি নিয়ে যে আলোক-রশ্মি ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমায় বের হয়েছে, সে আজও ফিরে আসেনি। ফিরে আসবে ১০ হাজার কোটি বছর পরে; দশ হাজার কোটি বছর পরে সূর্যের পাশে আর একটি সূর্য; ছায়াসূর্য।

কিন্তু, সূর্যের আয়ু আর মাত্র ১৫ শত কোটি বছর, অতএব, ছায়া-সূর্য যেদিন উঠবে, আকাশের সূর্য সেদিন মরে গিয়েছে।

ছায়াসূর্য এসে সেদিন আসল সূর্যকে খুঁজে বেড়াবে। দশ হাজার কোটি বছর পরে পৃথিবীও থাকবে না। যদি কোন অভাবিত অস্তিত্বে পৃথিবী থাকেই তবে টেলিস্কোপ তাক করে মহাকাশে আরও কত ছবি দেখা যাবে। পৃথিবীর আলোকিত উন্মুক্ত আকাশের নিচে আজ যে সকল ঘটনা ঘটছে, তারই ছবি নিয়ে আলোক-রশ্মি চলে যাচ্ছে মহাজগতে। জানি, একদিন সে আবার সে সকল দৃশ্যের ছবি নিয়ে বিলুপ্ত পৃথিবীর আকাশে এসে দাঁড়াবে।

দৃশ্যের পর দৃশ্যে চলমান সে ছায়াছবি কি আমি দেখতে পাবনা? এক জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডরূপে প্রচণ্ড গতিতে একটি জ্যোতিষ্ক আবর্তিত হচ্ছে—সে আমার পৃথিবী।

দশ হাজার থেকে লক্ষ বছর ব্যাপী অবিরাম বারিবর্ষণ,—পৃথিবীতে সমুদ্র-সৃষ্টির মহা-ইতিহাসের কাহিনী।

আবার একদিন—সেই সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা মহাদেশ। দক্ষিণ-মেরু শিখরে প্রথম একটি স্থলখণ্ড—কোটি কোটি বছর ধরে সে উত্তর দিকে ভেসে আসছে। আমি দেখছি, অপলক দৃষ্টিতে দেখছি।

আবার একদিন, সেই খণ্ডিত মহাদেশে পর্বত-শিখর জেগে উঠছে, পৃথিবীর অরণ্যে প্রথম ফুল—সেদিন আমি কোথাও ছিলাম কি? ছিলাম, ছিলাম, এক অবয়বহীন বস্তুপিণ্ড রূপে সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছি—কোন কূলেই আমি ঠাঁই পাচ্ছি না।

এক অসম্পূর্ণ মহা-ইতিহাস। অনেক পৃষ্ঠা, অনেক অধ্যায় আমি

খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু, কাহিনীটি সম্পূর্ণ। ধারাবাহিক, ছেদহীন, যতিহীন এক মহাকাব্যে আমি আজও আছি, সে দিনও ছিলাম। আর এক দৃশ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে অতিকায় সরীসৃপের উন্মত্ত দাপাদাপি। ওদিকে আলাস্কা, অপর দিকে মেক্সিকো—মধ্য ইউরোপের জলাভূমি জুড়ে চারণ-ক্ষেত্রে তৃণভোজী ম্যামথ।

তারই মাঝে, তারই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে একটি জীব-সত্তা, একটি জন্তু। পরবর্তীকালে তার নাম মানুষ। দশ লক্ষ বছর ধরে সে চেষ্টা করেছে আপন মেরুদণ্ডের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে। আমি তাকে চিনি. নিজের দিকে তাকিয়েই বেশ বুঝতে পারছি—একটি ভয়ঙ্কর জন্তু এসেছিল জীবনের পুরোভাগে।

আবার আর একটি ছবি। কাস্পিয়ান সাগরের তটভূমিতে গুহাদ্বারে মানব-মানবীর প্রথম প্রেমবিলাস। হয়তো অসম্ভব, হয়তো অকল্পনীয়, কিন্তু, আমি সেই ব্যভিচারিণী নগ্নিকা আদি-জননীকে বেশ চিনতে পারছি। মানুষের প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রযুক্তির আদি অধ্যায়ে কী ঘটেছিল সেদিন, মানব-প্রেমের সেই আদি-তীর্থে—সেখানে আমি কতরূপে কতবার গিয়ে হাজির হয়েছি।

আর এক দৃশ্য। পামির উপত্যকা, খাইবার গিরিপথ ধরে কারা যেন ভারতে প্রবেশ করছেন? আর্যরা নাকি? ঠিক ধরতে পারছি না। অথবা ওই যে বোধিদ্রুম মূলে তরুণ তপস্বীর তপশ্চর্যা!

কেউ জানে না। অথচ, মহাকাল সে সকল ঘটনার ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছে। আবার যেদিন সে এ সকল ছবি দেখাবে, সেদিন সূর্য নেই, পৃথিবী নেই। এসকল ছবি দেখবে, এমন কেউ নেই।

কল্পপীর দিকে তাকিয়ে উদ্ধতকণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম: এ সকল ছবি তুমি দেখেছ কি? পৃথিবীর আলোক-রশ্মি যখন তোমার আকাশ-পথে এই ছবি নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তখন তুমি তাকে কেন আটকে দিলে না? জীবন থেকে বড় যে মহাজীবন, ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত কোথাও

আছে কিনা, তা তুমিও জানো না, আমিও জানি না,—। কিন্তু অন্ত আর একদিন তুমি ওই আলোকে-রশ্মির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকবে ! দেখে নেবে পৃথিবীকে, অন্তত, তার ছায়ারূপে। কশ্যপী আমার উক্তির কোন জবাব দিল না। শুধু মিষ্টি করে একটু হাসল।

প্রসঙ্গতঃ, আমার যে সকল তরুণ বন্ধু বিকালের অস্তগামী রোদে গঙ্গার ধারে বা ভিক্টোরিয়া-মেমরিয়ালের ময়দানে বসে নিভৃতে প্রেমালাপ করছেন, তাঁদের একটু হুঁশিয়ার করে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন কেউ তাঁদের দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আপনাদের এই ধারণা ভুল। আপনাদের অজ্ঞাতেই এই মিলন দৃশ্যের ছবি তোলা হয়ে চালান হয়ে যাচ্ছে। মহাকাল-মহাকাশ একদিন সে সকল ছবি নিশ্চয়ই ফাঁস করে দেবে। ভাবীকালে,—যদিও তা ঘটবে দশ হাজার কোটি বছর পরে—এ নিয়ে একটা প্রচণ্ড হাসাহাসিও পড়ে যেতে পাবে। অতএব, একটু ঢেকেঢুকে সংযত হয়ে বসুন।

অতিকায় নব-তারা, নব-তারা

কশ্যপীর রূপ আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। বিজ্ঞানের দিক থেকে তাকে একবার আমি ছুঁয়েও দেখিনি। অপরা আমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে, আমি সেখানেই চলে যাচ্ছি। সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? সে প্রশ্ন অবান্তর। আমার কাছে ত বটেই, আপনাদের কাছেও। পথে পথে যা' দেখছি, তারই ধারা বিবরণী আমি প্রচার করছি। এই বিবরণীতে পুনরুক্তি দেখে যাঁরা বিরক্ত হচ্ছেন, তাঁদের আমি বলছি, এ ব্যাপারে আমি নিরুপায়। অপরা যদি আমাকে বারবার একই শ্রেণীর নক্ষত্রের কাছে নিয়ে আসে, তবে, আমিই বা কি করতে পারি ?

'অপরার' কথাও বিশেষ কিছুই বলা হয়নি আপনাদের, বলতে হলে, আমাকে রকেট থেকে নেমে অন্ততঃ খানিকটা হেঁটে বেড়াতে হবে, দেখতে হবে সবকিছু।

সেই যে মাকড়সার মতো হামাগুড়ি দিতে আমাকে দেখেছেন, তারপর আমি খানিকটা হেঁটে চলার বিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছি। বারবার অনুশীলন করে আমি এই হালকা অভিকর্ষক্ষেত্রেও নিজের মেরুদণ্ডটিকে খাড়া করে রাখতে শিখেছি। পৃথিবীতে এটা আয়ত্ত করতে আপনাদের লেগেছিল দশ লক্ষ বছর। আরও অনুশীলন চালিয়ে যাব এবং সক্ষম হলেই দীর্ঘ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ব। কত সময় লেগেছিল অনুশীলনে? না, এধরনের প্রশ্ন আদৌ করবেন না। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, এখানে সময়ের কোন হিসাব নেই। আপনাদের পৃথিবীর কোন মানদণ্ড দিয়ে আমার এই জগৎকে বিচার করতে যাবেন না—।

কিন্তু, অকস্মাৎ এ কী দেখছি? কশ্যপীর ঠিক পেছনেই একটি নক্ষত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল। একটি নক্ষত্র ভেঙ্গে শত নক্ষত্র সৃষ্টি হল এবং তাদের আকস্মিক আলোকপাতে সমগ্র ছায়াপথ, তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল। সেই শত নক্ষত্র আবার কোটি সূর্যের দীপ্তি নিয়ে মহাকাশে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এমনকি, অন্ধকার জগতে ভেসে-চলা অপরার চিরকালের গোধূলিকেও মুছে দিয়ে অপরাকে এক মুহূর্তের জন্য আমার সামনে উন্মোচিত করে দিল। সত্যি বলতে কি, এই প্রথম আমি অপরাকে দেখলাম। ভারী গ্যাসের গৈরিক উত্তরীয় দিয়ে সে ঢাকা রয়েছে, আর রয়েছে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন, উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে মাঝেই গভীর খাদ। দূরে, অনেক দূরে অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গিয়েছে—একপাশ দিয়ে চলে গিয়েছে একটি শীর্ণ জলরেখা, যার নাম আমরা ইতিপূর্বেই রেখেছি নিথর সমুদ্র। নিথর সমুদ্রের

তটভূমিতে মহাশৃঙ্গ—মহাশৃঙ্গের পেছনের দিকে অতি-বিস্তীর্ণ, প্রায় পৃথিবীর কোন এক সমুদ্র-সমান গভীর খাদ। আর দেখতে পেলাম না। পরমুহূর্তে অপরা আবার গ্যাসীয় আবরণে নিজেকে ঢেকে নিয়েছে।

আবার কশ্যপী ! কিন্তু এ যে আর এক চেহারা। আগে তাকে দেখেছিলাম একটি সবুজ নক্ষত্র, কিন্তু এখন দেখছি সে একটি নীহারিকা। হালকা গ্যাসের একটি নীহারিকারূপে সে সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার মাইল বেগে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সবুজ নীহারিকা, তৃণবর্ণা। এক শক্তিশালী বেতার-উৎস ॥

বুঝে নিলাম, আমি মহাকাশের সে অঞ্চল দিয়ে ছুটে চলেছি যেখানে নীহারিকারা জন্ম নেয়, অথবা, পুরাতন নক্ষত্ররা তাদের পরিচ্ছদ পালটে নেয়। একটু আগেই আমি একটি নক্ষত্রকে কোটি কোটি নক্ষত্রের রূপ নিতে দেখেছি। কশ্যপ-মণ্ডলে আমি ছায় নক্ষত্র খুঁজে পাইনি সত্য,—কিন্তু, নব-তারা দেখতে পাচ্ছি চারদিকেই কশ্যপী বাস্তবিক একটি নব-তারার (Nova) অবশেষ। দশ হাজার বছর আগে এক অতিকায় নক্ষত্র বিস্ফোরণের ফলে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আজ তারই অবশেষ মহাকাশে কশ্যপীরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটি আমাকে কশ্যপীই জানিয়ে দিল তার বেতার-তরঙ্গের ভাষায়। বলল, আমি একদা ছিলাম এক নক্ষত্রের দেহে—আজ আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। আমার তৃণবর্ণ জীবনের মধ্যেই রয়েছে সে ইতিহাস।

বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের ছায়াপথে কয়েক ডজন অতিকায় 'নবতারা'র অবশেষ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বাস্তবিক. এরা মহাকাশে নতুন তারা নয়, 'কচি খোকা' ও নয়। একদিন আমরা ওদের 'নতুন তারা' মনে করে যে ভুল করেছিলাম, আজও তারই জের টেনে চলছি এবং বিস্ফোরিত নক্ষত্রের অবশেষকে 'নব-তারা' বলে

ডেকে আসছি। ১০৫৪ সালে চীনারা আকাশে এমন এক বিস্ফোরণ দেখেছিলেন, কিন্তু, মূল তারকাটি ছিল পৃথিবী থেকে অদৃশ্য। তাঁরা ধরে নিলেন, মহাকাশের শূন্যতায় একটি নতুন তারা জন্ম নিল। তাঁরা এর নাম দিলেন 'অতিথি তারা' বা 'নব-তারা'।

আজ আমরা জানি, সেই বিস্ফোরণের ফলেই সেদিন ছায়াপথে জেগে উঠেছিল নীহারিকা কর্কট। কর্কটের গ্যাসীয় দেহ আজও বিপুল গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কশ্যপীর দিকে আবার তাকালাম। প্রতি মুহূর্তে সে আরও স্ফীত হয়ে উঠছে। কিন্তু, মূল নক্ষত্রটি গেল কোথায়? আশেপাশে কোথাও দেখছি না? সে কি তবে পলাতক? মূল নক্ষত্রটি কোন পরিচয়ই রেখে গেল না? তার সবকিছু দিয়ে সৃষ্টি করল এই অনন্ত-যৌবনাকে? অথবা, কশ্যপী কি সে গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত যারা বিস্ফোরণের কালে কিছুটা পদার্থ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খানিকটা হালকা হয়ে আবার স্থির অবস্থায় চলে আসে? আজ আমার সামনে যে তৃণবর্ণা সুন্দরী আমাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে চলছে, শত কোটি বছর আগে তার অবর্ণনীয় অগ্নিজ্বালার দিনে যদি এখানে আসতে পারতাম, তবে দেখে নিতাম দশ লক্ষ সূর্যের দীপ্তি নিয়ে কশ্যপী ক্ষণকালের জন্য ছায়াপথের উত্তর-প্রান্তে জেগে উঠেছে—দশ হাজার বছরে সূর্য মহাকাশে যে পরিমাণ শক্তি (energy) ছড়িয়ে দেয়, কশ্যপী তাব পূর্ণ দীপ্তির এক বছরে তাই দিয়েছিল। আজও সেই শক্তিতরঙ্গ এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথের উপকূল পর্যন্ত প্লাবিত করে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশেষ প্রান্তের দিকে ছুটে চলেছে।

আমি সেই বেতার বার্তা পেয়ে এখানে আসিনি—আমার এখানে আসা নিতান্তই আকস্মিক। কিন্তু, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করত, তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম, আমি যেতে চাই কশ্যপ মণ্ডলে। পৃথিবীর যন্ত্রাগারে যার বেতারলিপি নির্ভুলভাবে পৌঁছুচ্ছে, সেই

মণ্ডলে আমি যেতে চাই। শুধু কশ্যপীকে দেখতে নয়; ছায়ানক্ষত্র দেখতেও আমি চাই।

অপরা. অনেক দূরে চলে এসেছে—এখান থেকে কশ্যপী আর সবুজ তারা নয়! সে মেঘরূপী নীহারিকা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, তথাপি আমি তার মূল নক্ষত্রটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাকে পেলাম না, এমন কি তার ধ্বংসাবশেষটিও নয়।

পাঁচ শত আলোকবর্ষ দূরে

বহু দূরে, এখান থেকে ৫ শতটি আলোকবর্ষ দূরে হংসমণ্ডলকে বেষ্টন করে রয়েছে হংসবলয়। সেখানে আমি একটি 'অতিকায় নব তারার' (Supernova) কঙ্কাল দেখতে পাচ্ছি। রেডিও-টেলিস্কোপটি "তরঙ্গ-আধার" সেদিকে ঘুরিয়ে দিলাম। সূর্যের তুলনায় এক হাজার কোটি গুণ বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠে যারা বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে, তাদেরই আমরা 'অতিকায় নব তারা' রূপে চিহ্নিত করে থাকি। তাদের ভেতরের পরমাণুগুলির ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যাবার পর তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে নিজেদের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করে দেয়।

১৯৭৩ সালে আমাদের ছায়াপথের কুণ্ডল বাহুতে এমনই এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল,—আলোকিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র ছায়াপথ।

হংসবলয়ের চক্রাকার নীহারিকা থেকে পাঠানো বেতার-বার্তার পাঠোদ্ধার করে জেনে নিলাম, সেখানে একটি অতিকায় নব-তারার জন্ম-ইতিহাস রয়েছে কিন্তু, স্তরে স্তরে সাজানো গ্যাসীয় আবরণের নিচ থেকে তাকে উদ্ধার করতে কেউ পারে নি।

ছায়াপথের এই প্রাচীনতম অঞ্চলে আমি ক্ষ্যাপা জহুরীর মতো 'নব তারা' ও 'অতিকায় নব তারা' খুজে বেড়াচ্ছি—খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন এক ইতিহাস যার শেষ অধ্যায় লেখা হয়ে গিয়েছে সহস্রকোটি

বছর আগে। অপরা তার কিছুই জানে না, কোন দিনই জানবেনা। কিন্তু, এক রোমাঞ্চকর এবং যা কেবলমাত্র স্বপ্নায়ত্ত, তার মধ্য দিয়ে আমাকে এমন ভাবে টেনে নিয়ে সে যেন কি এক ইতিপূর্বে অনাস্বাদিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছে, ঠিক বুঝতে পারছিনা।

কশ্যপ-মণ্ডলের সীমানা যেন শেষ হতে চাইছেনা—পাঁচ শত আলোকবর্ষে বিস্তৃত এই নক্ষত্র মণ্ডলের সীমানায় আবার কে দাঁড়িয়ে থাকবে, কে জানে?

কিন্তু, হঠাৎ এ কি ঘটল? একটি অনুজ্জ্বল ক্ষুদে নক্ষত্র, বিজ্ঞানীরা যাদের নাম দিয়েছেন Pygmy star—কশ্যপ মণ্ডলের মহারথী নক্ষত্র তালিকায় যার নামও নেই, এমনকি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী Messier রচিত নক্ষত্র তালিকায়ও যার নামধাম উল্লেখ করা হয় নি—অকস্মাৎ প্রচণ্ডবেগে বিস্ফোরিত হয়ে গেল; দেখলাম একটি নক্ষত্র থেকে শত নক্ষত্র জন্ম নিল, অভিকর্ষের টানে মূল নক্ষত্রটির চারদিকে মালার মতো দুলতে থাকল। পরমুহূর্তে যুগপৎ শত বিস্ফোরণে মালার সব কয়টি নক্ষত্র এবং মূল নক্ষত্রটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মহাকাশে তাদের চিহ্নমাত্রও রইল না।

কশ্যপ মণ্ডলের ওই নিভৃত কোণে এখন অন্ধকার। সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট এক নক্ষত্র দশহাজার গুণ বেশী দীপ্তিমান হয়ে উঠে চিরকালের জন্য নিভে গেল।

মহাকাশ, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ প্রতিবিশ্বকে?

এখনও কশ্যপমণ্ডলের মধ্য দিয়েই এগোচ্ছি। কোথায় যে এই মণ্ডলের সীমানা, ঠাহর করতে পারছিনা। এই অঞ্চলে নক্ষত্র ক্রমশঃ বিরল হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে এক-একটির দেখা মিলছে বটে—কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এখানে অন্ধকারের রাজত্ব। সর্বজ্ঞের খুসী-খুসী ভাব। তাকে আর অবিরাম রেডিও-টেলিস্কোপ, রেডার ও লেজার

রশ্মির দিকে চোখ রাখতে হচ্ছে না। বিরল-বসতি এই অঞ্চলের শূন্যতায় নেই বলতে কিছু নেই। বসে আছি, কবে আবার সামনে এসে দাঁড়াবে একটি আলোর দ্বীপ—।

ইতিমধ্যে, cyclotron যন্ত্রটি আমি চালু করে দিলাম। তার ৫ শত টন ওজনের দেহটি—অবশ্যই পৃথিবীর মাপে—বিপুলবেগে আবর্তিত হতে লাগল। দশকোটি ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নিয়ে সে বাইরে থেকে বস্তুকণিকা টেনে নিয়ে তাদের কেন্দ্রীণ (nucleus) চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে আপন কৃতিত্বে মশগুল হয়ে উঠল। সর্বজ্ঞ তার সর্ববিদ্যার আধার মস্তিষ্কটিতে সব তথ্য সংগ্রহ করে রাখছে। আমার এই বন্ধুটির কর্তব্যবোধের কি কোন সীমা আছে?

কল্পনীর সীমানার এই শেষ প্রান্তে আমি প্রতি-বস্তু (anti-matter) ও প্রতিবিশ্বকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মানে, সেই পৃথিবীটি আমি খুঁজছি যার পদার্থগুলি বাইরে থেকে দেখতে আপনাদের পৃথিবীরই মতো, অর্থাৎ, এমনই গাছপালা, ঘরবাড়ি, মানুষ—। অথচ, সেই পৃথিবীর একটি লতার সংগে যদি আপনাদের পৃথিবীর একটি লতার ছোঁয়া লাগে, তবে উভয়েরই নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি ঘটবে,- এবং তার ফলে যে শক্তি বেরিয়ে আসবে, তা, এমন কি পৃথিবীকেও কক্ষচ্যুত করে ফেলতে পারবে। একটি মজাদার কল্পনা করুন— আপনাদের পৃথিবীর কোন মানব-সন্তান যদি সেই প্রতি বিশ্বের কোন নবীকে জড়িয়ে ধরেন, তবে উভয়েরই নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি ঘটবে এবং এমন কি, সূর্য-দেহেও কাঁপন ধরাবে।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, কেন এমন হবে? স্বর্গ থেকে পরীরা নেমে এসে পৃথিবীর রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করেছেন,—অথবা, পৃথিবীর রাজপুত্র স্বর্গে গিয়ে দেব-কন্যাদের সংগে প্রেম করছেন, শয্যাসংগী হয়েছেন, এমন কাহিনী ত আপনারা কম শোনেন নি। আসলে, এমন বিপজ্জনক মেলামেশার আগে উভয়েরই একটি

cyclotron যন্ত্রের সামনে দাঁড়ানো উচিত ছিল। স্বর্গের পরী এবং পৃথিবীর রাজপুত্রের দেহ একই ধরনের বস্তু-কণা দিয়ে গঠিত ছিল কিনা, সাইক্লোট্রন যন্ত্রে তার পরীক্ষার আগে চুম্বন ও আলিঙ্গনের কথা স্বপ্নেও যেন না ভাবেন। কেননা, আপনাদের এই প্রেম-বিলাসে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। আসলে, আমি আপনি যে জগতে রয়েছি, সেখানে পরমাণুর কেন্দ্রস্থ প্রোটনকে প্রদক্ষিণ করছে ইলেকট্রন, আবার, বিপরীত বিশ্বে ইলেকট্রনকে কেন্দ্রে রেখে তাকে প্রদক্ষিণ করছে প্রোটন। বাইর থেকে কিছুই বোঝা যায় না,—কিন্তু, দুই বিপরীতধর্মী বস্তু-কণিকার সংঘর্ষে উভয়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—যা' সৃষ্টি হয়, তা ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়ে শক্তি তরঙ্গরূপে।

কশ্যপ মণ্ডলের প্রান্তিক এলাকা থেকে আপনারা এই বেতার ভাষণ শুনছেন।

'ছায়াপথেব নক্ষত্র-বিরল এই অঞ্চলে আমি যদি কয়েকটি আলোক বর্ষে বিস্তৃত এমন একটি সুড়ঙ্গ-পথ খুঁজে পাই, যেখানে পদার্থ বলতে কিছু নেই, এমন কি, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণশীল হাইড্রোজেন পরমাণুও নেই, তবে আমি বুঝে নেব, এই সুড়ঙ্গ পথেই প্রতিকণিকারা আনাগোনা করে থাকে। সেই সুড়ঙ্গ-পথ ধরে এগিয়ে গেলে অন্য ছায়াপথ, বা, প্রতি-জগতের সন্ধান ও মিলতে পারে।

রকেটে বসে মহাকাশে আমি প্রতি-কণিকাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। "অন্ধকারে হাতড়ানো" যাকে বলে, আমি তা করছিনা কিন্তু। Rutherford এর কথাটি মনে গেঁথে নিয়েই আমার এই অনুসন্ধান। পরমাণু বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর প্রতিভা ১৯৩৫ সালেই বলেছিলেন, May it not be that elsewhere in the universe or under circumstances different from those familiar to us, the role of positive and negative electrons be reversed? [এটা কি হতে পারে না যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র

আমাদের অচেনা অন্য কোন অবস্থার মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ইলেকট্রনের ভূমিকা পালটে যাচ্ছে ?] আমি জানি, এই অনুসন্ধান বিপজ্জনক। যদি খুঁজে পাওয়া যায়, যদি সংস্পর্শে আসি, পারস্পরিক সংঘাতে আমরা উভয়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। মহাকাশে পড়ে থাকবে শুধু বিকিরণ; গামা রশ্মির আকারে সে ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়বে। ব্যাপারটা আমি আবার খুলে বলছি। আমার ছায়াপথ, ছায়াপথের অন্তর্গত সৌরমণ্ডল এবং সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত তার গ্রহগুলিতে বিশ্ব-ব্যাপারের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানকার প্রতিটি বস্তুকণার প্রোটন-নিউট্রন কেন্দ্রীণকে প্রদক্ষিণ করে চলছে ইলেকট্রন। কিন্তু, পাশেই হয়তো অন্য ছায়াপথ, অন্য সৌরমণ্ডল বা অন্য গ্রহ-মণ্ডল রয়েছে, যেখানে পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে এ্যান্টি-প্রোটন, এ্যান্টি-নিউট্রন এবং সেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে 'পজিট্রন' বা 'পজিটিভ' ইলেকট্রন"। এটাকেই বলা হয়েছে প্রতি-বস্তুর পৃথিবী। বাহ্যতঃ এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না। সম্পূর্ণভাবে প্রতি-বস্তু দিয়ে গড়া অন্য পৃথিবী হবে দেখতে আমাদের পৃথিবীরই মতো। বাস্তবিক আজ যদি কোন অভাবনীয় ঘটনায় পৃথিবীর সমস্ত বস্তু প্রতি-বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, আমরা টেরও পাব না। পৃথিবী যা ছিল, তাই থাকবে। সমস্যা বাধবে বস্তু ও প্রতি-বস্তু যখন পরস্পরে সংস্পর্শে আসবে। তারা উভয়েই উভয়কে ধ্বংস করে ফেলবে, অর্থাৎ উভয়েই বিলয়ন (anihilation) ঘটবে।

পৃথিবীর আকাশে কদাচিৎ এ সকল প্রতি-কণিকা ভেসে আসে। কেন না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধ-স্তরেই স্বাভাবিক প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংগে তাদের সংঘর্ষ-ঘটলে উভয়ের বিলুপ্তি, বা, বিলয়ন ঘটে 'ফোটন' সৃষ্টি হয়। কিন্তু, তারা এল কোথা থেকে ? এবং কোন্ পথে তারা এল ? এমন কি হতে পারে না যে ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের কোন দূরতম অধ্যায়ে বস্তু ও প্রতি-বস্তুর দুই ছায়াপথের মধ্যে সংঘর্ষ

ঘটেছিল এবং সেই সংঘর্ষের পরেও যে সকল প্রতি-বস্তু কণিকা বেঁচে ছিল, তারা ছায়াপথের মধ্য দিয়ে বস্তুকণিকাকে ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে গিয়েছে এবং এ-ভাবেই ছায়াপথে এমন সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয়ে থাকবে, যেখানে বস্তুও নেই, প্রতি-বস্তুও নেই। Rutherford-এর লেখাটি পড়ছি আর ভাবছি কি বিস্ময়কর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে তিনি সম্ভাবনাটিকে দেখেছিলেন! কেন না, তাঁর এই উক্তির অল্প কিছুদিন পরেই মহাকাশ বা মহাজগত থেকে ভেসে আসা প্রতি-কণিকাকে পাকড়াও করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু, আমাদের অচেনা এই কণিকার জন্মভূমিটি কোথায়? খোঁজ, খোঁজ রব পড়ে গেল পরমাণু বিজ্ঞান জগতে। কেন না, এ-শুধু অচেনা ও অজানা নয়। এরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন-বার্তাও নিয়ে এসেছে—অথবা, এমনও হতে পারে, এ ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের বার্তাও। এর জন্মক্ষেত্র কি আমাদের ছায়াপথ? না, অন্য ছায়াপথ? অন্য এক দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড? যদি অন্যত্র থেকেই সে এসে থাকে, তবে এই ছায়াপথে তার পথের প্রতিটি কণ্টকের বিলয়ন ঘটিয়ে দিয়েই সে এসেছে। রেখে এসেছে একটি সুড়ঙ্গ-পথ। শূন্যতার সেই সুড়ঙ্গ-পথটি কোথায়? ছায়াপথের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে, কশ্যপ মণ্ডলের সীমান্তে আমি সেই সুড়ঙ্গ-পথটি খুঁজছি।

বিপরীত কণিকার ব্যাপারটি কেন আমি বিশদভাবে বলছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা তা বুঝতে পারবেন। অধিকাংশ সাধারণ কণিকার বিপরীত কণিকা আজ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়—অতিকায় Cyclotron যন্ত্রে বস্তুর উপস্থিতিতেই বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ থেকে (গামারশ্মি) পার্থিব কণিকা প্রোটন ও ইলেকট্রন সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন মহাজাগতিক রশ্মির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে প্রোটন-ইলেকট্রনের "যুগল উৎপাদন" ঘটতেও দেখা গিয়েছে।

মজার কথা হল এই যে, গামা বিকিরণ থেকে যখনই ইলেকট্রন সৃষ্টি করা হল, তখন সেখানে যুগপৎ আবির্ভাব ঘটল "পজিট্রনের"—বলা নেই, কওয়া নেই, আমার পৃথিবীতে একটি বিপরীত পৃথিবী!

অতএব, এ থেকে কি এটা অনুমান করা যায় না যে ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও যখন প্রাথমিক কণিকা সৃষ্টি হচ্ছে, তখন সেখানেই তার বিপরীত কণিকাও সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং সে জন্যই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে বিচার করলে বস্তু ও প্রতিবস্তুর পরিমাণ হবে সমান?

আমি শুধু ভাবছি, বিস্মিত হয়ে ভাবছি, ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন, তবে কোথাও বসে তিনি অতিকায় অতি শক্তিশালী cyclotron যন্ত্র ঘুরিয়ে চলছেন—যা থেকে বস্তু ও প্রতি বস্তুকণা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি হাসছেন। অথবা, এই সহস্র কোটি নক্ষত্রের মধ্যে কারো কারো দেহের লাগোয়া প্রচণ্ড চৌম্বক-ক্ষেত্রে যুগপৎ উভয় কণিকাই সৃষ্টি হয়ে চলেছে? অথবা, একটি সমগ্র ছায়াপথই হয়তো বিরাট এক cyclotron যন্ত্রের মতো আবর্তিত হয়ে চলেছে?

কশ্যপ মণ্ডলে, ছায়াপথে, বা অন্যত্র কোথায় আছে সেই বিপরীত বিশ্ব, আপাতঃ দৃষ্টিতে বিশ্বের সঙ্গে যার কোন পার্থক্য নেই অথচ, যারা এক নয়? তাদের পরস্পরের স্পর্শে প্রতিটি বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

কশ্যপ মণ্ডলের এই সীমানায় দাঁড়িয়ে আমি একটি সুড়ঙ্গ-পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি—সঙ্গে সঙ্গে আজ অবিশ্বাস্য হলেও আগামী দিনে নিশ্চয়ই আসছে, এমন এক সম্ভাবনার দোরে দাঁড়িয়ে তার বিপুলতা ও বিশালতায় কাঁপছি। যন্ত্রাগারে আজ আমরা অতি সামান্য পরিমাণ প্রতিবস্তুর উৎপাদন করতে পারছি। কিন্তু যেদিন প্রচুর পরিমাণ প্রতিবস্তুর উৎপাদন সম্ভবপর হবে, সেদিন আসবে প্রযুক্তির আর এক বিপ্লব। মানুষ এমন এক শক্তির অধিকারী হবে যা'

আজ সে সুদূরতম কল্পনা দিয়েও স্পর্শ করতে পারছে না। সহস্র কোটি হাইড্রোজেন বোমার শক্তি নিয়ে 'ফোটন বোমা'—অথবা 'ফোটন রকেট'।

এখান থেকে, কশ্যপ মণ্ডলের এই প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে আমি সূর্যলোক বা পৃথিবী দেখতে পাচ্ছিনা। কিন্তু কল্পনায় আমি দেখছি' পৃথিবী থেকে শত বা সহস্র 'ফোটন' রকেট আলোকের গতিতে ছুটে চলেছে আন্তর্নক্ষত্রলোকের দিকে। প্রযুক্তি-বিদ্যায় আরও উন্নত ভাবীকালে মানব-প্রজাতি এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথে চলে যাচ্ছে 'ফোটন' রকেটে চড়েই।

'ফোটন' রকেট আসলে দুইটি রকেটের সমবায়। একটি রকেটে রয়েছেন মানব-যাত্রীরা। অন্যটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিবস্তু দিয়ে গড়া—বস্তুর সংঘর্ষে আপন দেহের প্রতিবস্তুর বিলয়ন ঘটিয়ে সে যে শক্তি পাচ্ছে, তার সহায়তায় তারা ছুটে যাচ্ছে অন্য নক্ষত্রলোকে। সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন অন্য রকেটটিকে—যার মধ্যে রয়েছেন আরোহীরা। অন্য নক্ষত্রলোকের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আবার চলে যাচ্ছে সৌর সাম্রাজ্যে তার নিজস্ব পৃথিবীতে।

এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। যে পৃথিবীকে আমি বহুকাল আগে ছেড়ে এসেছি—কত, ক-ত সময় আগে, তার কথা কেন আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না? যে পৃথিবী দেখে এসেছি, সে পৃথিবী নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে, বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে—কিন্তু, তার সামগ্রিক সত্তা এই ছায়ালোকেও আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি তার সভ্যতার বিকাশে উল্লসিত হয়ে উঠি—তার প্রযুক্তি নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। ফোটন রকেটের ব্যাপারটি যে তার কাছে আজ হয়তো একটি নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে উঠেছে, সে কথা আমার মনেও ওঠে না। অথবা, এমনও হতে পারে ফোটনের যুগও তারা অতিক্রম করে অন্য যুগে প্রবেশ করেছে।

আমার পৃথিবী! আমার হৃদয়ের একটি খণ্ড সে কি রেখে দিয়েছে আমার জন্যই—ফেরার দিনে আমার হাতে তুলে দেবে বলে? এ প্রশ্নের জবাব মহাকাশের কোথাও নেই, কল্পপ মণ্ডলে নেই, নেই সামনের হংসবলয় মণ্ডলেও। প্রশ্নটি আমি বারবার তাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি—কিন্তু আবার ফিরে আসছে আমার দিকেই।

বস্তুকে প্রতিবস্তুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া, প্রোটনকে এ্যানটি-প্রোটনের বিরুদ্ধে, অথবা, ইলেকট্রনকে এ্যানটি-প্রোটনের বিরুদ্ধে—পদার্থের সামগ্রিক বিলয়নের ওই একটিমাত্র পথই রয়েছে। মানুষ যেমন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি পদার্থের সামগ্রিক বিলয়ন সাধনও তার সাধ্যাতীত। কয়লা পুড়িয়ে তাপ সৃষ্টি করা হয়, সেটি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র। অতি, অতি সামান্য পরিমান বস্তুরই তাতে বিলয়ন ঘটে যা কোন সূক্ষ্ম হিসাবেই ধরা পড়ে না।

নাগাশাকিতে যে বোমাটি পড়েছিল, তা যতই ধ্বংসই করুক না কেন, মাত্র এক শত গ্রাম পদার্থের বিলয়ন ঘটেছিল। অর্থাৎ যে ধোঁয়া উঠেছিল, তেজস্ক্রিয় কণিকা সৃষ্টি হয়েছিল, অথবা, যে সকল বোমার টুকরা ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলি জড়ো করতে পারলেই দেখা যেত, মাত্র ১ শত গ্রামের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যভাবে বলা যায়, ওই বোমার মাত্র ১ শত গ্রাম পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বস্তুর বিলয়ন ঘটাবার, অর্থাৎ পদার্থকে 'ফোটনে' (photor) পরিবর্তিক ও নিয়ন্ত্রিত করার যদি কোন সহজ পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে মৃত্যুর পরে (আগে নয়, কিন্তু!) আমার ৬০ কিলো ওজনের দেহটি আমি উপহার হিসাবে দিয়ে যেতে রাজি হব। কেন না, একটি সাধারণ মানব-দেহকে, অর্থাৎ তার হাড় মাংস ইত্যাদির বস্তুসত্তা লোপ করে দিয়ে শক্তিসত্তায় (energy) পরিণত করতে পারলে তা

দিয়ে সারা ভারতের একশত বছরের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভবপর হবে।

কশ্যপমণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করে এবার আমি সম্ভবতঃ যাচ্ছি হংসবলয় মণ্ডলের দিকে—মনে রাখবেন, 'হংস মণ্ডল' নয়, হংসবলয় মণ্ডল। কিন্তু যাবার আগে আপনাদের আবারও বলে রাখছি, কোন অবস্থাতেই আপনারা গ্রহান্তরের বা অন্য নক্ষত্রলোকের কাউকে জড়িয়ে ধরতে যাবেন না। এমন কি, কবি কালিদাস, ভবভূতির সার্টিফিকেট নিয়ে যে সকল রূপসী উর্বশী মেনকারা হামেশাই আপনাদের দোরে কড়া নাড়ছেন, তাদেরও এখন থেকে আর সহজে পাত্তা দেবেন না। কেননা, ওদের দেহ প্রতিবস্তু দিয়ে গড়া হতে পারে এবং একটিবার মাত্র স্পর্শন ও আলিঙ্গনের ফলে পৃথিবী নিশ্চিহ্নে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। বরং ওদের নিয়ে যান যে কোন cyclotron যন্ত্রের সামনে, ওদের দেহের বস্তু কণিকাগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে আসুন—তারপর, নিরাপদ মনে হলে, ওঁকে সুস্থচিত্তে জড়িয়ে ধরুন।

এই কশ্যপ মণ্ডলেই আমি বস্তু-বর্জিত একটি কালো দাগ দেখতে পাচ্ছি, সেখানে একটি পৃথিবী এ ভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সর্বজ্ঞ এই মাত্র টেলিভিশনের পর্দায় তার ছবি ফুটিয়ে তুলল, আমাকে দেখাল। বস্তু-প্রতিবস্তুর পারস্পরিক বিলয়নের ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে সর্বজ্ঞ বিপদের ইঙ্গিত করল। তাই আপনাদের হুঁশিয়ার করে দিলাম।

এইবার হংসবলয় মণ্ডল। অপরা আর এক নক্ষত্র সভার পর থেকে কালো যবনিকাটি সরিয়ে নিয়ে আমাকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

'হংস বলয় মণ্ডল'

আমি কি আদি-অন্তহীন এক স্বপ্নজগতের সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের রাজ্যে এসে গেলাম ? নানা বর্ণের এক কোটি বা তারও বেশী নক্ষত্রের একটি বলয় মহাকাশে বিপুল বেগে আবর্তিত হচ্ছে। এক আবর্তনশীল কালচক্র কত শত, বা, সহস্র কোটি বছর ধরে, এই একই গতিতে আবর্তিত হচ্ছে—। পৃথিবীর এক অবোধ অপরিণত শিশু সেই মহাচক্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরক্ষণেই হাত গুটিয়ে নিল।

পৃথিবী থেকে যাঁরা এই বেতার ভাষণ শুনছেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে তাকান উত্তর আকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে। তারই পাশ দিয়ে দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিন দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। পৃথিবী থেকে দেখা যায় না, এমন কি, অতি শক্তিশালী টেলিসকোপের সহায়তায়ও নয়। আপনাদের পক্ষে সে এক অনস্তিত্বের কৃষ্ণ সমুদ্র—কিন্তু, আমার সামনে উন্মোচিত হ'ল এক তরুণ নক্ষত্রবলয়। ছায়াপথের এক প্রান্তে নিঃশব্দে আবর্তিত হচ্ছে,—সেই আবর্তন ক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু বরাবর একটি কৃষ্ণ রেখা ধরে অপরা নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। নানা বর্ণের নানা নক্ষত্র,—অতএব নানা বয়সের নক্ষত্ররা এই মহাচক্রে সংস্থিত রয়েছেন। কী প্রয়োজন আছে এ সকল নক্ষত্রের পরিচয় জেনে,—তাদের অভিকর্ষ ও চৌম্বক ক্ষেত্রে পরিমাপ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ? আমি এক নিঃসঙ্গ অর্ণবপোতের নিঃসঙ্গ আরোহী হয়ে আর কতকাল ছুটে চলব ? ক্লান্ত, অবসন্ন ও বিষণ্ন। এক এক সময় নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, এই মহাযাত্রার সমাপ্তি কোথায় ? আপনারা হংসবলয়মণ্ডল থেকে এই বেতার বিবরণ শুনছেন। মনে রাখবেন, এটা হংস মণ্ডল নয়। হংস মণ্ডল রয়েছে সূর্য মণ্ডলের পাশেই, এখান থেকে দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। এটা হংস বলয় মণ্ডল।

আমি এক অদ্ভুত ও যাযাবর পৃথিবীর নিঃসঙ্গ নায়ক হয়ে কোটি কোটি নক্ষত্রের সীমানা ছুঁয়ে এলাম। হয়তো আরও কত শত কোটি পৃথিবী আমার পাশ কাটিয়েই চলে গেল। কিন্তু পৃথিবী মানেই জীবন নয়, এবং জীবন মানেই তথাকথিত উন্নত জীবন, বা, মানব-জীবন নয়। কোন পৃথিবীর কোন জীবন-সত্তাই একবার ডেকে বলল না—এই যে, এসেছ তুমি? সর্বজ্ঞ অবিরাম রেডার, টেলিসকোপ, রেডিও টেলিসকোপ, ইনফ্রা-রেড টেলিসকোপ দিয়ে প্রত্যেকের দোরে কড়া নেড়ে চলেছে—কেউ সাড়া দেয় নি। প্রতি সেকেণ্ডে এককোটিরও বেশী বার্তার সে আদান-প্রদান করছে—কিন্তু, কেউ সাড়া দিল না। তার চোখে আমি এক নৈরাশ্যপূর্ণ ক্লান্তির ছায়া দেখতে পাচ্ছি,—এবং সন্দেহ নেই, সেও আমার চোখে তাই দেখছে।

আমরা দুটি যন্ত্র—একে অন্যের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এ যে কী নিদারুণ নিঃসঙ্গতা! কী যে চাইছি, তাও আমি জানি না। পৃথিবীতে কত কলরব, কত সংগীত, কর্মব্যস্ত মুখর জীবন, তথাপি মানুষের মতো নিঃসঙ্গ কোন প্রাণীই নেই। সেই অনন্ত ও অব্যক্ত তৃষ্ণা,—কী যে সে পেতে চায়, সে নিজেও জানে না। এক উন্মার্গগামী আত্মা, উশৃঙ্খল অস্তিত্ব, কেবলই এক দিগন্তের শেষ প্রান্তে এসে অন্য দিগন্তের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। নীরাশ হয়, কিন্তু, তার তৃষ্ণারও শেষ নেই। পথেরও শেষ নেই।

হয়তো এমন অনেক পৃথিবীর গা ছুঁয়ে আমি এসেছি যাদের তথাকথিত উন্নত জীবনও আমাদের মতোই মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, বিস্মিত হয়; স্বপ্ন দেখে; নিজেদের স্বপ্ন দিয়ে অন্য পৃথিবী গড়ে তোলে। কিন্তু, কোনদিন আমার পৃথিবীর নাগাল সে পেল না। আমার সংগীত তার কাছে অর্থহীন, আমার প্রযুক্তিগত সাফল্য তার কাছে উপলব্ধির অতীত এক সত্য-জিজ্ঞাসা। কেননা, তার জীবনে বিবর্তন এসেছে অন্য পথে, অন্য কৃতিত্বে তার সূর্যলোকে সে বিজয়ী।

তার প্রবৃত্তি বিদ্যা বা, তার মেধার সঙ্গে আমার ইতিহাসের কি কোন মিল আছে? মহাসমুদ্রে জীবন-অণু সৃষ্টি হবার পর আত্মবিকাশের কোটি পথ খুলে গেল। এ পৃথিবীতেই তার নানা পরিচয়। জীবন-অণুগুলি কোটি পথের এক একটি ধরে এগিয়ে গেল, প্রত্যেকের পথের বাঁকে বাঁকে বিচিত্র সম্ভাবনা, বিচিত্র ইঙ্গিত। তাই একদা সামুদ্রিক জীবন শুরু করে আজ আমার স্থল-জীবন—সেদিনকার নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ পরিবেশে দেহের যে যন্ত্রটির প্রয়োজন ছিল, সেটিকে আজ আমি কিডনি রূপে ব্যবহার করছি। সেদিনকার ত্রিনয়নের একটিকে অপ্রয়োজনবোধে চালান করে দিয়েছি মস্তিষ্কের একেবারে পেছনের দিকে।

*   *   *   *   *

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন পথ-রেখা ধরে অপরা এগোচ্ছে, কোন সীমাতীত রহস্যের তটভূমিকে নিশানা করে সে ছুটে চলেছে, তা ও জানিনা। আর পৃথিবী? সেখানে মাস, বর্ষ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সহস্রাব্দের চিহ্ন লিপি অতিক্রম করে ছুটে চলেছে। যেতে যেতে আমাকে ডাকছে। আমি উন্মনা হয়ে উঠি। ফিরে তাকাই। কিন্তু, কোথা থেকে যে ডাক আসছে, বুঝতে পারছি না। সমস্তটাই প্রহেলিকা অপরার বুকে অন্তহীন গেধূলি মতোই ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

*   *   *   *   *

কিন্তু, যা বলছিলাম। সবজ্ঞ এত নক্ষত্রের প্রাঙ্গণে, গ্রহকক্ষ বেতার সংকেত, আলোর তরঙ্গ পাঠাল, কিন্তু, কেউ সাড়া দিল না। আমার বেতার ভাষা, বা আলোর সংকেত তাদের কাছে কোন অর্থই বহন করল না।

তবুও হয়তো একটি জায়গায় আমাদের মিল রয়েছে হয়তো আমাদেরই মতো তারাও তৃষ্ণার্ত। কিন্তু, কিসের জন্য? তারা

জানে না। নিঃসঙ্গতায় পীড়িত হয়ে অনন্ত আকাশের দিকে তারাও তাকিয়ে থাকে। যাকে পাওয়া যায় না, কোনদিন পাওয়া যাবে না, তারই উদ্দেশে আমরা উভয়েই আলিঙ্গনের হাত বাড়িয়ে দেই—নিঃসঙ্গতার আয়ত প্রাসাদের নিচে চাপা পড়ে আমরা উভয়েই শুধু আর্তনাদ করে যাচ্ছি। পথে পথে কত দেখে এসেছি, মহাকাশে নক্ষত্র ভ্রমরের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। মহাকাশের মহাশ্মশান—নক্ষত্ররা সেই মৃত্যু কূপে ঝাঁপ দিচ্ছে। এই ত সামনে হংস বলয়—কোটি নক্ষত্রের মালা নিয়ে অপরাকে চক্রাকারে বেষ্টন করে নৃত্য করছে। নীহারিকা কর্কটে আমি নক্ষত্র শিশুর কান্না শুনেছি। দক্ষিণ আকাশের এক প্রোজ্জ্বল নীহারিকার প্রান্ত দেশে পাঁচ হাজার সূর্যের দীপ্তি নিয়ে বসে আছেন ঋষি অগস্ত্য—পলকহীন ধ্যাননেত্রে বিস্ময়কর কম্পমান শান্ত সৌন্দর্য।

কশ্যপ মণ্ডলে এসে আমি বারবার সেই সুড়ঙ্গ পথটি খুঁজেছি যেই পথ দিয়ে অন্য ছায়াপথ, বা, অন্য দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড থেকে একদা প্রতি-প্রোটন ও প্রতি-ইলেকট্রন দিয়ে গড়া হাইড্রোজেন হিলিয়াম পরমাণু হংস মণ্ডলের দিকে, সূর্য সাম্রাজ্য ও পৃথিবীর দিকে একদা চলে গিয়েছিল। অনন্ত শূন্যতায় আমি তাদের পদচিহ্ন খুঁজে দেখেছি। কিন্তু, এ পথের কি সত্যিই কোন শেষ নেই? অন্তহীন মহাতৃষ্ণা।

আমাকে বেষ্টন করে, আমাকে কেন্দ্র করে কোটি নক্ষত্রের ফুল দিয়ে সাজানো মহাচক্র আবর্তিত হচ্ছে—উদাসীন, নিরপেক্ষ ও নির্বিকার।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই মহাচক্রের সৃষ্টি ইতিহাস একটু অন্য ধরণের—এরা সাধারণ নক্ষত্রজীবনের ব্যতিক্রম। অতিকায় বাষ্প মেঘস্তূপ ঘনীভূত হয়ে যুগপৎ লক্ষ, বা, কোটি নক্ষত্র সৃষ্টি করে। বর্ষার একখণ্ড বাষ্প-মেঘে যেমন সহস্র কোটি জলবিন্দু সৃষ্টি হয়, তেমনই।

কিন্তু, এখানকার গ্যাস-স্তূপে সে ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারেনি। গ্যাস-স্তূপের খানিকটা জমাট বেঁধে বেরিয়ে এল নক্ষত্ররূপে—সেই নক্ষত্রই পরবর্তীকালে আবও খানিকটা টেনে এনে সৃষ্টি করল আর একটি নক্ষত্র দ্বিতীয় নক্ষত্রটি গ্যাসপুঞ্জের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েই আর একটিকে টেনে বের করে নিয়ে এল। সৃষ্টি হল তিনটি নক্ষত্র—এভাবেই এক কোটি পর্যন্ত নক্ষত্র সৃষ্টি হয়ে তার বলয়ের আকারে আবর্তিত হতে শুরু করল।

এ মুহূর্তে বলয়ের কেন্দ্রবিন্দুর মধ্য দিয়ে অপরা ছুটে চলছে—একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকার পথ দিয়ে। তাকে বেষ্টন করে এই মহাচক্র আবর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু পেছনেই আর একটি মহাচক্র, তার পেছনে আর একটি, সেদিকে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। সর্বজ্ঞ বারবারই টেলিভিশনের পর্দায় সংখ্যাতীত বিচিত্র বলয়ের ছবি এঁকে চলছে, আমাকে সেদিকে চোখ ফেরাতে বলছে। কিন্তু ঠিক সেমুহূর্তে আমি অন্য এক জগতের আকাশকে আমার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে মুছে আনছি। অন্য জগৎ? হাঁ, তাই। সে আমরা পৃথিবী ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে হংস মণ্ডল—তার ওদিকে সূর্য সাম্রাজ্য। সেই সাম্রাজ্যের এক ক্ষুদ্র ও নগণ্য উপনিবেশের কথা মনে হতেই মন যেন হাহাকারের মধ্যে ডুবে গেল

Encephelo graph সে সময় আমার মস্তিষ্কের যে ছবি তুলেছে সর্বজ্ঞ তারই রেখা-লিপি তুলে ধরল আমার সামনে, টেলিভিসনের পর্দায়। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম, ঘুঁসি বাগিয়ে আঘাত হানলাম ওই যান্ত্রিক দানবকে আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী ও বন্ধুকে। বন্ধু প্রতিবাদ করল না। কোন অসন্তোষও প্রকাশ করল না। বরং সঙ্গে সঙ্গেই তার যান্ত্রিক কণ্ঠ চিৎকার করে জানাল: "তুমি পৃথিবীর সন্তান"।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমি ওই ঔদ্ধত্যের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। এই অভিযানে আমি বারবার ওই যান্ত্রিক ঘোষণা শুনেছি—কোনবারেই এর তাৎপর্য তেমন ভাবে দেখা দেয় নি। কিন্তু, এবার সে যেন এক ভয়ঙ্কর অর্থ নিয়ে উচ্চারিত হল। যার তাৎপর্য আমি কিছুতেই বুঝে নিতে পারছি না। যেন এমন কিছু চলে যাচ্ছে, বা, চলে গিয়েছে যা আমাকে বেষ্টন করে, পরিব্যাপ্ত করে এতদিন টিকে ছিল। পৃথিবীর প্রতি পঁচিশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে সর্বজ্ঞ এমন এক আর্তনাদ করে ওঠে। বেচারি, সে হয়তো নিজে ও জানে না সে কি বলছে। এক অসহায় মানুষ ততোধিক অসহায় এক যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্ঞ টেলিভিসনের পর্দায় Minkowskiর সেই ঐতিহাসিক কথাটি আমাকে জানিয়ে দিল: From henceforth space in itself and time in itself sink to a mere shadow and only a kind of union of the two preserve an independent existence. This union is called Space-Time.

"এখন থেকে মহাকাশ ও মহাকালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রইল না। তারা নিছক ছায়ায় পর্যবসিত হল। মহাকাল ও মহাকাশ মিলিত হয়ে যে স্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, তাকে বলা যেতে পারে মহাকাশ-মহাকাল।"

সেই লেখাটি! তার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করি: কোন উপায় নেই? সময় বলতে কিছু থাকবে না? স্থান বলতে কিছু থাকবে না? মহাকাশ ও মহাকাল এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়ে আমাকে টেনে নেবে?

কোন জবাব নেই। অনন্ত ব্রহ্মলোক কঠোর নীরবতার তপশ্চর্যায় সমাহিত। শুধু সামনের হংস বলয়মণ্ডলটি নির্বিকার

ঔদাসীন্যে আবর্তিত হচ্ছে—কত শত বা সহস্র কোটি বছর ধরে যে ভাবে আবর্তিত হয়ে আসছে সেভাবেই।

বহু দূরে, বহু শত আলোকবর্ষ দূরে ধ্রুবলোকে মহামুনি বশিষ্ঠ। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন ছয় ঋষি—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গীরা ও মরীচি। স্থিতধী মহাপ্রাজ্ঞ। কিন্তু, আমার মনে কে যেন চিৎকার করে বেড়াচ্ছে: পৃথিবীর কত লক্ষ বছর অতিক্রান্ত! এদিনে কোথায় আমার প্রমত্তা পদ্মা; এ্যানডিসের শিখরে শিখরে সোনালি আলো; উচ্ছল অতলান্তিক। কোথায়? কোন্ দিকে?

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সপ্ত ঋষি কঠিন সমবেত কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে উঠলেন: এখানে কি খুঁজছ তুমি? এখানে সময় বলতে কিছু নেই, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম বলতে কিছু নেই। চতুর্মাত্রিক এই ব্রহ্মাণ্ডে তোমার অস্ত অস্তিত্ব—তুমি পৃথিবীর কেউ নও।

আমার প্রমত্তা পদ্মাকে ফিরিয়ে দাও

সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় আর একটি সমীকরণ সূত্র। আমার পদ্মা ও অতলান্তিকের স্বপ্নের ওপর দিয়ে যেন কঠিন বজ্রের সঙ্কেত:—

$$t' = t\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

নিষ্ঠুর নির্ব্যক্তিক মহাকাল আইনষ্টাইনের মুখ দিয়ে আমাকে শুনিয়ে দিল: কী ভাবছ তুমি? অপরা তোমাকে প্রায় আলোকের সমগতিতে এখানে নিয়ে এসেছে। এই মহাজাগতিক সময়ের মাপে তুমি হয়তো দুই বছর কাটিয়েছ। কিন্তু, পৃথিবীর কত লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। যে পৃথিবী তুমি রেখে এসেছিলে, বহু,

বহুকাল আগে তা মুছে গিয়েছে। তোমার প্রমত্তা পদ্মা আজ নেই।

ছবিটির দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলাম আমি: দাও, আমার প্রমত্তাকে ফিরিয়ে দাও। এ্যানডিসের সোনালি শিখর আবার আমি দেখতে চাই। যুবতী পৃথিবীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি তাকে ভালবাসায় স্নান করিয়ে দিতে চাই।

কেউ কোন জবাব দিল না। মহাকাশ-মহাকাল আমাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে। আমাকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলতে চাইছে। কিন্তু, আমি মুক্তি চাই। আমার জীবনে মাত্র দু'বছর: পৃথিবীর লক্ষ বছর!

মহামুনি বশিষ্ঠের পদতলে হাত রাখার জন্য নিজেকে এগিয়ে দিলাম—কত শত আলোক-বর্ষ দূর থেকে তাঁর পদস্পর্শ করতে চাইলাম। স্থিতধি পরমপ্রাজ্ঞ মহামুনি নির্বিকার। নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন: আমিও তোমার মতোই মহাজগতের মহাশৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছি।

আমি বিস্মিত! তথাপি, দুর্বিনীত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলাম: সে কী! এমন নির্মম বন্ধন তোমাদেরও?

পাশে বসে আছেন অরুন্ধতী, সলজ্জা ঋষিপত্নী। স্নেহার্তকণ্ঠে বললেন: কী আর করতে পার তুমি? সেই শৃঙ্খল ও শৃঙ্খলার মধ্যে মমতার লেশমাত্র নেই। একটি পরমাণু থেকে শুরু করে একটি সমগ্র দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড এক সূত্রে বাঁধা। সেই বন্ধন সপ্তঋষিকে প্রতি রাত্রে পৃথিবীর আকাশে নিয়ে হাজির করে: তোমাদের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম আকাশ প্রদক্ষিণ করে চলে আসি এখানে। যুগ থেকে যুগান্তকাল ওই একই পথ—। প্রতি রাত্রেই দেখি পৃথিবীকে।

বাধা দিলাম অরুন্ধতীকে। প্রশ্ন করলাম: প্রতি রাত্রেই দেখ? বার্ধক্যের ভারে সামান্য পীড়িত স্নেহার্ত কল্যাণী নম্রকণ্ঠে বললেন:

হাঁ, প্রতিরাত্রেই দেখি, এখনও, এ মুহূর্তেও দেখছি—দেখছি, তোমার উচ্ছল, প্রাণমত্তা পদ্মা, তা পদ্মাই, একটি পঙ্কিল জলরেখা মাত্র।

চীৎকার করে উঠলাম প্রতিবাদ ছুঁড়ে দিলাম ওই ঋষিকুঞ্জের দিকেঃ না, আমি ত হতে দেব না। না, কিছুতেই না, আমার প্রমত্তাকে ফিরিয়ে দাও।

এই আস্ফালন ও আর্তনাদ দেখে স্মিত হাসলেন ঋষিপত্নী। অবশেষে সরে গেলেন তিনিও। সামনে এসে দাঁড়ালেন ঋষি অত্রি।

অগাধ পাণ্ডিত্য, অগাধ তার হৃদয়। মিতভাষী সদাচারী। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে আশীর্বাদ জানালেন। বললেন বিজয়ী হও, অভিযাত্রী। এই ঋষিলোকে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাই কিন্তু সময় অতি অল্প ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তনের পথে আমরা এক এক জন তোমার সামনে দাঁড়াচ্ছি—একটি মুহূর্তমাত্র তোমাকে দেখছি।

কথাটি শেষ না করেই তিনি সরে গেলেন। সামনে এসে দাঁড়ালেন পুলহ। অত্রির অসমাপ্ত কথার অনুবৃত্তি করে বললেন সভ্যতার আদিকাল থেকে সময় বা কালকে তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র একই অপরিবর্তনীয়রূপে কল্পনা করে নিয়েছ। ধরে নিয়েছ, ... সর্বত্র, প্রতিটি পরমাণুতে, প্রতিটি ছায়াপথে প্রতিটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে, ব্যক্তি ও পদার্থের সামনে সে একই গতিতে বয়ে চলেছে। কিন্তু সে ধারণা ভুল।

অপসৃত হলেন ঋষি পুলহ। সামনে এসে দাঁড়ালেন পুলস্ত্য। শান্ত ও মৃদুভাষী। বললেন: ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য দ্বীপজগতের পাশে পাশে কালধারার গতিরও পরিবর্তন ঘটে। কালস্রোতস্বতী ও পৃথিবীর নদীস্রোতের মতোই কূলে কূলে তা গতির পরিবর্তন করে চলেছে। সে জন্যই তোমার পৃথিবীতে সময় যে গতিতে বয়ে চলে এখানে ঠিক সে গতিতে তা বয়ে চলে না।

সামনে এসে দাঁড়ালেন ক্রতু। কোন ভূমিকা না করেই বলতে শুরু করলেন : ধরে নাও, পৃথিবী থেকে তিন শত আলোক-বর্ষ দূরে রয়েছে আর্দ্রা (Betelguse)—সেখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটল। পৃথিবীতে এই বিস্ফোরণ বার্তা পৌঁছুবে ২২৭৫ সালে কিন্তু রোহিনীতে (Aldebaran) সেই বার্তা পৌঁছুবে ২২২৪ সালে। কেন না, সে রয়েছে পৃথিবী থেকে ২৫০ আলোকবর্ষ দূরে। একটি বিশেষ মুহূর্তের ঘটনা—কিন্তু দুই পৃথিবীর কাছে তা' সত্য হল ৫০ বছরের ব্যবধানে।

সামনে এসে দাঁড়ালেন অঙ্গীরা। বলতে শুরু করলেন : ধরে নাও একটি রকেট তখন ছুটে চলছে "কালপুরুষের" (Orion) দিকে 'আর্দ্রার' ওই বিস্ফোরণ সংবাদ তার কাছে পৌঁছুবে অন্য এক সময়ে। অতএব তুমি বুঝতে পারছ, একটি ঘটনাকে তিন দর্শক তিন সময়ে দেখবেন এবং প্রত্যেকেই দেখবেন তাদের নিজ নিজ পৃথিবীর গতি অনুযায়ী।

সত্যি বলতে কি, এ সকল কথা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি আমার প্রশ্নটাকে ফিরিয়ে চাই- আর কিছু চাই না। আমি শুধু ওই একটি মাত্র ভিক্ষার জন্যই হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আর কিছুই আমার প্রয়োজন নেই।

মারীচ বলতে শুরু করলেন :—মহাকাশের মধ্য দিয়ে যখন তুমি সকলের রাজ্য সীমানার বাইরের পথে ছুটে চলেছ, তখন তুমি বাস্তবিক ছুটে চলছে মহাকালের মধ্য দিয়ে। সে জন্যই পৃথিবী থেকে ত্বরণ গতি (accelerated) যাত্রার কয়েক ঘন্টার মধ্যে তুমি 'আর্দ্রার' ওই বিস্ফোরণ দেখবে, ঘটনাটি পৃথিবী কিন্তু তখনও দেখেনি। দেখেনি রোহিনী ও। শুধু তুমিই, তুমিই দেখেছ। তাদের কাছে তখন পর্যন্ত অমন কোন ঘটনাই ঘটেনি।

'কালপুরুষের' দিকে ছুটে—চলা ওই রকেটের মধ্যে শুধু যে ঘড়ির

কাঁটাই মন্থর হয়ে যাচ্ছে, তা নয়। কাল-প্রবাহ সেখানে নিজেই মন্থর হয়ে যাচ্ছে।

মারীচ, সহস্র কোটি বছর ধরে মৌন তপশ্চর্যা শেষ করে এই প্রথম কথা বলছেন। আবার বলতে শুরু করলেন, সেই নম্র কণ্ঠেঃ সময় নিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়াত না যদি ব্রহ্মাণ্ডে অনড়, বা, স্থিতিশীল বলে কিছু থাকত। মহাবিশ্বে গ্রহে উপগ্রহে, তারকায়, তারকামণ্ডলে এমন কিছু নেই, যাকে আমরা অনড়, বা, স্থিতিশীল বলতে পারি। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তিত হচ্ছে, সূর্যের চারদিকে কক্ষপথ পরিক্রমা করছে। আবার সূর্যকে কেন্দ্রস্থলে রেখে সৌর মণ্ডল ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু, এখানেই শেষ নয়, ছায়াপথও আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তিত হচ্ছে। নেমে এসো পরমাণু জগতে, বস্তুর ক্ষুদ্রতম সত্তায় —। সেখানেও আবর্তন—আলোড়ন—। অস্থির ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই সতত অস্থির।

এবার আবার সামনে এসে দাঁড়ালেন ঋষিকুলপ্রধান বশিষ্ট। স্মিতহাস্যে দক্ষিন হস্ত প্রসারিত করে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন ঃ— অস্থির ব্রহ্মাণ্ডের অস্থির শিশু! পৃথিবীর জন্য, পৃথিবীর স্থিতিশীলতার জন্য মহাবিশ্বে কেঁদে বেড়াচ্ছ! কিন্তু, পৃথিবী, আবর্তিত মহাবিশ্বের সহস্রকোটি আলোক-বর্ষের ইতিহাসে তার স্থান কোথায়?

তাঁর কথা অসমাপ্ত থাকতেই অত্রি আবার বলতে শুরু করলেন: পৃথিবী থেকে ৩৩টি আলোক-বর্ষ দূরে রয়েছে স্বাতী। কেউ যদি রকেটে চড়ে স্বাতীর দিকে যাত্রা করে, তবে পৃথিবীর সময়ের মাপে সে ৩৩ বছর পরে সেখানে পৌছুবে। সেখানে বিলম্ব না করে যদি সে আবার পৃথিবীর দিকে চলে যায় তবে পৃথিবীর সময়ের মাপে তার লাগবে ৬৬ বছর। কিন্তু, রকেটের আরোহী কিছুতেই বুঝতে পারবেন না যে, স্বাতী নক্ষত্রে পৌছুতে তাঁর ৩৩ বছর লেগেছিল। আলোকের গতির কাছাকাছি গতি নিয়ে রকেট যদি ছুটে থাকে তবে সকালে যাত্রা করে

দুপুরের মধ্যেই সে স্বাতীর দেশে পৌঁচেছিল এবং সন্ধ্যার আগেই পৃথিবীর আকাশ সীমায় ফিরে-আসা রকেটটি দেখা গিয়েছিল। রকেট আরোহীর কাছে মাত্র আট দশ ঘণ্টার ব্যাপার কিন্তু, পৃথিবীর কাছে ৬৬ বছর! অপরারও এখন সেই কালাতীত অবস্থা। তার সময়কে চিহ্নিত করার জন্য তার আকাশে কোন সূর্য নেই।

ও'বার বশিষ্ট! সহানুভূতিতে হৃদয়বত্তায় পরিপূর্ণ এক অস্তিত্ব বলতে শুরু করলেন' বালক, তুমি যৌবনজয়ী হয়েছ। তুমি যে জগতের আরোহী হয়ে এখানে এসেছ, সেখানে সময়ের গতি মন্থর হয়ে গিয়েছে। ফলে, তোমার পরিপাক যন্ত্রের কার্যকলাপ থেকে শুরু করে দৈহিক পরিবর্তন. এমন কি, দেহের প্রতিটি অনু-পরমানুর স্পন্দন ও মন্দীভূত হয়ে গিয়েছে—। তুমি পৃথিবীর সহস্র বা, লক্ষ বছরের পরিব্যাপ্ত যৌবনের অধিকারী। এখান থেকে, এতদূর থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কী দেখছি জান? দেখছি, তুমি যে জীবন, যে সভ্যতা রেখে এসেছ, বা যে মানুষদের দেখে এসেছ, তাদের একটি ও নেই। কত কাল আগে তারা মুছে গিয়েছে কেউ তা মনে ও রাখে নি। আর তোমার পদ্মা? না, তাকে কোথা ও খুঁজে পাচ্ছি না। তবে যে স্থানটির কথা তুমি বলছ সেখানে একটি পঙ্কিল জলরেখা—হাঁ. তা দেখতে পাচ্ছি।

এই ঋষি বাক্য অভিশাপ, না, আশীর্বাদ, বুঝতে পারলাম না। পৃথিবীর সময়ের মাপে সহস্র, বা, লক্ষ বছরে পরিব্যপ্ত যৌবন নিয়ে আমার কি প্রয়োজন? আমি আমার পদ্মাকে ফিরিয়ে চাই: উচ্ছল, প্রগলভা প্রমত্তাকে আমি পেতে চাই

চিৎকার করে উঠলাম, আর্তনাদে আর্তনাদে মহাকাশের সেই অঞ্চলটি কাঁপিয়ে তুললাম। কিন্তু, কোথা ও কেউ নেই। কেউ শুনলনা। দূরে দেখতে পাচ্ছি, চলে যাচ্ছেন সপ্ত ঋষি, নির্বিকার উদাসীন, হৃদয় হীন। আমার জন্য অনন্ত জীবন রেখে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।

মহাজগতের মহাশৃঙ্খলে বাঁধা সাতটি অসহায় বন্দী করুণ দৃষ্টিতে আর এক বন্দীর দিকে তাকাতে তাকাতে। তথাপি চিৎকার করে চলেছিঃ আমি চাই না, চাই না। এই অনন্ত যৌবন চাই না। আমি শুধু আমার প্রেমতাকে ফিরে পেতে চাই—পৃথিবীর সময়ের মাপে তা হোক একটি মুহূর্তমাত্র- । তবু ও আমি তাকে চাই।

অপরা বিপুলবেগে ছুটে চলেছে। চলেছে হংসবলয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের দিকে। কোটি নক্ষত্রের বলয়ের কেন্দ্র-বিন্দু অতিক্রম করে করে সে কোথায় যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না।

সর্বজ্ঞ এখন ও টেলিভিসনের পর্দায় আইন ষ্টাইনের সেই বিদঘুটে সমীকরণ সূত্রটি আমার জন্য ভাসিয়ে রেখেছে কী আর প্রয়োজন আছে ওটার? যা জানাব, আমি তা জেনে গিয়েছি।

রকেট থেকে লাফিয়ে পড়ে চলে গেলাম নিথর সমুদ্রের দিকে। একের পর এক বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য তোরণ সেই তোরণের নিচে এক নিঃশব্দ অস্তিত্ব। কোনদিন একটি ঢেউ সৃষ্টি হয় নি, ঝড় ত বয়ে যায় নি—।

বিচিত্র বর্ণের তোরণের নিচে শায়িত জললক্ষ্মী। এক খণ্ড পাথরের উপর বসে জলতলের দিকে তাকালাম। জলের নিচ থেকে সেখানকার তেজস্ক্রিয় বালুকারাশি থেকে যে ক্ষীণ আলো তরঙ্গ আসছে, তার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছি আমি। বিশ্বাস হয় না, তবুও বিশ্বাস করতে হল—আমি যা ছিলাম পৃথিবী থেকে যাত্রার দিনে আমার মুখাবয়ব যেমনটি ছিল, তেমনই রয়েছে। জলতলের ওই মানুষটির মুখে আমি যেন অসহায়তা, ও ক্লান্তির ছাপ দেখছি। তার নিঃসঙ্গতার বেদনা যেন আমারই বেদনা। পৃথিবীর সময়ের মাপে কত হাজার বছর ধরে আমি ওই মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম!

অবশেষে আমি পিশাচের রাজ্যে

ইতিমধ্যে কখন যে হংসবলয় মণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করে এসেছি, টেরও পাইনি। রকেটে বসে থাকলে সর্বজ্ঞ মশাই তাঁর অবিচল কর্তব্যবোধে আমাকে বলে দিতেন কোথায় যাচ্ছি আমরা। এটা যে কোন্ নক্ষত্রমণ্ডল ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। পৃথিবীতে বসে নক্ষত্রমণ্ডলের যে মানচিত্র আঁকা হয়েছে, তা এখানে আদৌ চলে না। Relativity-র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা কথাটি আমাকে শুনিয়ে দিয়েছেন। এমন কি, 'মহাজাগতিক হিমঘর', যার সম্পর্কে অভিযানের শুরুতেই আপনাদের বলা হয়েছে, তারও সঠিক জ্যামিতিক বিবরণ তাঁরা আমাকে দিতে পারেন নি।

থাকুক সে কথা। শুনুন আমার কথা, এখনকার কথা। আমার সামনে দুটি যুগলনক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি। অনেক যুগল নক্ষত্রের কথা আপনাদের শুনিয়েছি। কিন্তু এরা স্বতন্ত্র।

মধ্য যুগের আরব জ্যোতিষীরা কেন যে এদের নাম Algol বা পিশাচ বা রাক্ষস রেখেছিলেন এখানে না এলে তা বুঝতেই পারতাম না।

পৃথিবী থেকে বহু হাজার আলোকবর্ষ দূরে হংসবলয়মণ্ডলের অন্যদিকে অপরা ছুটে চলছে। সেই অপরারই নিথর সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে আমি এই বেতারবার্তা আপনাদের শোনাচ্ছি। ওরা পিশাচই হোক, দৈত্য-দানব, রাক্ষস যাই হোক, ওদের দিকে তাকিয়ে আমি আতঙ্ক ও কৌতূহলে অভিভূত হয়ে পড়ছি। ওই দেখুন, এক জোড়া নক্ষত্র পরস্পরের মধ্যে দড়ি টানাটানি করছে এবং ওই টানাটানির অবস্থায় তারা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। যদিও ওটা গ্যাসীয় দড়ি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বাঁধনটি বেশ শক্ত।

বিজ্ঞানীরা আমাকে আগেই শুনিয়ে রেখেছেন, ওটা আসলে ছিল চার নক্ষত্রের একটি জোট। দুটি বড়, দুটি ছোট। বড় দুই নক্ষত্র যখন পরস্পরের মধ্যে দড়ি টানাটানি করছে তখন দুই কনিষ্ঠ পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি ছাড়া পায়নি। গ্রহরূপে ওদের প্রদক্ষিণ করছে এবং দূরে দাঁড়িয়ে দুই অগ্রজের খেলা উপভোগ করছে। নক্ষত্র নক্ষত্রকে গ্রহরূপে প্রদক্ষিণ করছে, এমন কত ঘটনার কথাই ত আপনাদের বলেছি—অতএব, অবাক হবেন না।

এই নিথর সমুদ্রের ধারে যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন, তবে দেখতে পাবেন নক্ষত্রমাংসভোজী দুই পিশাচকে। আরববা সত্যই আজগুবি কথা বলেননি বা বানানো কথাও আপনাদের শোনান নি। আমি দেখতে পাচ্ছি, এ মুহূর্তে যে নক্ষত্রটি ভ্রাতৃমাংস খেয়ে স্ফীতোদর হয়ে উঠল, পর মুহূর্তেই সে আবার ক্ষীণ দেহ হতে শুরু করল। ভাবলাম এবার যা হোক একটা স্থিতিশীলতা এল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র না যেতেই এক প্রচণ্ড থাবা মেরে ছোট বড়র দেহ থেকে খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে কৃতিত্বের আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠল। মুহূর্তেই পাল্টা থাবা; ভ্রাতৃ-দেহের মাংস নিয়ে দুই পিশাচের উৎকট বেসাতি। কিন্তু দড়ির বাঁধনটি মোটেই শিথিল হচ্ছে না,—নইলে অনায়াসেই একজন অপর জনের মাংস নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত। কত শত কোটি বছর ধরে দুই পিশাচ এই নৃশংস খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। নিথর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আমি এই মহাজাগতিক পিশাচনৃত্য দেখছি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওরা আসলে ছিল অখণ্ড দেহ যমজ যাকে বলে Siamese Twins। অখণ্ডদেহটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলেও দড়ির বাঁধনটি আলগা হয়নি। তারা দুই শরিক হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সম্পত্তির ভাগাভাগি হয় নি। সেজন্যই এই বিভ্রাট। সমস্যাটির সুন্দর সমাধান হতে পারে যদি মহাকাশ সমাজের

বিশিষ্টদের কেউ এসে অভিকর্ষের টানে ওই বাঁধনটি খুলে দেন, অথবা দুই কলহলিপ্ত যমজের মধ্যে কোন একজনের দেহের খানিকটা তুলে নিয়ে একেবারে "দে-ছুট" করতে পারেন।

বিজ্ঞানীদের কথাটি নিয়ে আমি যখন ভাবছি, ঠিক তখনই অকস্মাৎ একটি হিংস্র থাবা। এ এক অদ্ভুত পরিবেশ। চারদিকে অসংখ্য ক্ষুদে নক্ষত্র; তারই মধ্যে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দুই পিশাচ-ভ্রাতা এক একবার হিংস্রতার আনন্দে নেচে উঠছে।

"নিথর সমুদ্রের" তটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি এই দৃশ্য দেখছি। মাঝে মাঝে দুইয়ের মধ্যে অদ্ভুত পীরিতি; বুঝি একটা ফয়সালা হয়ে গেল। কিন্তু হায়রে কপাল! যুগপৎ দুইজনেই থাবা মারল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই শীর্ণদেহ কঙ্কাল হয়ে উঠল। ভ্রাতৃ-মাংসে উদর-পূর্তির এই পিশাচ-প্রবৃত্তি নাকি মহাকাশে অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু অপরা যে পথে চলেছে, সেখানে এই দৃশ্য আর আমার চোখে পড়ে নি

হতভাগ্যদের কুঁড়ে ঘরের পাশে

পিশাচ রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অপরা এখন ঢুকে পড়ছে 'হতভাগ্যদে'র রাজ্যে। সীমান্ত অতিক্রম করার কালে ধন্যবাদ জানালাম সে সকল আরব জ্যোতিষীদের যাঁরা বহুকাল আগে এদের কাহিনী লিখে রেখে গিয়েছেন। আরব সভ্যতার এক স্বর্ণ যুগে তাঁরা মহাকাশের আরও চিত্র এঁকে গিয়েছেন, আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করে রেখে গিয়েছেন। মনে পড়ছে "ফিনিশিয়ান" নাবিকদের কথাও—প্রথম নক্ষত্রচিত্র এঁকেছিলেন তাঁরাই। কূলহীন সমুদ্রে নক্ষত্রের নিশানা রেখে চলার বিদ্যা প্রথম শিখিয়ে দিয়েছিলেন ফিনিশিয়ানরা।

অপরা প্রবেশ করছে 'হতভাগ্যদের' রাজ্যে—হংসবলয় মণ্ডলের

অনেকটা ওদিকে। যাঁরা স্থানটি ঠিক কোথায় আঁচ করতে পারছেন না তাঁদের আমি বলছি; পৃথিবীর বিষুবরেখায় দাঁড়িয়ে উত্তর আকাশে ধ্রুব মণ্ডলের দিকে তাকান,—সেই মণ্ডলটিকে বামপাশে রেখে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিন ১২ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

হাঁ, যা বলছিলাম। এই 'হতভাগ্যদের' রাজ্যে আমি অসংখ্য ছিন্ন-বাস পরিহিত কঙ্কালসার নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি। দরিদ্র জনতার এক বিরাট সমাবেশ। আমি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি কল্প-মণ্ডলে এমন বহু দুঃস্থ শিবির রয়েছে। কিন্তু অপরা আমাকে সে পথে নিয়ে যায় নি বলে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। 'হতভাগ্য' আমি তাদেরই বলছি, যারা নক্ষত্ররূপে ফুটে উঠতে চেয়েছিল, অথচ পারেনি। অথবা আধ-ফোটা অবস্থায় যারা নির্বাপণের প্রতীক্ষায় রয়েছে। পিশাচের রাজ্যসীমানা পেরিয়ে বহু আলোকবর্ষে এই অজ্ঞাত ও অখ্যাত ব্যর্থ জীবনের কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে ছায়া-চিত্রের মতো একটির পর একটি 'হতভাগ্য' মহাকাশে আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, গৃহস্থের দোরে প্রত্যাখ্যাত ভিখারীর মতো মুখ বুজে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে তাদের মধ্যে এমন কয়েকটিও আমার চোখে পড়ল যারা অন্য নক্ষত্রের তাঁবেদারি করছে এবং গ্রহরূপে প্রতিনিয়ত তাদের প্রদক্ষিণ করে এক ধাবা অন্য ভিখারীকে তুষ্ট রাখতে চাইছে। এই ভিখারী মহলেও বিসদৃশ কৌলিন্য-পরিচয় রয়েছে দেখে ভারি তাজ্জব বনে যাচ্ছি।

বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'Black Dwarf' বা কৃষ্ণ বামন। এরা অন্য নক্ষত্রদের মতোই আকাশে ফুটে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু একটি কঠিন নিয়মের জন্যই সে সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হল। নিয়মটি হচ্ছে এই, যাদের দেহ-ভর (mass) সূর্য-দেহের অন্ততঃ একশত ভাগের একভাগ নয়, তারা নক্ষত্ররূপে পরিণতি

জাতের সুযোগ পাবে না—সে জন্যই ওরা নক্ষত্ররূপে ফুটে উঠতে পারল না। মহাকাশের শীতলতায় ওরা জমাট বেঁধে কঠিন বস্তুরূপে পরিণত হয়ে গেল—নিজ নিজ দেহে পরমাণু চুল্লী জ্বালাতে পারল না। ওদের দৈহিক পদার্থ এত কম যে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইন্ধন জ্বালাতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হল। ফলে, নক্ষত্ররূপে এদের কোন পরিচয়ই নেই। ব্যর্থ জীবনের করুণ কাহিনীগুলি শুনতে শুনতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন দেখা হল এমন একজনের সঙ্গে যিনি একদা জমিদার-পুত্ররূপে নক্ষত্র সমাজে পরিচিত থাকলেও আজ এই নিঃস্বের তালিকায় নাম লিখিয়ে নিয়ে কোনরূপে টিঁকে আছেন। উনি বাস্তবিক একটি "শ্বেত বামন" বা, White Dwarf—এককালে প্রচুর দীপ্তি ও শক্তির অধিকারী ছিলেন। বে-হিসাবে সব খরচ করে ফেলে এখন এই P. L. Camp-এ এসেছেন। আমাদের সূর্যও একদিন 'শ্বেত বামন' হয়ে উঠবেন—যখন তাঁর বুকের হাইড্রোজেন চুল্লী নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

"কৃষ্ণ বামন" দুঃস্থদের মধ্যে আর এক দলের ইতিহাস দেখছি আরও মর্মান্তিক। এরা একটি অতিকায় নক্ষত্রেরই অবশেষ। বাস্তবিক. এদের এই দুরবস্থার জন্য এঁরা আদৌ দায়ী নন। কোন নক্ষত্রের দেহসম্পদ যদি সূর্যের তুলনায় ৬৫ গুণ বেশী হয়, তবে তার পরমাণু চুল্লীর বিকিরণের প্রচণ্ডতায় সে নক্ষত্র অল্প কালের মধ্যেই বিস্ফোরণের ফলে সহস্র বা, লক্ষ খণ্ডে ছিটিয়ে পড়ে। প্রতিটি খণ্ড এক একটি 'কৃষ্ণ বামন'। আলোহীন, তাপহীন, অন্ধকার অস্তিত্ব।

ওদের মধ্যে দিয়ে, সংখ্যাতীত কৃষ্ণ অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে অপরা কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই ছুটে যাচ্ছে—অপরা যেন তাদের গ্রাহ্যই করছে না। ওই নিঃস্ব সমাবেশের ভেতর দিয়ে চলছি, আর দেখতে পাচ্ছি, বড় হওয়ার ব্যর্থ স্বপ্ন। দেখতে পাচ্ছি. বৃহত্তের শক্তিমত্তার আস্ফালনও। কিন্তু, কোন কোন 'কৃষ্ণ বামন' দেখছি নিজের অবস্থার

পরিবর্তন আনার জন্য এক আধটু চেষ্টা করছে। 'কৃষ্ণ বামন' থেকে অন্ততঃ 'শ্বেত বামন' পর্যায়ে যাওয়া যায় কিনা, তার জন্য যতদূর সম্ভব তারা চেষ্টা করছে। ওরা আমার সামনে দাঁড়িয়েছে "লোহিত বামন" রূপে। ১৫টি আলোক-বর্ষে বিস্তৃত এই রাজ্যে সবাই 'বামন' —সবাই ক্ষুদ্রকায়, অপরিণত।

নিঃস্ব ভিখারীদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অপরা যাচ্ছে। ভাবছি, ও আবার কারো গায়ে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে!

নিথর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে নিঃস্বের শোভাযাত্রা দেখছি। বৃহৎ নক্ষত্রগোষ্ঠী এদের আত্মা বলেই স্বীকার করে না। কেননা, এদের পুঁজি কম।

তবুও অধিকাংশই আত্মমর্যাদা নিয়ে অটল রয়েছে। কিন্তু, তারই মধ্যে এক একটির আচরণ দেখে আমি দুঃখ পাচ্ছি। এই ত দেখছি, কয়েকটি "কৃষ্ণ বামন" এক বড় মাপের নক্ষত্রকে কাছে পেয়ে তাকে একেবারে ছেঁকে ধরল—তার উপগ্রহ হয়ে নাচতে নাচতে এই P. L. Camp ছেড়ে চলেই গেল। মনে নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু, আরও বেশী দুঃখ পেয়েছি "ময়ূর পুচ্ছ দাঁড়কাকটি" দেখে। ইনি এক "লোহিত বামনের দেহ-বিচ্ছুরিত সামান্য আলো নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছেন এবং অসাধারণ পুলকে এখানে সেখানে উঁকি দিচ্ছেন। ইনি যে একটি "কৃষ্ণ বামন", সে কথাটি বে-মালুম চেপে রেখে উনি নক্ষত্ররূপে জাঁক দেখাচ্ছেন। হায়রে হতভাগা! তুমি জান না, তোমার সব-পরিচয়ই আমার নখদর্পণে। এ মুহূর্তে "লোহিত বামনটি" তার আলো গুটিয়ে নিক, তুমি আবার সেই "কৃষ্ণ বামন"! অতএব ওই ময়ূর পুচ্ছগুলি খুলে ফেলে তোমার আসল রূপে হাজির হলে আর কিছু না পাও, আমার চোখে কিছুটা মর্যাদা পাবে।

ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। ভাবছি, এই হতভাগ্যের রাজ্যের শেষ কোথায়? এই ভগ্নোদ্যম, হতাশা, দারিদ্র্যকে লুকোবার নিষ্ফল চেষ্টা

করতে গিয়ে সেই দারিদ্র্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো, এর কি শেষ নেই? কত আলোক-বর্ষে বিস্তৃত এই বিরাট উপনিবেশ? ঠিক বুঝতে পারছি না এবং আপনাদেরও সঠিকভাবে বলতে পারছি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে অপরা একটি 'কৃষ্ণ বামন' নয়ত? আশাভঙ্গের একটি প্রতিমূর্তি? তাই যদি হবে, তবে এমন উদ্দাম গতিতে সে আন্তর্নক্ষত্রলোকে ঘুরে বেড়াবে কেন? নাক্ষত্রিক স্থিতিশীলতা, নির্দিষ্ট কক্ষে পরিক্রমা, নক্ষত্রজীবনের এই অমোঘ নিয়মগুলিকে—যা শ্বেত বামন, লোহিত বামন, বা, পূর্ণ-জ্যোতি নক্ষত্র—সকলের পক্ষেই সমান ভাবে প্রযোজ্য—সে ফাঁকি দেবে কি করে? অনন্যা, অপরা অনন্যা—তার জীবনের সঙ্গে অন্য জ্যোতিষ্ক জীবনের বিন্দুমাত্র মিলও নেই।

কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকা

২৪ হাজার আলোকবর্ষ।

পৃথিবী থেকে ২৪ হাজার আলোকবর্ষ দূরে এক কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকার পাশ দিয়ে অপরা ছুটে চলেছে। শ্রোতারা মনে রাখবেন, ২৪ হাজার আলোকবর্ষ। এক একটি আলোক-বর্ষ বলতে কত মাইল বোঝায় তাও আপনারা জানেন। পৃথিবীর উত্তর-মেরু বিন্দু থেকে উত্তর দিকে তাকালে একটি অতি দীর্ঘ বিরল-বসতি অঞ্চল,—যদিও সেটা আদৌ বিরল-বসতি নয়, বরং অত্যন্ত ঘন-বসতি দীপ্তিহীন, শক্তিহীন হতভাগ্যদের উপনিবেশ আপনাদের যন্ত্রে কখনও ধরা পড়বেনা—তারই পাশ দিয়ে আমরা চলেছি খুব সম্ভবতঃ মহাসর্প মণ্ডলের দিকে। এখানে অপূর্ণ সাধ ও ব্যর্থ স্বপ্নের ইতিহাসের পাশ দিয়েই আমার পথ চলা। 'হতভাগ্যদের রাজ্যে' কত সম্ভাবনার মৃত্যু আপনারা দেখেছেন। নক্ষত্র-রূপে ফুটে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে যারা জীবন শুরু করেছিল, তারা কৃষ্ণ বামন রূপে জীবন শেষ করতে চলেছে, এটা আপনাদের দেখিয়েছি।

এখন সামনে দেখতে পাচ্ছি শত কোটি নক্ষত্র সৃষ্টির প্রত্যাশায় এক অন্তহীন প্রতীক্ষা। সেই প্রতীক্ষা মূর্তিমতী হয়ে রয়েছে "কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকার" ভীরে। নীহারিকা মানেই হল অস্পষ্টতা, যা সৃষ্টির আগে শিল্পী-মানসে প্রতীক্ষা করতে থাকে, যার পরিচয় শিল্পীও পুরোপুরি জানেন না। অথচ সেই বাস্তব সত্তা— শিল্পী, বিজ্ঞানী, চিত্রকর সকলে নিজ নিজ বুকে এই অস্পষ্টতার বোঝা বয়ে বেড়ান, তা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, কিন্তু তার ভাবী রূপ কি হবে, তার কিছুই তিনি জানেন না।

জানেন না তিনি তাঁর মনের পরমাণু চুল্লীর পরিচয়ও। যেখানে পুরাতন অনুভূতির কণা বিদীর্ণ হয়ে নতুন কণা সৃষ্টি হয়, নতুন অনুভূতির অঙ্কুর জেগে ওঠে। অনুভূতি ঘটায় সব বিক্ষোভ ও আলোড়ন, প্রত্যাশা ও হতাশা, নিষ্ঠুর গাঢ় কাল অনুভূতির প্রসাদকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় কিনা, এসব না হলে কেউ জানেন না।—সমালোচকরা বাহবা দেন, অথবা, "কিছুই হয়নি" বলে শ্লেষ করেন। আমরা সয়ে যাই, হয়ত সমালোচকদের সমালোচনা করি,—কিন্তু কেউ কি দেখেছেন নতুন কণার বন্যা কোথা থেকে শিল্পী সেই স্বপ্ন বয়ে নিয়ে চলছেন, সে নবরূপ শতাব্দীর ভগ্নাংশ মাত্রায় নতুন পরমাণু সৃষ্টি হয়ে এমন একটি কিছু গড়ে উঠছে যার সঙ্গে তাঁর নিজেরও পরিচয় ছিল না। তাঁর মনের নীহারিকার এই সেই বাষ্পীভূত অবস্থা, যা প্রত্যাশায় কাঁপছে কিন্তু প্রত্যাশাটি যে কিসের জন্য তিনি তা কোন দিন জানেন না।

আমরা সামনে শত কোটি নক্ষত্র সৃষ্টির প্রত্যাশা নিয়ে এই কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকা প্রতীক্ষা করছে পৃথিবীর আকাশের উত্তর দক্ষিণে। বস্তুত আমাদের ছায়াপথে এমন অসংখ্য কৃষ্ণ নীহারিকা রয়েছে। মহাকাশের শীতলতায় গ্যাস ও হাইড্রোজেন হিলিয়াম কণিকা ঘনীভূত হয়ে ওদের মধ্যে একদিন উজ্জ্বল অস্তিত্ব গড়ে তুলবে,—যার পরিচয় হবে নক্ষত্র। বস্তুতঃ তাদের তাই প্রত্যাশা, আমিও সেটাই প্রত্যাশা করছি।

গ্যাস ও ধূলিকণায় ওই কৃষ্ণবর্ণ গালিচার পাটে পাটে একদা নক্ষত্ররা জ্বলে উঠবে, তাদের সংখ্যা সহস্র কোটি না হলেও অন্ততঃ শতকোটি হবে। কিন্তু, ঠিক এ মুহূর্তে কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকার আর কোন পরিচয়ই নেই। সে শুধু এক সুদূর সম্ভাবনার প্রতীক।

পৃথিবীর উত্তর-মেরুর প্রান্তবিন্দু থেকে ১৫ হাজার আলোকবর্ষ দূরের এই অতি সংকীর্ণ পথে চলার কালে আমার পাশে যেই কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকাটি দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন নীহারিক 'বলাকা'। হাঁ, বলাকাকে দেখলাম। মহাকাশে আরও দূর থেকে দূরে ভেসে যাচ্ছে যেন মনে হয় ছায়াপথের প্রান্তদেশে কোন নিভৃত আশ্রয়ের খোঁজে সে বেরিয়েছে যেখানে সে এই সম্ভাবনার বোঝা হালকা করতে পারবে—শত বা সহস্র কোটি নক্ষত্রের আবির্ভাবের দিনে তাকে বে-আব্রুণা, লজ্জাহীনা বলে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। সেই নির্বিঘ্ন মুক্তির আশায় দূরে, বহু দূরে আমিও প্রতীক্ষা করছি বলাকা! প্রসূতি-নিলয়ের দিকে তোমার যাত্রা শুভ হোক। তোমার সহস্রকোটি সন্তান যেদিন তোমার প্রশস্ত বক্ষ আলোকিত করে খিলখিল করে হেসে উঠবে, সে দিন যত দূরেই থাকি না কেন, শত সহস্র বা, লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে অন্য সকলের শুভেচ্ছার সংগে আমারও শুভেচ্ছা থাকবে। এখান থেকে, অর্থাৎ 'নীহারিকা বলাকার' প্রান্ত দেশ থেকে ছায়াপথের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে পৃথিবী থেকে ১৫ শত আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে 'কালপুরুষ' (Orion) মণ্ডল। সেই মণ্ডলের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'অশ্ব মুণ্ড নীহারিকা' (Horse's Head Nebula)—যা বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। গভীর কৃষ্ণবর্ণ এক মেঘস্তূপের প্রান্তিক এলাকা জুড়ে নক্ষত্ররা এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে একটি অশ্বমুণ্ডের মতই দেখাচ্ছে। অর্থাৎ রেখায় রেখায় একটি অশ্বমুণ্ড চিত্রিত হয়েছে,—কিন্তু তার দেহটির অন্যান্য অংশের কোন আভাসই পাওয়া যাচ্ছে না।

ধূলিকণার এক অতি-বিস্তীর্ণ মেঘ, যার ব্যাস হচ্ছে ত্রিশটি আলোক-বর্ষ।

আমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছি নিথর সমুদ্রের ধারে, অথবা এখনও চলেছে নীহারিকা বলাকার গা ঘেঁষে। সে কি যাচ্ছে মহাসর্প মণ্ডলের দিকেই? ঠিক বুঝতে পারছি না। এক খেয়ালী পৃথিবীর খেলার পুতুল হয়ে আমি আর কতকাল ঘুরে বেড়াব? আমার উচ্ছল পদ্মা মজে গিয়েছে, আমার ভারতকে উত্তর-মেরুর তুহিন ধস ঢেকে ফেলতে নেমে আসছে। যে পৃথিবীকে আমি রেখে এসেছি, উচ্ছল ও প্রাণোন্মত্ত সে পৃথিবী মরে গিয়েছে। সে পৃথিবীর শুধু আমিই রয়েছি, চেতনাহীন অমৃতত্ত্ব নিয়ে আমি হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছি পৃথিবীর সময়ের মাপে যাকে বলা যায় না, বলা হয় অনন্তকাল।

কিন্তু, নিছক একটি নীহারিকা দেখানোর জন্য হাপর আমাকে এখানে নিয়ে এল কেন? ছায়াপথের যে সকল নক্ষত্রমণ্ডল আমি ঘুরে এসেছি সেখানেই অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকা ছিল। সে সকল নীহারিকা সর্বক্ষণ পেছনের তারকাগুলিকে ঢেকে রেখেছে। তারা যদি এক মুহূর্তের জন্যও একটু সরে যেত, পৃথিবী থেকে ছায়াপথের অন্য চেহারা দেখা দিত। আমাদের ছায়াপথের কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকার পাশেই রয়েছে আলোকোজ্জ্বল নীহারিকা। সে সব নীহারিকায় সমস্ত নক্ষত্রশিশু এখনও জন্মায়নি। যারা জন্মেছে, তারা ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে শুভ-সংবাদটি পাঠিয়ে দিচ্ছে—এবং পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের নক্ষত্র তালিকায় ইতিমধ্যেই তাদের নামও তালিকাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মহাকাশে ভাসমান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নিয়ে যদিও এক শ্রেণীর নীহারিকা গড়ে উঠেছে—কিন্তু, অন্য নীহারিকা রয়েছে যাদের জন্ম-ইতিহাস আলাদা। এ সকল নীহারিকার সৃষ্টি হয়েছে বিগতকালের নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের ফলেই। অপম যদিও সে পথে যায় নি, তথাপি আমার মনে হয়, বৃষরাশি মণ্ডলে (Taurus) এমন এক

নীহারিকা আমি আগেই দেখেছি। দেখেছি, বিস্ফোরিত নক্ষত্রের দেহ নিসৃত বিকিরণ বিপুল বেগে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেই সঙ্গে বস্তুকণাগুলিও। সৃষ্টি হয়েছে একটি কুজ্ঝটিকা। এই পদার্থগুলিই একদিন জমাট বেঁধে অন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করবে, সৃষ্টি করবে তাদের গ্রহ-মণ্ডলও। কিন্তু, আপাততঃ তাদের পরিচয় নীহারিকারূপে, অথবা, বলা যায়, সুস্পষ্ট অবয়বহীন গ্যাসস্তূপ রূপে।

এখান থেকে, পৃথিবী থেকে ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে নীহারিকা বলাকার প্রান্ত থেকে আমি পৃথিবীর আকাশের একেবারে দক্ষিণ-প্রান্তে, বোধহয়, "মেগেলান মেঘছায়াই" (Megallenic clouds) দেখতে পাচ্ছি। বিগতকালের সমুদ্র-অভিযাত্রী Megallen সেদিন দক্ষিণ আকাশে স্থিতিশীল একখণ্ড মেঘ দেখতে পেয়েছিলেন এবং যত বারই তিনি ওই এলাকা অতিক্রম করে গিয়েছেন, তত বারই ওকে অনড় দেখেছিলেন। অমর সমুদ্র-অভিযাত্রীর দিন লিপিতে তিনি সে কথার উল্লেখও করে দিয়েছেন। আসলে, "মেগেলান মেঘছায়া"—মোটেই মেঘ নয়—সে একটি নীহারিকা,— অথবা এও বলতে পারেন সে একটি ছায়াপথ, আমাদের ছায়াপথকে প্রদক্ষিণ করছে। আমাদের ছায়াপথের বাইরে সংখ্যাতীত নীহারিকার মধ্যে সেও একটি। তার কয়েকটি নক্ষত্র জন্মেছে বটে, কিন্তু, আরও নক্ষত্র-সৃষ্টির সম্ভাবনায় মহাকাশের শীতলতায় সে কাঁপছে। ভাবীকালের আর একটি ছায়াপথকেই আজ আমি দেখছি মেগেলান মেঘছায়ারূপে। বাস্তবিক, সে হয়ে উঠবে আর একটি ছায়াপথ, অথবা, Shapleyর ভাষায় আর একটি দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড, Island universe। আমাদের ছায়াপথের মতোই আর এক সম্পূর্ণ নাক্ষত্রিক জগৎ। মেগেলান মেঘছায়া সেই সম্ভাবনার দোরে এসে শিহরিত রোমাঞ্চিত হচ্ছে। পৃথিবীর একেবারে উত্তর প্রান্তের আকাশ থেকে সুদূর দক্ষিণ-প্রান্তের দিকে তাকিয়ে আমি শুধু একটি মেঘছায়াই দেখতে পাচ্ছি।

অস্পষ্ট, এবং অস্পষ্ট বলেই তার পরিচয় নীহারিকারূপে। কিন্তু, এ-ইতিহাস কি এখানেই শেষ? ছয় কোটি থেকে চার হাজার কোটি সূর্যের দীপ্তি নিয়ে গড়ে ওঠা অন্য ছায়াপথ, তাকেও পৃথিবী থেকে একটি মেঘছায়া রূপেই মনে হয়।

এই মেগেলান মেঘছায়া, কৃষ্ণবর্ণ গ্যাসীয় দেহ,—তা থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে সময় লাগে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর— মনে হবে মেগেলান অনেক দূরে। কিন্তু, মহাজাগতিক হিসাবে অতি কাছে—এ পাড়া ও পাড়া। এই দূরত্বে থেকেই আর এক ছায়াপথকে, আমাদের ছায়াপথকে, প্রদক্ষিণ করছে মাত্র কিছুকাল আগেও সে ছিল আমাদের ছায়াপথের কাছাকাছি। ছিল আমাদের ছায়াপথের সংগে একদেহ হয়ে।

এই চ[illegible] যাচ্ছে মেগেলান, দূরে, আরও বহুদূরে। সে কি চলে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে? ভাবীকালের নাবিকরা দক্ষিণ সাগরে জাহাজ ভাসিয়ে দিয়ে আর দেখতে পাবেন না মেগেলানকে? হাঁ। তাই

মেগেলান দৃষ্টির সীমানা থেকে বিদায় নিচ্ছে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি নীল নীহারিকা সামনে এসে দাঁড়াল নীলবর্ণ নীহারিকা এই প্রথম দেখলাম, মহাজগতে এই প্রথম দেখলাম নীলবর্ণা এক সুন্দরীকে। নীহারিকা বলাকার সীমানা আমি কখন য অতিক্রম করেছি, টের পাই নি। নীহারিকা 'নীলা'—বলাকার পশ্চাদপটের উপর সুন্দরভাবে ফুটে রয়েছে। একটি নীল পদ্মের মধ্যে শাদা জরির কাজ,—। অধিকাংশ নক্ষত্রই বিকশিত। সদ্যবিকশিত নীল নক্ষত্রের ওড়না উড়ে যাচ্ছে মহাকাশে। নীহারিকা নীলার কাহিনী আমি অনেক শুনেছি—সদ্য প্রসূতি-আগার থেকে বেরিয়ে এসেছেন জননী। সদ্যজাত নক্ষত্রগুলিকে কোলে নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছেন তিনি। আপনারা জানেন এবং আমার মুখেও একাধিকবার শুনেছেন সদ্যজাত নক্ষত্রদের গাত্রবর্ণ নীল, গাঢ় নীল।

কিন্তু, যা বলছিলাম। বলাকার প্রতীক্ষা আমি দেখেছি; এবার দেখছি নীলার সার্থকতা। ওড়নার পাটে পাটে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শিশুদের বেঁধে নিয়ে জননী যাচ্ছেন—কোথায় ছায়ালোকের কোন্ পাড়ায় একটি আস্তানা পাওয়া যায়, তারই সন্ধানে।

এখানে শ্রোতাদের সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হওয়া, বোধহয়, প্রয়োজন। ব্যাপারটি আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি। তাঁরা হয়ত স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃই প্রশ্ন করবেন, বাপু হে, বলাকার সীমানা পার হওয়া বা, নীলার ওই আশ্রয় সন্ধানে যাত্রা, এ-দুটি ব্যাপারে তুমি সময়ের প্রশ্ন একেবারে চেপে গেলে কেন? আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি সময়ের কোন হিসেব এখানে নেই, থাকতে পারেনা। সময়কে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো খণ্ডিত করে নিয়েছি: আপন মেরুদণ্ডের ওপর পৃথিবীর আবর্তনকে আমরা দিন রাত্রিরূপে চিহ্নিত করেছি; সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকে আমরা বৎসর রূপে দাগ কেটে নিয়ে ষড়ঋতুর মধ্যে এনে ফেলেছি। আজ সে ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে,—কিন্তু, সময়-পরিমাপের একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি খুঁজে নিতে একদা শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রয়োজন হয়েছিল। এখানে সে দীর্ঘ ইতিহাসের উল্লেখ আমি করছিনা। আমি শুধু এ কথাটিই বলছি, এখানে সূর্য নেই,—। অতএব অপরার কোন সঠিক ঠিকানাও নেই। বর্ষ, ঋতু, মাস, দিনরাত্রি কিছুই নেই। সে মহাকালের প্রবাহে ডুবে-থাকা অস্তিত্ব মাত্র।

ভাবীকালে আন্তর্নক্ষত্রলোকে যখন আপনারা হামেশাই যাতায়াত করবেন, তখন অবশ্যই বেতার বার্তায় "কেয়ার অব সৌরমণ্ডল" উল্লেখ করতে হবে। নইলে, আপনি হংসমণ্ডলে চিঠি লিখলে তা চলে যেতে পারে, ধরুন, মকর মণ্ডলে। ভাবীকালের এই বার্তা বিনিময় সমস্যা

নিয়ে যখন আমি ভাবছি, তখনই উত্তর আকাশে আর একটি 'তারকাগুচ্ছ !

* * * *

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন পথ-রেখা ধরে অপরা এগোচ্ছে। কোন সীমাতীত রহস্যের তটভূমিকে নিশানা করে সে ছুটে চলেছে, তাও জানিনা। আর পৃথিবী ? সেখানে মাস বর্ষ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সহস্রাব্দের চিহ্ন লিপি অতিক্রম করে সে ছুটে চলেছে। যেতে যেতে আমাকে ডাকছে। আমি উন্মনা হয়ে উঠি, ফিরে তাকাই। কিন্তু কোথা থেকে যে ডাক আসছে, বুঝতে পারছিনা। সমস্তটাই প্রহেলিকা। অপরার বুকে অন্তহীন গোধূলির মতোই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

দাদুর সান্ধ্য ভ্রমণ

নিথর সমুদ্রের ধারে তেমনই দাঁড়িয়ে থেকে দেখছি, যেখানে একটু আগেও নীহারিকা নীলা ছিল, ঠিক সেখানে দশ হাজার লাল, নীল, পীতবর্ণের নক্ষত্র সঙ্গে নিয়ে একটি রক্ত বর্ণ নক্ষত্র বিপুল বেগে ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করছে। তাদের গন্তব্যস্থল ঠিক কোথায় বুঝতে পারলাম না। কিন্তু, মধ্যিখানের এই কটা লাল বর্ণের নক্ষত্র এবং তার চারদিকে নানা বর্ণের দশ হাজার নক্ষত্র দেখে বুঝলাম, মৃত্যু-পথযাত্রী দাদু এক গোষ্ঠী নাতি নাতনি নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হয়েছেন।

দাদুকে চিনে নিলাম এই সূত্র ধরে যে মুমূর্ষু অবস্থা ছাড়া নক্ষত্ররা এমন কটা রক্তবর্ণ ধারণ করে না। মৃত্যুর আগে তারা নিজেদের দেহটিকে যথাসম্ভব ছড়িয়ে দেয়।

তারকাগুচ্ছ, বা, এমন নক্ষত্রের ঝাঁক আমি আগেও দেখেছি

ধনুরাশি মণ্ডলে। কিন্তু, একই ঝাঁকে এমন বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ আগে দেখিনি।

দাদুর বিচিত্র জীবনের ইতিহাসটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দাদু ছিলেন নিঃসঙ্গ. মহাকাশে একাই তিনি ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু, কোটি কোটি বছর ধরে ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে তিনি এ সকল বিচিত্র সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছেন এবং যাকেই কাছে পেয়েছেন, ডেকে নিয়েছেন বয়সের বাছ-বিচার করেন নি। ওরাও খুশীমনে মৃত্যু পথযাত্রী দাদুর সঙ্গী হয়েছে।

দেখছি, আর ভাবছি, দাদু আর কদ্দিন বেঁচে থাকবেন? বাচ্চাদের নিয়ে এ ধরনের ঘোরাফেরা আর কতদিন চালাতে পারবেন তিনি? ভাল করে তাকালাম দাদুর দিকে। বুঝতে পারলাম. নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। তিনি কখনও স্ফীত কখনও সংকুচিত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ বুজবেন। এক কালের অতি শক্তিমান, দীপ্তিমান মহাপুরুষ সর্বপ্রকার তেজবীর্য হারিয়ে শ্বেতবামনরূপে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন।

সঙ্গে সঙ্গেই ওই পুত্র. পৌত্র. প্রপৌত্র ও অন্যান্যদের নিয়ে গড়ে তোলা সংসারটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। গৃহ বিবাদ ও অন্তর্বিপ্লবে মহাকাশের ওই "সুখী পরিবার"টি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবে। এর অনেক নজীর আমি দেখে এসেছি ধনুরাশিমণ্ডলে সেখানকার মহাজাগতিক 'যাদুঘরে'। বিধ্বস্ত নক্ষত্র পরিবারের অনেক সহায় সম্পদহীনকে সেখানে আমি ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।

এই সুখী পরিবারের বিধিলিপি কি তাই? জানি না। আমি দেখতে পাচ্ছি. ছায়াপথকে কেন্দ্র করে তারকাগুচ্ছ এখনও দূর-দূরান্তের দিকে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু, কোথায় যাচ্ছে তারা? কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলের দিকে? তারা যে এক মৃতুপথযাত্রীর সঙ্গ নিয়েছে, তা তারা বুঝতে পারছে না। খিল খিল করে হাসছে এখনও—।

তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। কতকাল যে কেটে গেল, বলতে পারব না।

মহাসর্পমণ্ডলের দিকে

নিথর সমুদ্রের ধারে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছি। কর্মহীন অলসতা ও ক্লান্তি। সৃষ্টির আগে বিধাতা যেমন ছিলেন তেমনই। নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত নির্ব্যক্তিক। পেছনে মহাশৃঙ্গ ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত যে নক্ষত্রলোকের মধ্য দিয়ে অপরা ছুটে চলেছে, একটির পর একটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে হাজির করছে, তার কিছু মাত্রও বুঝতে পারছে না এই পাষাণ স্তূপ। নিথর সমুদ্রের এক তটভূমি থেকে বিপরীত তটভূমির দিকে ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে অসংখ্য তোরণ। মহাশৃঙ্গ কি কোনদিন চোখ মেলে তা দেখেছে? অথবা, সে কি জানে একটি মানুষ, অথবা যাকে বলা যায় একটি জীবন-কণা, উড়ে এসেছে তারই পৃথিবীতে, যা ছিল অর্থহীন তার মধ্যে সে অর্থ খুঁজে পেয়েছে। সেই জীবন-কণা উপভোগ করছে মহাশৃঙ্গকেও। দূর থেকে দৃষ্টি দিয়ে লেহন করে পরিতৃপ্ত হচ্ছে এর কিছুই মহাশৃঙ্গ জানে না। অথবা, এমনও হতে পারে মহাশৃঙ্গই জানে। আমি জানি না। এমন কোন মিলন-বিন্দু আমি খুঁজে পাচ্ছি না যেখানে মহাশৃঙ্গের সঙ্গে আমার হৃদয়ের আদান-প্রদান হতে পারে।

মহাকাল, আমি এসেছি।

আমরা দুই ভাষাহীন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু, অপরা এখন কোন্ দিকে যাচ্ছে? মহাসর্পমণ্ডলের দিকে? ঠিক বুঝতে পারছি না। কোথায় গিয়ে কোন্ পথে সে বাঁক নেবে বুঝে উঠতে পারছি না। যদি সে মহাসর্পমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয় তবে

চমৎকার হবে। আমাদের ছায়াপথের প্রাচীনতম নক্ষত্রটি রয়েছেন ওই মণ্ডলে—পৃথিবীর সময়ের মাপে বিশ হাজার কোটি বছরের বৃদ্ধ। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বহু চেষ্টা করেছেন তাঁকে তাঁদের যান্ত্রিক চোখে ধরতে। অথবা, তিনি যদি তপস্বীই হয়ে থাকেন তবে তাঁর আশ্রম কুটিরের ছবি তুলতে। পারেন নি। আর, যদি তিনি অমিত বিত্তশালী মহারাজই হোন, তবে, তাঁরা বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ দিয়ে তাঁর পাদস্পর্শ করে যেতেও চেয়েছেন, পারেন নি পারেন নি এ জন্য যে অতিকায় বাষ্প মেঘের আড়ালে ওই দশ লক্ষ সূর্যসম প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছেন তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছুরিত এক্স রশ্মি গামা রশ্মি বা অন্যান্য বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ এতই প্রচণ্ড যে তারা বাষ্প মেঘের অন্তরায়কে ফাঁকি দিয়েই পৃথিবীর দিকে চলে যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে ষোল হাজার আলোক-বর্ষ দূরে মেঘান্তরালের ওই অতি বিরাট অস্তিত্ব ২০ হাজার কোটি বছর ধরে কীভাবে টিকে আছে, টিকে থাকতে পারে, তা ও এক বিরাট প্রহেলিকা। অপরা কি সেই অতি বৃদ্ধ নক্ষত্রের কাছে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে? প্রস্তুত হয়ে রইলাম। ওই মণ্ডলটি চোখে পড়া মাত্রই আমি চিৎকার করে উঠব, 'জেগে ওঠ মহাকাল, আমি এসেছি'। শ্রোতারা ভুল করবেন না যেন, এই ধারাবিবরণীতে যে অর্থে আমি মহাকাল শব্দটি ব্যবহার করে এসেছি, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে আমি ওই শব্দটি এখন ব্যবহার করছি।

কম করে ধরলেও দশটি আলোক-বর্ষ পুরু এক মেঘস্তূপের পাশ দিয়ে অপরা যাচ্ছে। সেই মেঘের প্রান্তিক সীমানায় আমি সেই গুহাবাসী মহাতপস্বীর আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়তে দেখছি।

অপরা যাচ্ছে, চিরকালের মতোই নির্বিকার, উদাসীন। দেখতে পাচ্ছি না মহাসূর্যকে—কিন্তু, মেঘান্তরালে তার উপস্থিতি আমি বেশ

উপলব্ধি করতে পারছি। আমি যাচ্ছি এক দীর্ঘ ইতিহাসের পাশ দিয়ে। মহাকাল যেদিন জন্ম নেয়, সেদিন ছায়াপথও সৃষ্টি হয়নি। অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে শুধু তিনিই জ্যোতিষ্মান। তাঁর চোখের সামনে যে বাষ্প মেঘ এসে ঘনীভূত হল, তা তাঁকে দেখতেই দিল না কিছু। যবনিকার এধারে সৃষ্টি হল সহস্র কোটি নক্ষত্র নিয়ে ছায়াপথ, সেই সহস্র কোটির প্রায় প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র জীবন, জীবনের বিবর্তন। এই যবনিকার আড়ালেই সৃষ্টি হল কত নীহারিকা, আলোড়িত বিক্ষুব্ধ মহাজগতের কোথাও কোথাও শুরু হল জীবন-লীলা। কিছুই দেখতে পেলেন না এই গুহাবাসী তপস্বী। বিশ হাজার কোটি বছরের অভিশপ্ত জীবনের নিদারুণ বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেলেন না মহাকাল।

তবুও মহাসর্পমণ্ডলের দিকে যাবার পথে যবনিকার এধার থেকেই শুধোলাম মহাতপস্বি, তুমি কি শুনেছ সূর্য মণ্ডলের কথা? শুনেছ তার জীবনের কথা? যদি শুনে থাকো, তবে আরও শোনো, আমি এসেছি সূর্য সাম্রাজ্যের জীবনলোক থেকে। সেখানকার পরিচয়লিপি নিয়ে আমি একদা গিয়েছিলাম ধ্রুবলোকে, মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রম দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম একদিন। অন্য দিনে আমি গিয়েছিলাম ব্যভিচারিণী স্বাতীর কাছে, মহাকাশে ভেসে চলা নীহারিকা বলাকার সঙ্গে সঙ্গে আমি কত নক্ষত্রলোক ভ্রমণ করেছি—। অভিশপ্ত বন্দী, একবার বেরিয়ে এসো ওই আবরণের অন্তরাল থেকে—'

কোন জবাব দিল না। দশ লক্ষ সূর্য সম প্রতিভা অতি বিরাট অতি শক্তিশালী নক্ষত্র কি কোন দিন দেখেছে মুক্ত বিহঙ্গন?

বাষ্পমেঘপুঞ্জের পাশ দিয়ে চলেছে অপরা। আমি মহাকালকে ঘুম থেকে জাগাবার নিস্ফল চেষ্টায় মরছি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই মেঘ-পুঞ্জের সবটাই তেজস্ক্রিয় কণিকা দিয়ে গড়া। মহাকালের দেহে যখনই ঘাটতি পড়ে তখনই সে ওই তেজস্ক্রিয় কণিকাগুলি টেনে নিয়ে সে আবার স্ফীতদেহ হয়ে ওঠে—মৃত্যু তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে

না। বিশ হাজার কোটি বছরের আয়ুষ্কাল লাভের মূলে রয়েছে এই কাহিনী।

দেখতে পেলাম না মহাকালকে। কিন্তু এই অতি বৃদ্ধের বন্ধন-দশা আমাকে নিদারুণ ভাবে পীড়িত করে তুলল। মহাসর্পমণ্ডলের প্রবেশের পথে এক বৃদ্ধ বন্দীর শেকলের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তিনি মহাতেজস্বী শক্তিমান। বশিষ্ঠ একদা আমাকে বলেছিলেন তাঁরাও আমাদেরই মতো মহাজগতের মহাশৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছেন। অথবা এই পথ দিয়ে না এলে ঋষিবাক্যের তাৎপর্য আমি বুঝতেই পারতাম না।

আমি এগিয়ে চলছি। অথবা, এ কথাও বলা যায় মহাকালের স্রোতে আমি ভেসে চলেছি। যেমন করে এই অন্তহীন নক্ষত্রমণ্ডলী ছায়াপথ নীহারিকা ভেসে চলেছে, ঠিক সে ভাবেই।

সামনে মহাসর্প। সর্পমণ্ডলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নক্ষত্রগুলি এমন ভাবে সেজে রয়েছে যে একাধিক আলোক-বর্ষে বিস্তৃত তার দেহটি আমি পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি। দুটি নীল নক্ষত্র, তাদের আয়ত চোখ দুটিতে তীব্র জ্বালা, ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ জিহ্বাটি মহাকাশের দিকে প্রসারিত—সর্বাঙ্গে ডোরাকাটা। কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের নক্ষত্র দিয়ে গড়ে ওঠা এই মহাসর্প ছায়াপথের সুদূর প্রান্তে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে রয়েছে। দূর থেকে মনে হল, গভীর ঘুমে অচেতন—। সর্প-সুন্দরী এক খণ্ড মায়ার মতো পড়ে আছে। দূর থেকে দেখে দেখে এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞানীরা সত্যই অদ্ভুত রকমের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন সর্প-সুন্দরীর। অতি দীর্ঘ পুচ্ছে আন্দোলিত হচ্ছে একটি ময়ূর-পাখা—নীল নীহারিকায় তৈরী।

অপরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এক স্খলিত বসনার শয্যাপার্শ্বের সন্তর্পিত অপ্রশস্ত এক অন্ধকার পথ দিয়ে। আমি মুগ্ধ হচ্ছি ওই

সর্পের মায়ায়—প্রশস্ত কটিবন্ধে নক্ষত্রের বলয়, নীহারিকার পুষ্পসজ্জা, এমন রূপ আমি কোথাও দেখিনি।

হঠাৎ বহু দূরে একটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণ। কিন্তু তখনও আমি ওই রূপের প্রস্রবণের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। মহাকাশের এ অঞ্চলে এ ধরনের বিস্ফোরণ প্রায়ই ঘটে। একটি তারা ভেঙে সহস্র তারার সৃষ্টি হয়, তারপর ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে আসে। মহাকাশ তার অন্তহীন নীরবতার মধ্যে আবার ডুবে যায়। বিস্ফোরণসম্ভাবনাপূর্ণ নক্ষত্রদের ভীড় এখানে, সে জন্যই বিস্ফোরণের জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একটি বিস্ফোরণ, মহাসর্পের কটিবন্ধনের নক্ষত্রগুলি বিদীর্ণ হয়ে গেল। নীল নীহারিকায় তৈরি পুচ্ছটিও বিস্ফোরিত হয়ে গেল—তবুও তাকিয়ে রইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র বা লক্ষ নীল ও সাদা নক্ষত্র আমার দিকে উড়ে আসতে শুরু করল, সর্প-সুন্দরীকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল দীর্ঘ কক্ষ পথে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল সুন্দরীর রূপসজ্জা; অনন্ত যৌবনাকে শত খণ্ড করে ছিটিয়ে দিল মহাকাশে নেই। সর্প সুন্দরী নেই। এক মুহূর্ত আগে যে ছিল বাস্তব অস্তিত্বে, তাকে আর কোথাও দেখছি না। পুচ্ছ নেই, চোখ নেই, সেই লোভনীয় কটিদেশে কৃষ্ণ শূন্যতা। এ কী হল? কী হচ্ছে? বুঝতেই পারলাম না। আমার সামনে, অতি দূরে এক নাক্ষত্রিক প্রলয়ের সাক্ষী আমি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, অতি দীর্ঘ কক্ষপথে যে সকল নক্ষত্র পরিক্রমা করে, তাদের আকস্মিক ভাবে এক বিন্দুতে মিলিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সেই মিলনবিন্দুতে তারা সকলে এক সঙ্গে এসে পৌঁছুলে অবিরাম বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। আর তার সঙ্গে যদি থাকে অতিকায় নব-তারা (Super Nova), তবে এই নাক্ষত্রিক প্রলয় হবে আরও ভয়ঙ্কর। আঁটো-সাঁটো করে বোনা জালের একটি সুতো ছিঁড়ে গেলে যা হয়, এটা তাই। সৌরমণ্ডলে কোনদিন

এটা ঘটেনি এবং ঘটবার সম্ভাবনাও নেই—কেন না, সে রয়েছে আমাদের মূল ছায়াপথের সভামণ্ডপ থেকে অনেক দূরে—ছায়াপথের কুণ্ডল বাহুরও প্রান্তিক এলাকায়। বাস্তবে কোনদিন তা ঘটে নি, কিন্তু Wells-এর গল্পে একদা তাই ঘটেছিল। সেই গল্প আমার বেতার শ্রোতারা নিশ্চয়ই পড়েছেন, বা, শুনেছেন।

লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম সর্প-সুন্দরীর দিকে—কিন্তু, নেই সে কোথাও নেই। কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল সে? তাকে কোথাও দেখছিনা। কিন্তু, তার জায়গায় সহস্র ক্ষুদ্র সর্প কিলবিল করছে,—। তারা একে অন্যকে জড়িয়ে রেখেছে, একের দেহ মাড়িয়ে অন্যটি অপর দিকে চলে যাচ্ছে। প্রত্যেকেরই মস্তকে একটি করে ক্ষুদ্র নক্ষত্র, প্রত্যেকেরই একটি শ্বেত বাষ্প-পুচ্ছ। মহাকাশের এ অঞ্চল জুড়ে তারা ছোটাছুটি করছে—অসংখ্য ক্রিমিকীট। বিজ্ঞানীরা বলছেন ওরা আদৌ ক্রিমিকীট নয়, ওরা বরং সৌন্দর্যের কণা। ওদের তিল তিল রূপ নিয়ে আবার গড়ে উঠবে তিলোত্তমা, তোমার সর্প-সুন্দরী। পারো যদি, দশ কোটি বছর পরে একদিন তা দেখে যেয়ো।

মহাসর্পমণ্ডল অতিক্রম করে যাচ্ছি, বার বার ফিরে তাকাচ্ছি সেদিকে যেখানে সর্প-সুন্দরী শুয়ে ছিল, কত কোটি বছরের রূপ সজ্জা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল হয়তো আমার জন্যই। কিন্তু, এখন সেখানে দেখছি সহস্র ক্রিমিকীট—দেখলে ঘৃণা হয়, মন বিমুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু, একথাটি আমি ভুলতে পারি না যে তারাই তাদের সবটুকু দিয়ে তিলোত্তমাকে সাজিয়ে তুলছে, হয়তো, আগামী দিনের অন্য কোন মানব অভিযাত্রীর সম্বর্ধনার প্রস্তুতি হিসাবেই।

মহাসর্পমণ্ডলের পেছনের দ্বার পথ দিয়ে অপরা গোপনে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই দ্বারপথে একটি নিউট্রন তারকা। বিকট পীতবর্ণের অস্তিত্ব—আপন দেহের ভারে চলচ্ছক্তিহীন। যাকেই সামনে পাচ্ছে, অভিকর্ষের টানে কাছে নিয়ে নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করছে।

সত্যি বলতে কি, এই বিপুল বিরাট নক্ষত্ররাজ্য একটি হিংসার রাজ্যও বটে। একটি নক্ষত্র অন্য নক্ষত্রকে গলাধঃকরণ করছে এতো এখানকার নিত্য ঘটনা। মহাকাশের অন্ধকূপের হত্যালীলার কি কোন তুলনা আছে? আমি নিজেই ত সেটা দেখেছি এবং সে অনুসারে আপনাদের বলেছিও—মহাকাশ জুড়ে এ ধরনের মৃত্যুকূপ যে কত রয়েছে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। সৌরমণ্ডল থেকে বহির্গমন পথে একটি মৃত নক্ষত্রের শীর্ণকঙ্কাল। সেই কঙ্কাল আবার অপরাকে জড়িয়ে না ধরে! ভয়ে কাঁপছি আমি।

অপরা ছুটে চলেছে তার গোপন অভিসারে। এমন নির্ভীকভাবে সে চলেছে, যেন আগাগোড়া পথটি তার জানা। এ পথে সে হয়ত আরও কতবার এসেছে! এসেও থাকতে পারে, আমার জানা নেই।

মহাকাশ থেকে এই যেতার ভাষণ শুনছেন বিপুল সমুদ্র তটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই ধরনের বেতার বাণী প্রচার করছি

জীবন তুমি কি সাড়া দেবে না?

সামনে বিরাট শূন্যতা, অন্ধকার যেন শীতল বাজ্য। কয়টি আলোক কণা যে ব্যাপ্ত রয়েছে, ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিনা—এই অন্ধকার সমুদ্রের বহু দূরবর্তী তটভূমিতে ক্ষীণ আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি। অপরা হয়তো সেটিকেই নিশানা করে সে দিকে ছুটে চলেছে। কিছু দেখারও নেই, বলারও নেই। এই শূন্যতা আর অন্ধকারে আমার মন, উপলব্ধি, সব কিছু ডুবে গিয়েছে। বাইরের এই অন্ধকার ও শীতলতা আমার অন্তরলোককেও সংক্রমিত করেছে। বাইরের ঘটনার প্রতিফলিত চিত্র পড়ছে আমার মনেও—সেখানেও একটি ক্ষীণ আলোক-রেখা। সেই আলোক রেখার অস্পষ্টতার মধ্যে কে যে কত আঁকিবুকি লিখছে, বুঝে উঠতে পারি না। পৃথিবীর সময়ের মাপে কত লক্ষ বছর পার হয়ে এসেছি, বহু আলোকবর্ষে-বিস্তৃত কত

নক্ষত্রমণ্ডল পার হয়ে এলাম। কত কোটি নক্ষত্রের সাম্রাজ্যের পাশ দিয়ে যেখানে চলে এসেছি—সর্বজ্ঞের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কও তার হিসাব রাখতে পারেনি। আমি দেখেছি, সে এক এক সময় ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে; এই দুঃসাধ্য শ্রম থেকে মুক্তি চায়। তার চোখের ভাষা পড়ে আমার মন সহানুভূতিতে ভরে যায়। কিন্তু, তার এই ক্লান্তির, অনিচ্ছার আর একটি হেতুও আমি অনুমান করতে পারছি। প্রতিটি নক্ষত্রের গ্রহ আছে এবং সে সকল গ্রহে জীবন আছে, এটা ধরে নিয়ে তাকে অবিরাম বেতার সংকেত পাঠাতে হচ্ছে, রেডার দিয়ে অদৃশ্য গ্রহের গাত্রচর্ম পরীক্ষা করতে হচ্ছে—। প্রতিটি বার্তা পাঠিয়ে প্রত্যাশিত জবাবের প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে,—রকেটের প্রতিটি যন্ত্রকে নির্দেশ ও পরামর্শ দিতে হচ্ছে,—। দূরের ও কাছের প্রতিটি নক্ষত্রের খোঁজ নিতে হচ্ছে—তা ছাড়া, অপরা কখন কোন্ দিকে চলে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। যদি এ ব্যাপারে তার, বা আমার বিন্দুমাত্র করণীয় নেই, তথাপি সর্বজ্ঞকে তার মস্তিষ্কে ওই যাত্রা পথের নকশা এঁকে রাখতে হচ্ছে। একটি নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়ে সহস্র নক্ষত্রের সৃষ্টি হল, সদ্যজাত নক্ষত্রের বংশলিপিও তাকেই রচনা করতে হচ্ছে। এই বিরাট কর্মকাণ্ডের ক্লান্তি সে অনায়াসেই মুছে ফেলতে পারত, যদি সে একটি পুরস্কার পেত। যদি সে খুঁজে পেত এই বিপুলতা বিশালতার মধ্যে জীবনের ক্ষীণতম অস্তিত্বও। আমি জানি, প্রতিটি বেতারেও ইনফ্রা-রেড তরঙ্গের দিকে সে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বারবার নিরাশ হয়েও সে আশা করে থাকে, এই বুঝি জীবনের সন্ধান পাওয়া গেল। একদিক থেকে ওই যন্ত্র আর আমি এক হয়ে গিয়েছি। এই বিরাট অন্ধকারের সাম্রাজ্যের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাদের দুই-য়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই। সীমাহীন ক্লান্তির মেঘছায়ার নীচে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমরা এক, শুধু এক।

বেতার তরঙ্গ প্রতি-মুহূর্তে অদৃশ্য গ্রহ-গাত্রে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে, কিন্তু, একবারও বলছে না, 'খুঁজে পেয়েছি'— । অবশ্য সেটা তার বলার কথাও নেই। কিন্তু তার নির্দেশ শুনেই ছুটে যাচ্ছে মহাজাগতিক বেতার-তরঙ্গ, যত ক্ষুদ্রও বৃহৎ দৈর্ঘ্যের কম্পন সম্ভবপর সব কিছু লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বেতার-আধার দরিদ্র ভিখারীর মতো একটি সংকেতের আশায় মহাকাশের প্রতিটি দোরে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। বলছে, 'শোন, অপরিচিত গ্রহবাসী জীবন-সত্তা, আমি এসেছি আর এক সূর্যলোকের গ্রহ থেকে, যার নাম পৃথিবী'। কেউ সাড়া দিল না। তবে কি, সাড়া দেবার মতো কেউ ছিলনা, কেউ নেই? কেউ কোনদিন থাকবে না? ব্রহ্মাণ্ডে আমরাই এক নিঃসঙ্গ জীবন-অস্তিত্ব? অন্তহীন শান্তি ও প্রশান্তির মধ্যে এক হৃদয়ভেদী হাহাকার? এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না। তথাপি, প্রশ্ন করে যাচ্ছি ছায়াপথকে, সহস্র কোটি নক্ষত্রকে। এমনও হতে পারে, প্রশ্নটিই আসল; জবাব—যাই হোক,—অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। অথচ, এই প্রশ্নটি চিরকাল করে এসেছি, নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত মানবাত্মা চিরকাল অন্যত্র, অন্য জগতে, নক্ষত্রলোকে, ছায়াপথে সভ্যতার আদিকাল থেকে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। পায় নি আমিও পেলাম না। অথবা, এমনও হতে পারে কাচ বা স্তু অস্তিত্বেই ে বা রয়েছেন, রয়েছেন নিজ নিজ পৃথিবীর বন্দীশালায়। আমি শুধু ৈর থেকে বন্দীশালাটিই দেখছি কিন্তু, গারাদের ওধারে যাঁরা রয়েছেন, পরিতৃপ্ত ও সুখী অন্য জীবনসত্তায় তাদের কোন প্রয়োজনই নেই আমার স্বীকৃতি লাভের।

হয়তো, বেতার-তরঙ্গ দিয়ে এমন বহু পৃথিবী আমি ছুঁয়ে এসেছি যেখানে বেতার-তরঙ্গ কোন অর্থই বহন করে না। সভ্যতার সমুন্নত শিখরে উঠেও তারা এই প্রযুক্তি-বিদ্যার ওপর আদৌ নির্ভরশীল নয় হয়তো সে এমন এক জীবন-সত্ত যার বিবর্তন-বিকাশের সঙ্গে আমার

কিছু মাত্র সম্পর্ক নেই। আমি যে পথ ধরে এসেছি, বিবর্তনের কেবলমাত্র সে পথটিই আমার জানা আছে। এর বাইরে আমি পা' ফেলতে পারি না,—এমন কি, কল্পনায়ও না। সেদিক থেকেও আমি এক কঠোরশাসন বন্দীশালায় বন্দী। আমার কল্পনা গড়ে উঠেছে ওই বন্দীশালার প্রাচীরের নকশা অনুযায়ী। তাকে ভর করেই। বিবর্তনের, সেটা প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই হোক, বা, মানসিকতার ক্ষেত্রেই হোক,—সহস্র কোটি পথ থাকতে পারে। তার কোন একটিকে ধরে পৃথিবী ও পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী এগিয়ে এসেছে বলে একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না, ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় ওই একটি মাত্র পথই স্থান পেয়েছে। কিন্তু, সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও পাঁচ হাজার, এমনকি, পাঁচ শত বছর আগেও যদি কেউ এই পৃথিবী তাক করে বেতার-সংকেত পাঠাত, তবে কি আমরা তার তাৎপর্য বুঝতে পারতাম? অথবা পাঁচ হাজার বছর পরেও কি আমরা এই বেতার-লিপিরই ওপর নির্ভরশীল থাকব?

এই বেতার বার্তা যাচ্ছে 'অপরা' পৃথিবীর নিথর সমুদ্রতট থেকে। সমুদ্রতটের তোরণে তোরণে অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ কাজের রাসি রেখা। তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ঝালরের নিচে পা বিছিয়ে বসে আছি আমি। অপরা এখন গ্রহ সর্পমণ্ডল পেরিয়ে এক অতি বিস্তৃত অন্ধকারের পাহাড়ের উপত্যকার সংকীর্ণ পথ ধরে চলেছে। কিন্তু যা বলছিলাম। কত নিদ্রিত পৃথিবীর চিত্তে সাড়া জাগাবার চেষ্টা করল সর্বজ্ঞ। পারল না, কোনদিন পারবে না। সে সকল পৃথিবীতে হয়তো দানব—আমার বিচারে ও উপলব্ধিতে যাকে দানব বলেই মনে হবে—ঘুমিয়ে আছে। হয়তো বা পীপীলিকা—সেও আমারই বিচারে। হয়তো তাদের কোন কাজই করতে হয় না—অতিকায় যন্ত্র, অমিত শক্তিধর যান্ত্রিক প্রতিভা তার সব কাজ করে দিচ্ছে, বিরাট ইলেকট্রনিক যন্ত্র দিয়ে হয়তো সে তার পৃথিবী শাসন

করছে—কিন্তু, তবুও সে শৃঙ্খলিত এক অসহায় জীবসত্তা। শুধু নিজেকেই চেনে এবং চেনে নিজের পরিবেশকে। সেই বন্দী এক একবার জেগে ওঠে, অনন্ত আকাশের দিকে তাকায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অনন্ত আকাশে তারই মতো আর এক জীবনের কল্পনা করে সে আনন্দ পায়। তার নিঃসঙ্গতার সমব্যথী অন্য এক জীবনের দিকে নিজের অজ্ঞাতেই তার যান্ত্রিক হাতটি বাড়িয়ে দেয়। আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সে ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। সে বন্দীকে জাগাবার কত চেষ্টা করলাম। কিন্তু, তার পৃথিবী তাকে ঘুমিয়ে রাখল।

অর্থহীন চিন্তা, অন্তহীন জিজ্ঞাসা। সেখানে সর্বজ্ঞ একলা রয়েছে।

'পিগমির' রাজ্যে

অন্ধকার সমুদ্রের তটভূমিতে এখন আলোর রেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সমুদ্র-বন্দর তার দ্বারপথে আলো জ্বেলে স্বাগত জানাল অপরাকে। কিন্তু সহজ পথ, বা আলোকিত জগৎ অপরার জন্য নয়। এখানের পথে সে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষীরা তাকে এখনই বন্দী করে ফেলবে, গ্রহরাজের আবর্তনে বাধ্য করবে। তাকে ওই রাজ্যে ঢুকতে হবে সংকীর্ণ খাঁড়ির পথ ধরে, নদীর পথে নয়, নালার পথে। পেছনে পড়ে রইল সর্পসুন্দরীর স্বপ্নরাজ্য, বিধ্বস্ত, শতখণ্ড বিপর্য এক মহা সৌন্দর্য—। আরও পেছনে কৃষ্ণ-মেঘের উপত্যকায় বন্দী প্রাচীনতম নক্ষত্ররাজ,—তার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী। অপরা অন্ধকারের সমুদ্র অতিক্রম করে এসেছে।

সর্বজ্ঞের দিকে তাকিয়ে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম—তার চোখে এক অদ্ভুত ধরনের চাঞ্চল্য যা আগে লক্ষ্য করিনি। বুঝলাম, সে একটি বিপদের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে—কিন্তু, বিপদটি যে কি ধরনের হতে পারে আঁচ করে উঠতে পারলাম না। উঠলাম, তার দেহের

প্রতিটি যন্ত্রপাতি যাচাই করে দেখলাম, মস্তিষ্কে অবিরাম ঘূর্ণায়মান 'টেপ'গুলি পরীক্ষা করলাম, ব্যাটারির সেলগুলি খুলে দেখলাম। না কোথাও বৈকল্য খুঁজে পেলাম না।

সামনে এক পিগমি এলাকা। নাক্ষত্রিক মানচিত্রে এর উল্লেখ নেই। তিনটি থেকে পাঁচটি আলোক বর্ষ স্থান জুড়ে 'পিগমিরা' এলোমেলো ছোটাছুটি করছে—যে যেদিকে পারে ছুটে যাচ্ছে, হয়তো আবার ঘুরে আসছে। অপরাকে বেষ্টন করে তাদের এ এক বিচিত্র খেলা। আপনারা বলতে পারেন, নাক্ষত্রিক জোনাকিপোকার ভিড়। 'পিগমি' তাদেরই বলে যাদের আয়তন সূর্যের দশমাংশের ও কম, ঔজ্জ্বল্যও তেমনই আনুপাতিক হারে কমে যাবে। ওরা—সংখ্যায় প্রায় কয়েক লক্ষ হবে, অপরাকে ছেঁকে ধরল,—এর মধ্য দিয়ে অপরা যে কি করে ছুটছে বুঝতে পারছি না। সংকীর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ পথটি যে কোন্ দিক দিয়ে গিয়েছে, কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিনা। তথাপি, অপরা এমন ভাবে ছুটছে যে, মনে হয়, পথটি তার অপরিচিত নয়। বা, এমন একটি অবস্থা যা মোটেই তার অপ্রত্যাশিত নয় এক একবার সত্যিই সে বিভ্রান্ত, দিশাহারা হয়ে উঠছে। হাজার বা লক্ষ জোনাকির ক্রীড়াবনে আগন্তুক এই বিচিত্ররূপিনীকে নিয়ে আমি কি করি? কি করতে পারি?

সর্বজ্ঞেরও সেই অবস্থা। তার চোখ দুটিতে স্পষ্টতঃ উদ্বেগের ছায়া। আমরা একে অন্যের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকি, বিপন্ন বিপর্যস্ত নাবিক, সেও তার যন্ত্রেরই মতো অসহায়। বুঝতে পারছি কিছুই করার নেই আমাদের।

দ্বীপ উপদ্বীপ, খাঁড়ি খাল ও নালার এই বাড়োর পথে চলতে গিয়ে যদি অপরা একটু অসতর্ক হয়ে ওঠে, কারো সঙ্গে ঠোকর লাগিয়ে দেয় তবে সে চূর্ণ হয়ে যাবে, অথবা, অন্য নক্ষত্রের দেহে মিশে যাবে, অথবা, এমনও হতে পারে, কোন একটি 'পিগমি' অপরাকে বেঁধে নিয়েই চলে

যাবে। দেখছি, অপরা একটি সংকীর্ণ গলি পথ ধরে ঢুকছে। সেই প্রণালী পথের প্রান্ত শেষে, আমি দেখতে পাচ্ছি, দুটি পিগমি ওৎ পেতে বসে আছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম, অপরা, ওদিকে নয় ওদিকে নয়, ওরা দুটি ওদিকে বসে আছে।

অপরা শুনল কি না, বুঝল কি না, জানিনা, কিন্তু দেখলাম, অপরা সঙ্গে সঙ্গেই পথ পালটে নিয়েছে। কিন্তু হলেই বা কি? পেছন থেকে এক ঝাঁক নক্ষত্র ছুটে এসে একেবারে সামনে ঘুর-পাক খেতে লাগল। আমি লক্ষ্য করছি, নক্ষত্রদের চৌম্বক ক্ষেত্রটি যন্ত্রের দেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে—এমনকি, সর্বজ্ঞের মস্তিষ্কটিও বাদ পড়ছে না।

চিৎকার করে উঠলাম। রকেটের এ পাশ থেকে ওপাশে ছুটে গেলাম। জোনাকিগুলিকে ধমকে তাড়িয়ে দিতে গেলাম। পারলাম না। কতগুলি উচ্ছৃঙ্খল অপরিচিত শিশুর ভীড়ের মধ্যে অপরা এল কেন? সর্বজ্ঞের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, ধমক দিয়ে তার কাছে পরামর্শ চাই। বিপদের মুখে তার যান্ত্রিক অকর্মণ্যতা দেখে তার মুখের ওপর কটূক্তি ছুঁড়ে দিই। মুহূর্তের মধ্যে রকেটের সামনের দিকে এসে ভাল করে তাকিয়ে সুদক্ষ নাবিকের মতো অপরাকে পথ চলার নির্দেশ দিইঃ একটু বাম পাশ ধরে চট্ করে পালিয়ে যাও। তাকিও না কোনদিকে।

কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তেই আর এক ঝাঁক নক্ষত্রজোনা গা ঘেঁসে উড়ে গেল। চিৎকার করে উঠিঃ বাম পাশে, বাম পাশ ধরে চলো, একটু সতর্ক ভাবে, চারদিকে চোখ রেখে।

আসলে পিগমিরা খেলা করছে না, নিজেদের খেয়ালখুশীমতো ছুটেও বেড়াচ্ছে না। তাদের কক্ষপথগুলি এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে তারা নিজেরাও সমভাবে বিপন্ন। অনড়, জ্যামিতিক সূত্রে তারা বাঁধা, নিজ নিজ কক্ষপথে বন্দী।

কিন্তু তাদের কাণ্ড কারখানা দেখে, উরে উঠছি। এক উত্তাল

মহাসমুদ্র, জাহাজখানা ওলট-পালট খাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না।

চিৎকার করে উঠি। ভয়ে এক একবার সর্বজ্ঞকে জড়িয়ে ধরি। কখনও টেলিসকোপটি নিয়ে ওই পিগমি এলাকার সীমানার সন্ধান করি: আবার পর মুহূর্তেই রকেট থেকে গলা বার করে চিৎকার করে অপরাকে পরামর্শ দিই, হয়তো বা, গম্ভীর চালে এই লাগাম-ছাড়া গতিবেগের সঠিক গাণিতিক হিসাবটি খুঁজে বের করার তাগিদে মাথা খুঁড়ে মরছি। সর্বজ্ঞের পায়ে লুটিয়ে পড়ছি এক একবার। কি যে করব, বুঝে উঠতে পারছি না। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে নাক্ষত্রিক জোনাকি পোকা; রকেটের কাচের জানালার ওপর ঘা মারবে নাকি? ছুটে যাই সেদিকে; অহেতুক Cyclotron যন্ত্রটির অতিকায় চুম্বকটিকে তিরস্কার করি। Spectroscope-টিকে মাথার উপরে তুলে ধরে শাসাতে থাকি।

সদা-তৎপর কর্তব্যনিষ্ঠ বন্ধু সবজ্ঞ মশাইয়ের চোখে এক নিদারুণ শঙ্কা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিটি নক্ষত্রের দিকেই সে নজর রাখছে, লক্ষ বা কোটি নক্ষত্রের পাতার পর পাতা ইতিহাস লিখে রাখছে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে।

ওই যে লক্ষ নক্ষত্র ধাওয়া করছে পেছন থেকে, লক্ষ নক্ষত্র আসছে সামনে থেকে, অপরাকে বেষ্টন করে ঘুরপাক খাচ্ছে, সব তার মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য রাখছে Encephelograph-এর উপরেও। আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুর ওপর যে অসম্ভব চাপ পড়ছে, তা লিখে রেখেছে সে টেলিভিসনের পর্দায়; তরঙ্গায়িত রেখা-লিপিতে। graph-টির দিকে তাকাচ্ছি একবার, আর একবার সর্বজ্ঞের দিকে। অনিশ্চিত রেখালিপি। graph-টি একবার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে গিয়েছে, আবার কেঁপে কেঁপে নেমে গিয়েছে অতি নিচে; আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুকম্পনের ইতিহাস লেখা হয়ে আছে ওই পর্দার ওপর।

লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র অপরাকে ঘিরে ফেলেছে। আশঙ্কা হয়, আর এগোতে দেবে না। আমি যাব; এই বিপদ ঠেকাব; জোনাকিগুলিকে দুহাতে তাড়িয়ে দেব। ঝড়ের মুখে আমি এমন নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য হয়ে থাকতে পারব না।

কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় আবার সেই তরঙ্গায়িত রেখাচিত্র, "নিউরনের" ওপর অনিশ্চিত আঘাতের চিহ্ন, আমার মস্তিষ্কের অবস্থা-বিবরণ লেখা রয়েছে টেলিভিশনের পর্দার ওপরে। সর্বজ্ঞ আমার অবস্থাটি বুঝে নিল এবং আমার মস্তিষ্ক যে এই ধকল সহ্য করতে পারছে না, সেটা সে ধরে ফেলল। আমি আত্মসমর্পণ করলাম সর্বজ্ঞের কাছে, "all purpose tablet"-এর জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। 'অপরা' তখনও সেই নাক্ষত্রিক ঝঞ্ঝা সাগরে ক্রমাগত ওলট-পালট হচ্ছে, পথ খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বয়ং নিযুক্ত পোতাধ্যক্ষ বিশ্রাম নিতে গেলেন। আসলে প্রচলিত অর্থে বিশ্রাম নেওয়া যাকে বলে, তা নয়। এ একটি স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকা এবং ডুবে থেকেই স্নায়ুগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা। এ এমন একটি স্বপ্ন যা সে বহুদিন দেখছে—যে স্বপ্নের ভূমিকায় বা কাহিনীতে সে নেই। এ আর এক ভ্রমণ কাহিনী, বিপরীত দিকে এর পদক্ষেপ, একদা যেখানে সে ছিল সেখানেই ফিরে যাওয়া। আমি কি যাচ্ছি পুরাতন ইতিহাসের দিকে, পেছনের দিকে আমার এই পথ পরিক্রমা। লক্ষ বা কোটি বছর আগে যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেখানেই আমি যাচ্ছি।

"হে মহাকাল, খোল তব স্বর্ণদ্বার"

—কোথায় যাচ্ছ, হে পথিক ?

—কোথায় যাচ্ছি জানি না, তবে মহাদেশ-মহাদেশে বিস্তৃত ওই পথে এগোব বলে বেরিয়েছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ওই পথে

আমি পরিক্রমা করেছি। আজ আবার কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করতে পেরেছি বলে বেরিয়ে পড়লাম।

—বল, তোমার কাহিনী।

—শোন তবে, বলছি। একটি পিনের খোঁচায় আঙ্গুলের ডগা থেকে বেরিয়ে এল এক ফোঁটা রক্ত। অন্য কথায়, হিমোগ্লোবিন। ওই এক ফোঁটা রক্তের পেছনে আমি ছুটে চলেছি—পিতার পিতা তস্য পিতা, তস্য তস্য পিতাকে ধরে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব বলেই এ পথ বেছে নিতে হল। এই রক্তের ফোঁটা বলে দিচ্ছে, সমুদ্রের জলে লবণের ভাগ যতটা ঠিক ততটাই রয়েছে ওই রক্তে। অতএব, একদা তুমি সমুদ্রের অধিবাসী ছিলে। সেই পরিচয়কে তুমি অস্বীকার করতে পার না। এগিয়ে চলি। গন্তব্যস্থল অস্পষ্ট, প্রকৃতি নিপুণ হাতে প্রায় সব কিছুই মুছে ফেলেছে। অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। পাঁচ থেকে দশ হাজার বছর আগে শিবালিক (আধুনিক হিমালয়) পর্বতের দিকে চোখ রেখে খাইবার গিরিপথ দিয়ে যাঁরা আসছেন, তাঁদের আমি চিনি। ওই হিমোগ্লোবিন বা প্রোটিন কণিকা বলছে, আমি একদা ওদের দেহে ছিলাম। ওরা আমার পূর্ব পুরুষ। এগিয়ে যাচ্ছি। পামির উপত্যকার পাশ দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতকে একপাশে রেখে চলে গেলাম ইরানে। ইন্দো-ইরানীয় সভ্যতার পীঠভূমি।

লোহিত সাগর ও মরুসাগরের পথ দিয়ে আমি চলেছি তো চলেছি। আরও পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের তটভূমিতে পঁচিশ হাজার বছর আগে একদিন ওখানেই আদি নারী প্রথম শস্য সংগ্রহ করেছিলেন। সে শস্য তিনি বপন করেন নি। প্রকৃতিই সেখানে শস্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। শিকারীর জীবন থেকে চাষীর জীবন। পর্বতগুহায় নগ্নগাত্র শীতার্ত মানব-মানবী। দেহের স্পর্শে প্রথম উষ্ণতা। পৃথিবীর প্রথম প্রেমিক-প্রেমিকাকে কি দেখেছিলাম এখানেই?

কিন্তু, আমি আরও পেছনে চলে যেতে চাই। হিমোগ্লোবিনের সন্ধান করতে করতে আমি চলে যেতে চাই পৃথিবীর আদি সমুদ্রের তটভূমিতে। সে সমুদ্র হয়তো আজ নেই।

অজানা অচেনা পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম আফ্রিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি কঙ্কাল খুঁজে পেলাম। তেজস্ক্রিয় পটেশিয়াম-আরগন পদ্ধতি দিয়ে তার বয়স বিচার করলাম। দশ লক্ষ বছর। নররূপী বানর। আমাদেরই পূর্বপুরুষ, বেশ খাড়া হয়ে হাঁটতে পারত। কিন্তু ওর মস্তিষ্কে পদার্থ থাকা সত্ত্বেও কেন সে অরণ্যে অরণ্যে, নিভৃত সমুদ্র তটে আধা-মানুষ আধা-বানরের জীবন যাপন করল?

চলেছি আরও পেছনের দিকে। কেনিয়ার রুড্‌লফ হ্রদের ধারে আর এক জনের সাক্ষাৎ মিলে গেল (লণ্ডন টাইমস, নবেম্বর, ৭২ সাল)—বয়স ২৫ লক্ষ বছর। সেই কপি মানব। মস্তিষ্কের পদার্থ ভাল পরিমাণেই ছিল, কিন্তু মানুষ হতে পারল না। তাকে প্রশ্ন করলাম: আদি হিমোগ্লোবিনের কোন সন্ধান তোমার জানা আছে কি?

নির্বিকার ঔদাসীন্যে সে বলল: আরও পেছনের দিকে চলে যাও। ভাবলাম, আহা! ও যদি আমাকে তার পিটুইটারী গ্ল্যানডের কিছুটা খবর দিতে পারত? অথবা, যদি ওই কঙ্কালস্তূপের মধ্যে 'প্রথমা'কে পেতাম, তবে তার পেট চিরে জরায়ুর প্রাচীর তল্লাসী ক' আমি দেখতে পারতাম আমার মস্তিষ্কের সম্ভাবনাকে সে সেদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল। আপন সন্তানের সঙ্গে যৌনবিলাস-প্রমত্তা ওই ব্যভিচারিণী আদি জননীর প্রতিটি রক্তবিন্দুতেই কি আমার জীবন-ইতিহাসের সংকেত লেখা ছিল না?

আবার চলে এলাম কাস্পিয়ান সাগরের তটভূমিতে। কৃষ্ণসাগরে ডুবে থাকা আদিম উপনিবেশের কথা শুনে চমকে উঠলাম। কিন্তু, কোন পদচিহ্ন কোথাও নেই। একটি কঙ্কালও না। কাস্পিয়ান

সাগর থেকে ওই পথ কি চলে গিয়েছে উত্তর মেরুর দিকে? অথবা জারমানি ও হাঙ্গেরীর পথ দিয়ে মধ্য এশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলের দিকে? কেউ বলতে পারে না। অথবা সাইবেরিয়া ও মেরু অঞ্চলের অনন্ত তুষার রাজ্যেব হিমবাহেব নিচে আট কোটি বছর আগে আদিম ম্যামথের সঙ্গে সঙ্গে আমিও চলে গিয়েছিলাম উত্তর আমেরিকাব দিকে বেরিং প্রণালী পার হয়ে? ৮০ থেকে ১৫০ ফুট দীর্ঘ সরীসৃপ অথবা নিচের আকাশে উড়ে চলা দানবীয় পাখির দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে আমিও কি তাকিয়ে রয়েছিলাম? অর্থহীন দৃষ্টি—কেন না মস্তিষ্কে সেদিনও আমার ভয় বা সাহসের স্নায়ুগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।

চলে যাচ্ছি আরও পেছনের দিকে। কত লক্ষ বছর ব্যাপী বর্ষণেব ফলে সমুদ্রেব সৃষ্টি হল। পৃথিবী সেদিন আব আগুনের পিণ্ড নয়। আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ, প্রতি মুহূর্তে কক্ষ থেকে কক্ষান্তবে উৎক্ষিপ্ত পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ কবে জেগে উঠল পর্বত। এ্যানডিস, আল্পস বা অধুনালুপ্ত কোন মেরুগিরি-শিখরে বসে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। আড়াই শত কোটি বছর আগে সমুদ্রের ধারে সেদিন প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি হচ্ছে। আমাব জীবনেব আদি কণিকা। Haldane যাকে বলেছেন primordial broth; আদি সামুদ্রিক রাসায়নিক সালসা হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, জল, লবণ, আয়োডিন ও আব কত কিছুব ওপব আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিপাতে সৃষ্টি হল এ্যামিনো-এসিড। প্রকৃতি এ্যামিনো-এসিড নিয়ে খেলা শুরু করল। কতবকমের যোগ বিয়োগ খেলার মধ্যেই একদা সৃষ্টি হয়ে গেল আদি জীব-কোষ। তরঙ্গ-ঘাতে উঠে এলাম কর্দমাক্ত তটভূমিতে। তরঙ্গের টানে আবার চলে গেলাম পুরাতন মাতৃগর্ভে। আবাব উঠে এলাম মহীসোপান ধরে—সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপকূল ভাগ পর্যন্ত উঠে এসেছে যে সোপান-শ্রেণী তাকে আঁকড়ে ধরেই উঠে এলাম। নিয়ে এলাম সমুদ্র জল থেকে হিমোগ্লোবিন কুড়িয়ে—প্রতিটি জীব দেহের অভ্যন্তরে আজও

একটি করে সমুদ্র। প্রতিটি কোষের মধ্যে সমুদ্র—সেই সমুদ্রে আজও এ্যামিনো-এসিডের তরঙ্গ খেলে যায়। কত শত কোটি বছর আগে সমুদ্র-বাস ছেড়ে চলে এসেছি—জলভাগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে স্থল জীবনের উপযোগী করে তৈরি করেছি কিডনি, তৈরি করেছি ফুসফুস, তৈরি করে নিয়েছি পিটুইটারি, কিন্তু সমুদ্রকে ভাগাভাগি করে দিয়েছি সকলের মধ্যে, কত সহস্র কোটি জীবন-কোষের মধ্যে। এমন কি, একটিকেও বঞ্চিত করিনি।

এবার এসো, তাকাই মহাকাশের দিকে। সেখানকার অনন্ত বিস্তারিত গ্যাসপুঞ্জের মধ্যে জীবন-সৃষ্টির মূল উপাদান এ্যামিনো-এসিডের প্রতিটি পদার্থই খুঁজে পাওয়া গেল।

অতএব আমার সূতিকাগার ছিল কি মহাকাশেই? সেখানেই কি প্রকৃতির আদি পরীক্ষাগার? আমার জীবন নিয়ে প্রকৃতির খেলা কি শুরু হয়েছিল ওই ছায়ালোকে, সূর্যমণ্ডল থেকে বহুদূরে অপার শূন্যতার ওধারে আর এক দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ডে? একটি কণারূপে কি আমি ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি? একটি এ্যামিনো-এসিডের কণারূপে কি আমি ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর ইতিহাসের একটি কাহিনী নই?

মহাকালের চিহ্নিত পথ ধরে এগিয়ে চলছি আমি। লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরে জল ও এ্যামোনিয়ার আদি মৌল অণু। কী তার পরিচয়? দেখছি একটি মাত্র মৌল কণিকা হাইড্রোজেন। আর কিছু নেই। তিন শত কোটি বছরের জীবন ইতিহাসের শুরুতে একটি বিন্দু।

আবার বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছি, হাইড্রোজেন নেই সে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে হিলিয়ামে। হিলিয়াম পরিবর্তিত হয়েছে বেরিলিয়াম-এ। বেরিলিয়াম পরিবর্তিত হচ্ছে কারবন-এ। কারবন রূপ পেল অকসিজেনে। এক মৌল থেকে অন্য মৌল—এ্যামিনো-এসিডের বিচিত্র খেলার শুরুতে আর এক খেলা।

অতএব সূক্ষ্মতম ও দূরতম অস্তিত্বে একদা আমি ছিলাম মহাকাশে, ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর লোকে। কণা কণা হয়ে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি জ্যোতিঃ পুঞ্জে। একদিন হয়ত গিয়েছিলাম জ্যোতির্লোকে, স্বাতী যেখানে নির্বাসিতা। ধ্রুবলোকে মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রম-প্রাঙ্গণে আশীর্বাদ প্রার্থী হয়ে নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলাম। কালপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন আমি পৃথিবীর জীবন-বার্তা শুনে এসেছি।

ভুলোর বস্তা ছুঁড়ে মারছে কারা ?

স্বপ্ন ভেঙে গেল, আমি জেগে উঠলাম। সম্পূর্ণ সুস্থ, ক্লান্তিও মুছে গিয়েছে। আমি যেন আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছি। পিগমি, অঞ্চলেব নাক্ষত্রিক ঝঞ্ঝা কেটে গিয়েছে,—এমন কি তার প্রচণ্ডতার স্মৃতি মুছে গিয়েছে। সামনে উন্মুক্ত কৃষ্ণ-সমুদ্র, অপরা খেলা করতে করতে এগিয়ে যেতে পারে, কারো সঙ্গে ঠোকর লাগার কোন আশঙ্কাই নেই। কৃষ্ণ-সমুদ্রে অতি দূরে দূরে রয়েছে এক একটি নক্ষত্র অথবা, বলা যায়, সমুদ্রের বাতি-ঘর। নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় আমরা দুইজন সেই দৃশ্য উপভোগ করে চলেছি। এখানে পিগমি নেই, মহারাজ নক্ষত্রও নেই, সন্তান সম্ভবা কোন মেঘলোকও সামনে দেখতে পাচ্ছি না। বিস্ফোরণশীল বা স্পন্দনশীল অথবা সদ্যোজাত নীল নক্ষত্র কিছুই নেই। শূন্যতা, সীমাহীন শূন্যতা। সেই শূন্যতার সমুদ্রে প্রতি ঘন মিটার স্থানে দুটি বা চারটি হাইড্রোজেন হিলিয়াম কণিকা। সঠিক সংখ্যা সর্বজ্ঞ বলতে পারে—তার ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কে তার হিসাব রয়েছে।

সামনে কত আলোকবর্ষ জুড়ে শূন্যতা ; কিছু দেখারও নেই, কিছু বলারও নেই. আমরা শুধু পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারি। কিন্তু সর্বজ্ঞের ঠোঁটের কোণে মজার হাসি। এ হাসির

অর্থ আমি অনুমান করে নিতে পারি। এ হাসি বলছে, তাকাও বাইরের দিকে, দেখে নাও।

কালবিলম্ব না করে চলে এলাম জানলার পাশে, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলাম বহু দূরে। একটি বাতি-ঘর ? অন্ধকারে আলোর দ্বীপ ? হাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু তারই পাশ দিয়ে কে যেন একটি তুলোর বস্তা ছুঁড়ে দিল এদিকেই। সেটি আমার রকেটের প্রায় মাথার কাছ দিয়েই ছিটকে বেরিয়ে গেল। আয়তন এত বিরাট না হলে আমি ওটাকে টেনিস বল বলেই চালিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু বিপরীত দিকে থেকে আর একটি সমান মাপের টেনিস বল প্রায় উড়েই চলে গেল। হাততালি দিয়ে উঠলাম, সর্বজ্ঞকেও আনন্দের অংশীদার করে তুলতে চাইলাম। সে সাড়া দিল না বা দিতে পারল না। কিন্তু চোখ না ফেরা..ই সে-রকম আট দশটি টেনিস বল এদিক ওদিক ছুটে গেল। কোন খেলোয়াড়কেই আমি দেখতে পাচ্ছি না—কোরটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে বলগুলির ইতস্ততঃ ছোটাছুটি দেখছি। মহাজাগতিক এই টেনিসের নিয়ম কি ? এক সংগে কয়জন খেলোয়াড় নেমেছেন ? যুগপৎ এতগুলি বল মারা কি ক্রীড়ারীতির অনুমোদিত ? মহাজাগতিক এই খেলার রীতিনীতি আমার আদপেই জানা নেই। ওদের Sports Control Board এর কোন কর্মকর্তাব সঙ্গে আমার এ যাবৎ দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু এতক্ষণে হাজার হাজার বল নিয়ে অবিরাম ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে। ওই একটি বল এসে যদি অপরার গায়ে লাগে তবে সে আহত হবে নিশ্চয়ই। সে বিপদের আশঙ্কা যে একেবারে নেই তাও নয়। কিন্তু অপরার দক্ষতা আমি দেখেছি। পিগমির দেশে অসংখ্য জোনাকি পোকার মধ্যে দিয়ে সে যে কী অনায়াসে পালিয়ে চলে এল, তা আমি দেখেছি এবং দেখেছি বলেই আদৌ আমি চিন্তিত নই। এবং সম্ভবত সর্বজ্ঞও চিন্তিত নন।

নিয়মহীন এই খেলা সমানে চলছে এবং অপরাও টেনিস কোরটের

পাশ দিয়ে নির্ভাবনায় চলছে—দূরান্তের আলোর দ্বীপগুলিকে ফাঁকি দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিয়ে 'অপরা' টেনিস কোরটের সমান্তরাল পথে ছুটছে। খেলা চলেছে পুরোদমে। ইতিমধ্যে সর্বজ্ঞের হাত থেকে ইনফ্রা-রেড টেলিসকোপটি কেড়ে নিয়ে আমি তাক করলাম তুলোর বস্তার দিকে—অথবা একটু আগে যাদের আমি টেনিস বল রূপে পরিচয় করে দিয়েছি তার দিকে। হাঁ, আপনারা এই ধারা বিবরণী শুনছেন শ্বেত মণ্ডল থেকে—পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী আলোকবর্ষ দূরে এই টেনিস কোরটের দিকে আপনাদের ইনফ্রা-রেড টেলিসকোপটি তাক করুন। ওই সাদা গ্যাসস্তূপের ভেতরে একটি নক্ষত্র-ভ্রূণ দেখতে পাচ্ছেন কি? দেখছেন, নিশ্চয়ই দেখছেন। আর দেখতে পাচ্ছেন ভ্রূণটি তীব্র নীলবর্ণ; একটু নড়াচড়া করছে তাও দেখতে পাচ্ছেন। pre-natal sleep যাকে বলে, অর্থাৎ মাতৃ জরায়ুতে শুয়ে আধো আধো ঘুম—এটা সেই অবস্থা নয় কি? বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না ত? তা হলে কাচটি মুছে নিন। এবার আবার খুব ভাল করে তাকান—ভ্রূণটি তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বাইরের গ্যাসগুলি প্রচণ্ড ভাবে শোষণ করছে—এবং যতই শোষণ করছে ততই স্ফীতদেহ হয়ে উঠছে। ……এবার একটু অপেক্ষা করুন,—কী দেখছেন? নক্ষত্র-ভ্রূণ তার গ্যাসীয় আবরণটি খেয়ে ফেলে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে—এবং বেরিয়ে আসার কালেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এই উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত খেলা। নক্ষত্রের মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে আসার পূর্ব মুহূর্তে সে ওই গ্যাসীয় আবরণ গায়ে জড়িয়েই উন্মাদের মতো মহাকাশে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ভুল করে আমি মনে করেছিলাম ওরা বুঝি টেনিস খেলছে। টেনিসের নিয়ম কানুন ওরা রপ্ত করতে পারে নি বলে আমি কিঞ্চিৎ উষ্মাও প্রকাশ করেছিলাম। এ কথাও আপনারা অবশ্যই ভুলে যাবেন না—নক্ষত্ররা কখনও একাকী জন্মায় না। জলের ধারে ব্যাঙাচির মতো এক সংগে

হাজার বা লক্ষ নক্ষত্র জন্মায়। এ ব্যাপারে যদি আপনাদের আরও কিছু কৌতূহল থাকে তবে তাকিয়ে থাকুন দক্ষিণ মেরুর আকাশে ম্যাগেলান মেঘপুঞ্জের দিকে। তার প্রান্তিক এলাকা জুড়ে এমন অসংখ্য টেনিস কোরট দেখতে পাবেন। .

আমরা এবার শ্বেত মণ্ডলের এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দূর, বহু দূর থেকে সেই ক্রীড়া প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু শ্বেতবর্ণের কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছি না। সেই প্রাঙ্গণ জুড়ে এখন ছুটোছুটি করছে অসংখ্য নীল নক্ষত্র। খোলস থেকে মুক্তি পেয়ে এখন তারা নিদারুণ ভাবে চঞ্চল, খেলার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুদের দাপাদাপি দূর থেকে দেখতে খুব ভাল লাগছে। অপরা এখন কোন্ রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছে সেকথা অপরারও জানা নেই। আমি শুধু অনুমান করতে পারি. এইমাত্র।

একটি মৃত্যু : একটি শোকবার্তা

এখন অপরা চলছে অপর এক শূন্যতার মধ্য দিয়ে। তার চলার পথটি ওই অন্ধকার সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছে— তাই দীর্ঘকাল (?) সে নিরুপদ্রবে চলতে পারবে। কোনদিকেই কোন আলোর দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা এই উক্তি বিশ্বাস করতে অস্বস্তি বোধ করছেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে তাকান উত্তর আকাশের 'ট্রায়াঙ্গুলাম' নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্য দিয়ে, নিশ্চয়ই সে বিরাট শূন্যতা আপনাদের চোখে পড়বে। ছায়াপথের সর্বত্র নক্ষত্রদের সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া রয়েছে বলে যাঁরা মনে করছেন, তাঁরাও তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পাবেন। কিন্তু সেটা মোটেই আমার মূল বক্তব্য নয়। এই শূন্যতার উপ-রাজ্যে আমার তেমন কিছু বলার থাকবে না। তাই ইচ্ছা করছি অপরা বুকের ওই দূরবর্তী অঞ্চলগুলি একবার দেখে আসব। আমার এই পৃথিবীতে খাড়া হয়ে চলার দুঃসাধ্য অনুশীলনের কথা আগেই একবার জানিয়ে

দিয়েছি। আপনারা শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন এই হালকা অভিকর্ষ ক্ষেত্রে বেশ সোজা হয়ে চলার বিদ্যাটি আমি আয়ত্ত করে ফেলেছি। এখন আর এখানে আমার মাকড়শার মতো চলার প্রয়োজন হচ্ছে না। আমি প্রমাণ-সাইজের মানুষের মতো শক্ত পা ফেলেই চলতে পারছি, হড়কে যাওয়ার কোন আশঙ্কা দেখছি না। কিচ্ছু দেখার নেই, বলার নেই; অতএব এক দীর্ঘযাত্রায় বের হব বলে স্থির করেছি। আর তা ছাড়া যাকে দেখা উচিত ছিল সর্বাগ্রে, বলতে গেলে তাকে আমি ভাল করে দেখিই নি। রকেটটি এখানে নামার পর আমি শুধু সর্বক্ষণ দেখছি 'নিথর সমুদ্র' এবং 'মহাশৃঙ্গ'কে। নক্ষত্রদের জীবন ও জীবন-কাহিনী নিয়ে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে "অপরাকে" চোখ মেলে দেখাই হল না।

অতএব বেরিয়ে যাচ্ছি এক দীর্ঘ (?) পদযাত্রায়। সর্বজ্ঞের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক একটি অনুমতি পত্রও নিয়েছি।

মই ধরে নামতে যাচ্ছি। হঠাৎ পেছনের দিকে অনেকদূরে শ্বেত মণ্ডল থেকে, পিগমি এলাকা থেকেও অনেক দূরে এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আকাশে-মহাকাশে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে—সেই আগুন আমার সামনে ও পেছনে সমগ্র ছায়াপথকে আলোকিত করে তুলল। সেই আলোর আভায় চকিতের জন্য আমি অপরাকেও দেখে নিলাম। আরও ভাল করে তাকালাম সেদিকে, বহু আলোক-বর্ষ দূরে। বুঝলাম, দাদুর মৃত্যু ঘটেছে। যে দাদুকে আমি দশ হাজারের মতো নাতি-নাতনি নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হতে দেখেছি, আশঙ্কিত সেই মৃত্যু-বার্তার জন্য সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলাম। "দাদু মারা গেলেন, দাদু চিরজীবী হোন,"—এই পার্থিব বাক্যটি আমি পাঠিয়ে দিলাম সেই দিকেই।

দাদু মারা গেলেন; পার্থিব শেষকৃত্যটি সমাধা না করে আমি দীর্ঘ পদযাত্রায় বের হব, এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হবে। একটি শোক প্রস্তাব,



সামনে এক দীর্ঘ নিরাপদ অন্ধকার, এখনও যেটা বহু আলোক-বর্ষে-বিস্তৃত। আশেপাশে কোন নক্ষত্র নেই, লাল নীল বা পীতবর্ণ। বৃদ্ধ, শিশু বা প্রৌঢ়। অতি দূরে দিগন্তের কাছাকাছি একটি বাষ্প মেঘ দেখতে পাচ্ছি। নীহারিকা ? হতেও পারে। অথবা নিছক একটি গ্যাসস্তূপও হতে পারে। ....সেটা চলে যাচ্ছে দক্ষিণে অগস্ত্য আশ্রমের দিকে। (পৃষ্ঠা : ১৫৮)।

শোকসভা, কালো ফিতা ধারণ ইত্যাদি করণীয় ত রয়েছেই—তা ছাড়া এমন এক প্রবীণের মৃত্যু ঘটল যাকে শেষমুহূর্তে চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দাদু অবশ্য কোন 'উইল' করে গিয়েছেন কিনা সে প্রশ্ন যথাসময়ে উঠবে। ইতিমধ্যে আপনারা অর্থাৎ আমার শ্রোতারা অনুগ্রহ করে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদের জন্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আধা-মন্ত্রী বা সিকি মন্ত্রী—অথবা নিদেনপক্ষে একজন কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, যা হোক এখানে পাঠিয়ে দিন। জানি, এই পদের জন্য প্রার্থীর কিছুমাত্র অভাব সূর্যলোকের অন্তর্গত পৃথিবী নামে যে গ্রহ এবং সে গ্রহে ভারত নামে যে দেশ এবং সেই দেশের পশ্চিমবঙ্গ নামে যে রাজ্য, সেখানে কিছুমাত্র ঘাটতি হবে না। আসা যাওয়ার "ফ্রী প্যাসেজ"—পাড়ার ক্লাব ঘরের উদ্বোধন বা সেতুর শিলান্যাস ইত্যাদি জরুরি কাজ মুলতুবী রেখেও চলে আসুন। আপনাদের অনেক কাজ; এটা আমি বুঝি। কিন্তু এটাও ত আপনাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আগামী নির্বাচনে আপনার পোষ্টারে এই মোক্ষম বাক্যটি "মহাকাশে গিয়ে যিনি এক অতি-বৃদ্ধ নক্ষত্রের শোক সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে এসেছেন ব্যালট বাক্সের সামনে গিয়ে সেই জীবনব্রতী মহাসাধককে ভুলবেন না যেন" লেখা থাকবে। এর পর কে আপনাকে ঠেকিয়ে রাখবে? চলে আসুন, ভাইরা; ছুটে চলে আসুন—এক সুবর্ণ সুযোগ আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু যার জন্য বা যার শোকসভার জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছি, বন্ধু আলোকবর্ষ দূরে তার মৃত-দেহের দিকে তাকিয়ে এ কী দৃশ্য দেখছি আমি? মুহূর্তের মধ্যে সে আগুন নির্বাপিত। শুধু তাই নয়। সেখানে এক সূচীভেদ্য অন্ধকার। দাদু কি তাহলে মরে গিয়ে নিউট্রন তারকা হয়ে গেলেন? নিউট্রন 'তারকার কথা আমি আপনাদের আগেই শুনিয়েছি। ঠিক বুঝতে পারছি না, তাকিয়ে

রইলাম। আবার একী হচ্ছে? সেই অন্ধকারের মধ্যে এসে দাদুর নাতি-নাতনিরা ঝাঁপ দিয়ে মরছে,—পরমুহূর্তে তাদের আর দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল সেই স্নেহ-প্রবণ দাদু? নাতি-নাতনিরা দলে দলে সেই অন্ধকূপে ঝাঁপ দিচ্ছে -যেন মৃত্যুর প্রতিযোগিতায় নেমেছে তারা। ওই অন্ধকারে রয়েছে একটি অতি-বৃদ্ধ নক্ষত্রের কঙ্কাল,—তারই অদৃশ্য প্রচণ্ড অভিকর্ষ মহাকাশে জ্যোতিষ্কদের হাতড়ে বেড়াচ্ছে এবং যাকেই সামনে পাচ্ছে, তাকেই টেনে নিয়ে তার প্রেতোদর ভরতি করছে। ওই যে, আমাদের সামনে থেকেই সে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলে গেল, তারপর আর একটি [illegible] নাচে, আসছে, দাদুর অদৃশ্য অভিকর্ষ ছুটে আসছে এদিকেই। কি চাইছে? আর একটি ধূসর ও দুর্বল নক্ষত্রকে সে ওই তো টেনে নিয়ে যাচ্ছে—পিগমি মণ্ডল শ্বেত মণ্ডল, অথবা অতি বিস্তীর্ণ বহু আলোকবর্ষ বিস্তৃত শূন্যতার ওপর দিয়ে এই পিশাচের হাত যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অপরাধ? অপরাধের কি বিচার করতে পারি আমি? পিশাচের হাত এই যে আসছে—ওই যে একটি কাঁচা নক্ষত্রের কান্না আমি শুনতে পাচ্ছি। দুর্বল, অসহায়, তবুও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অপরাধ? পালাও—যতদূর সম্ভব, জোরে এই পিশাচ-লোক থেকে তুমি পালাও। পরম এক স্বাগত রূপে সর্বজ্ঞের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বিপদের মধ্যে এই আমার একমাত্র সবুজ সান্ত্বনা। কিন্তু সেও কাঁপছে। পিশাচের দেহ নিঃসৃত অমিত শক্তিশালী চৌম্বক-তরঙ্গ তার দেহের প্রতিটি চুম্বককে কাঁপিয়ে চলছে।

সামনে ওই দীর্ঘ নিরাপদ অন্ধকার, এখনও সেটা বহু আলোক-বর্ষে বিস্তৃত। আশে পাশে কোন নক্ষত্র নেই, লাল নীল বা পীতবর্ণ। বৃদ্ধ, শিশু বা প্রৌঢ়। অতি দূরে, দিগন্তের কাছাকাছি একটি বাষ্প মেঘ দেখতে পাচ্ছি। নীহারিকা? হতেও পারে। অথবা নিছক একটি গ্যাসস্তূপও হতে পারে। কোন বিপদ নেই সামনে, এমন কি,

কোন আশঙ্কাও নেই। কোন্ মণ্ডল বা নক্ষত্র-এলাকার মধ্যে দিয়ে চলেছে অপরা? পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। আরও ওদিকে একটি নক্ষত্রপুঞ্জ দেখছি নাকি? Star Cluster। হতেও পারে—কিন্তু তেমন বড় নয়, মাত্র কয়েক হাজার নক্ষত্রের একটি জোট। সেটা এদিকে আসছে না। চলে যাচ্ছে দক্ষিণে অগস্ত্য আশ্রমের দিকে।

এই সুযোগ। এই সুযোগে আমি পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। অনেক কাল তো কেটে গেল, অপরাকে দেখা হল না। নামবার জন্য মইয়ে মাত্র পা দিয়েছি। সবজ্ঞ চিৎকার করে জানিয়ে দিল।

"তুমি পৃথিবীর সন্তান"

হাঁ, পৃথিবীরই তো সন্তান। তাতে কি আসে যায়? বারবার এ কথাটি তার মুখে শুনতে শুনতে এখন আর আমি চঞ্চল বা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠি না। পৃথিবীর এই আবর্তে পঁচিশ হাজার বছর কেটে গেল, তা আমাকে [illegible] কি-ই-বা [illegible]? কোনই অর্থ নেই যে কথার তা শুনে আমি [illegible] হয়ে উঠব কেন? এই চিৎকারটি একটি ঘড়ির মতো। কাজ করছে ঠিকই — পৃথিবীর কত বয়স হল, বার্ধক্য ও মৃত্যুর দিকে সে কতটা এগোল, তা জেনে আমার হবে কি? কি হবে তার কথা শুনে যাকে আমি মোটে চিনি না। সেই বৃদ্ধা, স্খলিত যৌবনার দোরে বারবার গিয়ে দাঁড়াব কেন? কিসের পরিচয়ে? আমি অনন্ত যৌবনের অধিকারী, আমার সামনে রয়েছে আর এক অনন্ত যৌবনা।

সেই পৃথিবীতে—অপরার বুকে

অপরার বুকে পা ফেলে আমি এগিয়ে চলছি। অপরিচিতের অনিশ্চিত পদক্ষেপ নয়। আমি চলেছি এক বিরাট সামিয়ানার নিচ দিয়ে—বিচিত্র বর্ণের গ্যাসীয় সামিয়ানা।

সেই সামিয়ানার নিচ দিয়ে এক বিচিত্র মানুষ বিচিত্র জগতের পদযাত্রায় বেরিয়েছে।

এগিয়ে যাচ্ছি, আর এই ধারা বিবরণী শোনাচ্ছি আপনাদের। এখানে আমি আপনাদের একটি কথা বলে রাখছি। এই পদযাত্রায় আমি আপনাদের সুবিধার জন্য পার্থিব দৈর্ঘের মাত্রা ব্যবহার করব। মনে রাখবেন, সেটা আপনাদের সুবিধারই জন্য। আসলে, সে হিসাব ঠিক নয়। আসলে আপনাদের পৃথিবীর কোন হিসাবই এখানে ঠিক হতে পারে না। অন্য এক পৃথিবী, অতএব তার জ্যামিতিও অন্য। আবার, সেই জ্যামিতির সঙ্গে তার সময়ও অখণ্ড ভাবে বাঁধা রয়েছে।

সামিয়ানার নিচ দিয়ে আমি পা ফেলে চলেছি। এগোচ্ছি, প্রতি পদক্ষেপ দুই ফুটের মতো। সামনে যতদূর দেখতে পাচ্ছি, অপরার সারা বুকে শতরঞ্চের ঘর আঁকা—লাল, কালো, সাদা দাগে চিহ্নিত। এমনটি হয়েছে এই কারণে নানা প্রকার তেজস্ক্রিয় কণিকায় ওর সারা দেহটি ছেয়ে রয়েছে। তার এই গোধূলি আলোর উৎস হচ্ছে ওই তেজস্ক্রিয় কণিকা,—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি। এক একটি কণিকা এক এক বর্ণের আলো ছড়াচ্ছে।

সামনে যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে গোধূলি আলো। সেই আলোর মধ্যে আলোর-স্তম্ভ। ৭০ বা ৭৫ ফুট উঁচু সামিয়ানা ফুঁড়ে আলোর স্তম্ভ উপরের দিকে উঠে গিয়েছে।

আপনাদের পৃথিবীতে আলো আসে উপর থেকে, সূর্য থেকে। এখানে আলো যাচ্ছে নিচ থেকে উপরের দিকে— সামিয়ানা পর্যন্ত।

মাঝখানে সেই সামিয়ানাটি ছেঁড়া। কোন বাষ্প-মেঘই নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি আকাশ দেখতে পাই—অনেক দূরের আকাশও দেখতে পাই। আমি দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে চলছি। যেখানে তেজস্ক্রিয় কণিকাগুলি বেশ ঘনীভূত, সেখানেই ওই স্তম্ভ তৈরি হয়ে আছে।

সামনেই একটি স্তম্ভ। মুখোমুখি তার সামনে প'ড়ে গেলাম; অথবা ধরে নিতে পারেন হোঁচট খেলাম। স্তম্ভটি শত খণ্ড হয়ে এদিকে ওদিকে ধসে পড়ল। কয়েক মিনিটের জন্য তার কোন অস্তিত্বই নেই। একেবারে যাকে বলে 'হাওয়া হয়ে যাওয়া' তাই। ভয় হল। একটু দূরে সরে গেলাম। কিন্তু আমার চোখের সামনেই সেই আলোক-স্তম্ভটি আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াল। হাততালি দিয়ে উঠলাম। সদ্য জেগে ওঠা স্তম্ভটিকে এক ঘুঁষি মেরে ফেলে দিলাম। সে আবার উঠে দাঁড়াল।

সামনে একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অঞ্চল। তার পেছনে একটি অতি বিস্তীর্ণ আলোকজ্জ্বল এলাকা স্পষ্টতঃই দেখতে পাচ্ছি। সেখানে, বলতে গেলে প্রায় জ্যামিতিক নির্ভুলতায় নির্দিষ্ট দূরত্বের মাঝে মাঝে এ ধরনের হাজার হাজার স্তম্ভ—তাদের বেষ্টন করে বহুদূরবিস্তৃত চক্রাকারে আরও কত হাজার স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সেদিকটা পরে দেখা যাবে।

অপবার বুক থেকে আপনারা এই পদযাত্রার বিবরণ শুনছেন

কৃষ্ণবর্ণ এলাকায় প্রবেশ করলাম। মাত্র পাঁচ ছয় ফুট ভেতরে—কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ আমাকে ঢেকে ফেলল, অথবা বলতে পারেন খেয়ে ফেলল।

সদ্য যে আলোক-এলাকাটি ফেলে এসেছি, সে যে কোন দিকে, কয় পা দূরে কিছুই আঁচ করতে পারছি না। আমি নিজের পা দুটি পর্যন্ত দেখতে পাই না। উপরে গভীর কৃষ্ণবর্ণ, নীচে কৃষ্ণবর্ণ, পাশেও তাই। পৃথিবীতে, আপনাদের পৃথিবীতে, এমন ধরনের কৃষ্ণবর্ণ আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। কৃষ্ণপক্ষ আপনাদের একটি আছে বটে—কিন্তু সেই কৃষ্ণপক্ষেও আপনারা কত আলো পান, দূর নক্ষত্রলোকের সহস্রকোটি দীপ আপনাদের তখনও কত আলো দেয় তার নির্ভুল হিসাব যে কোন গবেষণাগারেই পাবেন। পৃথিবীর

মৃত্তিকায় সর্বত্র যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে এবং তারাও যে আপনাদের কোন রাত্রিতেই প্রকৃত অর্থে অন্ধকার হতে দেয় না, সে হিসাবটিও সেখানে পাবেন। আপনাদের আকাশের ঊর্ধ্বতন বায়ুস্তর থেকে বিচ্ছুরিত আলো, সে-ও তো কম নয়।

কিন্তু এখানে অপরার এই স্বপ্নরাজ্যে আমি দুঃস্বপ্নের বন্দী। সেই অন্ধকার আমাকে ঢেকে ফেলেছে, খেয়ে ফেলেছে, তার অন্তহীন জঠরে আমি চিরকালের জন্য বন্দী হয়ে গেলাম। এই রাজ্যে অর্থাৎ অপরার পৃথিবীতে শব্দ বলে কোন কিছুই কোনদিন ছিল না। তবুও আমি প্রয়োজনে চিৎকার করেছি, আলোকস্তম্ভগুলির অনায়াস ভেঙে পড়া দেখে হাততালি দিয়ে উঠেছি। কিন্তু এখন সে শক্তিও কে যেন কেড়ে নিয়েছে।

চিরন্তন নিঃশব্দতার রাজ্য, তার মধ্যে এক চিরন্তন অন্ধকারের উপনিবেশে আমি নির্বাসিত হয়ে গেলাম। তার মধ্যে, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আমি যেন গভীর রাতে বহু দূরের এক কারখানার তৎপরতা শুনতে পারছি। ব্লাস্ট ফারনেসের বজ্রগম্ভীর আর্তনাদ, কোক্ চুল্লীর ফিস্ ফিস্ আলাপ: কনভেয়র বেলটের একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক: জল-বিদ্যুৎ কারখানার পাশে জলের বাঁধ ভেঙে পড়ছে: নানা সুরে বাঁশী বেজে চলছে। আমার দেহযন্ত্ররূপী বিরাট Complex-এর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ এখানে কোন কালেই ছিল না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমি বসে পড়লাম। সত্যি বলতে কি, এখন আমার কোন পরিচয় নেই। আমি অসীম অন্ধকারের মধ্যে একটি আলোর কণিকা নই বা সম্ভাবনাপূর্ণ কোন বস্তুকণিকাও নই। আমি এক অনস্তিত্বের প্রাসাদে আর এক অনস্তিত্ব। হয়তো ব্যাকটেরিয়ার বা ভাইরাসের চেয়ে ছোট একটা কিছু।

অনেকক্ষণ পর উঠলাম আমি। কোন দেবাদেশের ইঙ্গিত পেয়ে নয়, উঠলাম নিজের ওই অবস্থার ভয়াবহতায়। দুই হাতে অন্ধকারকে

ঠেলে দিচ্ছি, লাথি মারছি ওই অন্ধকারকে, একটি 'মাইক্রন' চ্যালেঞ্জ জানাল একটি 'ম্যামথ'-কে।

কোথায় চলে গেলাম, কোথায় ছিটকে পড়লাম, কোথায় ক্ষত-বিক্ষত হলাম তা জানার কোন প্রয়োজন নেই আমার। দয়াহীন এক ক্রূর অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে একটি অনস্তিত্ব, তার অভিশাপের প্রাচীরে ফাটল ধরাতে চাইছে। কিন্তু কোন্ দিকে সে প্রাচীর, সে কিছুই জানে না। সে শুধু জানে, এই অন্ধকারের বাইরে আলো আছে, আছে আলোকস্তম্ভ, একদা সে তা দেখে এসেছে। এক আলোকিত সভাক্ষেত্রের উপর দিয়ে এক নিঃসঙ্গ দর্শক হেঁটে এসেছিল, সে তাকে ভোলে নি।

এগিয়ে যাচ্ছি, আরও এগিয়ে যাচ্ছি

অবশেষে আবার আমি সেই আলোকিত অংশে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আমি জয়ের গর্বে আনন্দিত হই। আসলে, ওখানকার মাটিতে বিন্দুমাত্রও তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই। তেজস্ক্রিয় পদার্থ আমার সামনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে চলনসই রকমের আলোকিত করে রেখেছে।

আনন্দে আমি একটি আলোকস্তম্ভকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে রইলাম। কাঠামোহীন এই দেহটি নানা দিকে এলিয়ে পড়তে চাইছে। কোন রকমে স্পর্শ বাচিয়ে আমি একটি স্বপ্নকেই জড়িয়ে ধরে থেকে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলাম। এ এক স্বপ্ন জগৎ। সেই স্বপ্ন রাজ্যের ওপর দিয়ে হেঁটে চলছি। যতদূর দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিতে পারছি, পুরোপুরি অন্ধকার। কিছুই দেখতে পারছি না। একটি পাহাড়ের পাদদেশ,—হাঁ, পাহাড়ই হবে; কিন্তু তেমন উঁচু নয়। পৃথিবীতে ওটাকে আপনারা উঁই ঢিবিই বলে থাকেন—দেখতে পাচ্ছি। তার চূড়াটি সামিয়ানা ফুঁড়ে উপরে উঠে গিয়েছে। অনেকক্ষণ সে পাহাড়ের উপত্যকায় দাঁড়ালাম, শৃঙ্গটি ভাল করে দেখার

চেষ্টা করলাম। সেই পাহাড় জুড়ে অসংখ্য সুড়ঙ্গ—সুড়ঙ্গগুলি আবার আলোকিত। বাইরে থেকে ওদের ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখলাম। কত শত বা সহস্রকোটি বছর ধরে অপরা এই স্বপ্নগুলি বুকে সাজিয়ে রেখে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে!

প্রতিটি সুড়ঙ্গের প্রত্যন্ত প্রাচীর থেকে তীব্র আলো ঠিকরে আসছে। সুড়ঙ্গে প্রবেশের পথগুলি যদিও গোধূলি অন্ধকারে ঢাকা; কিন্তু ওদিকের প্রাচীরে প্রতিফলিত তীব্র আলো। মনে হয়, অভ্র-প্রাচীর।

ক্লান্তিহীন পর্যটক এগিয়ে চলছেন। এখানে সামিয়ানার অনেকটা জুড়েই ফাঁকা। সেখানে দাঁড়ালে পরিষ্কার দেখা যায় নক্ষত্রগুলি ছুটে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের আবর্তন শেষ করতে যাচ্ছে—তারাও ক্লান্তিহীন মহাকাশ পর্যটক।

যদি এখানে ক্ষীণতম বায়ুপ্রবাহও থাকত তবে এ সকল ফাঁক বা ফাটল থাকত না। অথবা, যদি থাকত ক্ষীণতম তাপ-বৈষম্য তবে অপরা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যেত, অনড় গ্যাসপুঞ্জের বোঝা তাকে বয়ে বেড়াতে হত না। এমনটি ঘটলে এ মুহূর্তেই অপরার আকাশে এই মেঘগুলির ঠেলাঠেলি খেলা শুরু হয়ে যেত। কিন্তু তা হবার নয়, তা হবে না।

কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলের পাশে দিয়ে চলেছে অপরা? ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার রকেট থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে এসেছি। কিন্তু অপরার শেষ সীমানা দেখতে পাচ্ছি না।

এবার ঢুকে পড়লাম আর এক আলোকিত রাজ্যে, স্তম্ভের পর স্তম্ভের গা ছুঁয়ে এগিয়ে চলছি। কিন্তু কোন পদচিহ্ন আমি রেখে যাচ্ছি না, যেই পদ-চিহ্ন ধরে আমি আবার রকেটে ফিরে যেতে পারব। পেছনে তাকালাম; কিন্তু সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। আলোকিত ও অন্ধকার, এমন হাজার হাজার রাজ্য রয়েছে আমার

পেছনে, আমার চারিদিকে। এর কোন্‌টির সীমানা ধরে এগোলে আমি রকেটে পৌঁছুতে পারব অথবা পারব সর্বজ্ঞের কাছে এই অভিযানের বিবরণ পেশ করতে, তাও বুঝতে পারছি না।

এগিয়ে যাচ্ছি। এক এক সময় আমি যেন ক্লান্ত, অবসন্ন পর্যটক; পা আর এগোচ্ছে না। পর মুহূর্তেই আমি সদা-তৎপর, প্রাণ-উচ্ছল এক অভিযাত্রী। এক একটি দিগন্তের পর দিগন্ত অতিক্রম করে যাচ্ছি।

চলে আসুন পৃথিবীর স্বর্ণ সন্ধানীরা

এক অতি-বিস্তীর্ণ স্বর্ণ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। তেজস্ক্রিয় কণিকার সংগে মিশে আছে স্বর্ণ কণিকা। এই প্রান্তরে এবং মনে হয়, মনের বহু প্রান্তর জুড়ে ধূলিকণার সংগে স্বর্ণকণা। ফলে এখানকার গোধূলি আলোতে আরও বর্ণ এসে যুক্ত হয়েছে। এখানকার আলোর স্তম্ভগুলির গঠনে আরও বেশী পরিপাট্য। •

স্বর্ণ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে হাঁটছি। সে যে কী ক্লান্তিহীন আনন্দ, এখানে যাঁরা আসেন নি, তাঁরা কোনদিনই অনুমান করতে পারবেন না। চলে আসুন পৃথিবীর স্বর্ণ সন্ধানীরা, উত্তর আকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের পাশ দিয়ে যে পথ চলে গিয়েছে ২০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে সমুদ্র-সর্প ছায়াপথের দিকে, সেই পথেরই এক পাশে ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে মহাশ্বেতা মণ্ডল। সেই মণ্ডলে ছুটে চলার কালে অপরার বুকে আমি এক অতি-বিস্তীর্ণ স্বর্ণ-প্রান্তর খুঁজে পেয়েছি। চারদিকে পৃথিবীর ধূলিকণার মতোই এখানে রয়েছে স্বর্ণ-কণা। শুধু কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষায়। মুঠি মুঠি স্বর্ণ-কণা কুড়িয়ে নিলাম, লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। চারদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলাম— সেই স্বর্ণ-কুয়াশার ভেতর দিয়ে আমি চলেছি। সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন না আপনারা। ঘাড়টি নীচু করে দেখলাম, চোখে চোখে

বিশ্লেষণ করলাম। ঠিক, সোনা—Gold। চলে আসুন আপনারা; পৃথিবীর স্বর্ণ-পিপাসুরা। এখানে এসে বস্তা ভরতি করে কুড়িয়ে নিয়ে যান। কেউ বাধা দেবে না, ট্যাকসো আদায়ের জন্য কোন শুল্ক কর্তৃপক্ষ এখানে নেই। আপনাদের জন্য, শুধু আপনাদের জন্য আমি এই স্বর্ণ-জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছি। রকেটে চড়ে, বিমানে করে, আপনাদের ইচ্ছামতো যে কোন পরিবহণে চলে আসুন। এই তো দেখছেন, আমি সর্বাঙ্গে স্বর্ণ-ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে সেজে রয়েছি, স্বর্ণের এই স্পর্শ, আনন্দের মত্ততা,—চলে আসুন। হাঁ, আমি আপনাদের চিনি। ইতিহাসে আমি আপনাদের বহুবার দেখেছি। আশা করি সে কথা আপনারা ভুলে যান নি।

১৯০০ সালে আলাসকায়, ১৮৭১ সালে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়, তার কিছুদিন আগে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরোডো অথবা অষ্ট্রেলিয়া (১৮৩২) বা নিউগিনি (১৯২২) আপনাদের আমি দেখেছি। সেই ছুটে চলার দৃশ্য আমার কাছে জীবন্ত এবং বলতে কি, জীবনের চেয়েও জীবন্ত। ইংরেজিতে ওরা যার নাম দিয়েছেন Gold Rush—সে আমি বহুবার দেখেছি, পড়েছি তা নিয়ে অমর-সাহিত্য, দেখেছি তা নিয়ে জীবন্ত ছায়াছবি। কেউ বিদ্রূপ করেছে, হাসাহাসি করেছে, আবার কেউ কেউ এ নিয়ে দার্শনিকতাও করেছে। দুর্গম; মানুষ এমন কি জীব-জন্তুর অগম্য স্থানগুলিতে কি করে রাতারাতি, হোটেল, ব্যাঙ্ক, দোকানপাট সংবাদপত্র গড়ে উঠল, সেও তো এক দীর্ঘ-ইতিহাস। "ঈশ্বরের অভিশপ্ত" স্থানগুলিতে আপনারা আশীর্বাদের আশায় ছুটে গিয়েছেন, ফিরে এসেছেন সবস্ব খুইয়ে—এও আমি দেখেছি।

দেখেছি, আফরিকার দুর্গম আরণ্য অঞ্চলের ধূলিকণা অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়ে কেমন আগ্রহের সংগে আপনারা তাকিয়ে রয়েছেন, যেন নিজেরই হৃদপিণ্ডের একটি টুকরা দেখছেন। এ সব দৃশ্যই আমার

স্মৃতিতে রয়েছে। না, এবার প্রতারিত হবার কোন আশঙ্কাই নেই। এই দেখুন, আমি নিজেই স্বর্ণ-কণার চাদরে ঢাকা পড়ে গিয়েছি, হেঁটে চলেছি স্বর্ণ-কুয়াশার মধ্য দিয়ে। চলে আসুন ভাইরা,— এই যে বলেছি ২০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে সমুদ্র-সর্প ছায়াপথটিকে ডাক্ করে, ছুটে চলে আসুন। কুড়িয়ে নিয়ে যান, আপনাদের স্বর্ণ-সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করুন। আপনারাই পারবেন, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের আলোয় অপরাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে, তার এই নৈঃশব্দকে কলহে ও কলরবে মিথ্যা করে দিতে। অসংখ্য শালতরুর মতো ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আলোকস্তম্ভগুলি এই গ্যাসীয় সামিয়ানাটি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার নিচ দিয়েই আমি হেঁটে চলেছি। অনন্ত যাত্রী এক পর্যটক। সে জানে না কোথায় যাচ্ছে, বা, কতটা যাচ্ছে। কতটা সময় ধরে সে চলছে তারও কোন হিসাব নেই। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস বোধ হয় অনেকদিন এ ভাবেই চলছিল। পথ চলতে চলতে একদিন তার সামনে লক্ষ্যস্থলটিও খুঁজে পেল। অন্ধকার সমুদ্রে সে দ্বীপ দেখল, যে দ্বীপ তার নিজেরই সৃষ্টি. তার কল্পনা ও মানসিকতার সৃষ্টি।

চলছি আর চলছি। কোন সময় আলোকস্তম্ভগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে বেপরোয়ার মতো; কখনও বা তাদের পা বাঁচিয়ে সতর্ক ও সাবধানে পা ফেলে চলছি।

হাঁ, পৃথিবীর স্বর্ণ-পিপাসুরা, আপনাদের সংগে আমার কিছু গোপন কথাবার্তা রয়েছে। স্বর্ণ-পিপাসার কথা তুলে আপনাদের নিন্দা করা হয় বটে, কিন্তু এই পিপাসা আজকের নয় বা এটা বিংশ শতাব্দীর কোন অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যও নয়। একটু ফিরে তাকান মধ্য যুগের মধ্য এশিয়ার দিকে। সেখানে alchemist দেখতে পাচ্ছেন না কি? alchemist কথাটির বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে 'অপ-রসায়নবিদ'। এই অনুবাদে আমার ঘোর আপত্তি রয়েছে, বিশেষ করে আজকের

পরিবর্তিত অবস্থায়। ওই alchemist-দের কি আপনি চীনে, মধ্য ইউরোপে ও দক্ষিণ আমেরিকায়ও দেখতে পাচ্ছেন না? সে যুগের জ্ঞানী, গুণী ও প্রবীণেরা alchemist হতেন, অর্থাৎ ইতর ধাতুকে সোনায় পরিবর্তিত করার বিদ্যা তাঁরা জানতেন। অন্তত লোকেরা তাই বিশ্বাস করত। alchemy বলে একটি বিদ্যাই গড়ে উঠল যা বাস্তবিক আজকের রসায়ন শাস্ত্রেরই জননী। তাঁরা লোহাকে সোনায় পরিবর্তিত করতে সত্যি সত্যিই পারতেন কিনা সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল পরমাণুর গঠন-বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে লোহাকে সোনায় পরিণত করা যায়, এ কথা তাঁরা জোর গলায় বলে গিয়েছেন। সে দিনের সেই মরুচারী স্বপ্ন আজ কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হয়েছে এক মৌল পদার্থকে অন্য মৌল পদার্থে রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে। সেদিন কেন মানুষ ছুটে যেত ওই alchemist-দের কাছে? আপনাদের ভাষায়, "অপ-রসায়নবিদদের কাছে? কেন তাদের অযাচিত ভাবে সমাজের শীর্ষ আসনটি দেওয়া হত? আগেই বলেছি আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের জননী হচ্ছেন ওই 'অপ-রসায়ন শাস্ত্র'। মানুষের ওই স্বর্ণ-পিপাসা না থাকলে গড়ে উঠতে পারত কি রসায়ন শাস্ত্র? হাজার হাজার বছর ধরে শত শত পদার্থের মিশ্রণ ঘটিয়ে স্বর্ণ-কণা সৃষ্টির যে প্রয়াস বা অপ-প্রয়াস চলেছিল পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন মানুষের ওই "সোনালি স্বপ্ন"! জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে উত্তরণের ইতিহাসও তাই। রাজদরবারে রাজতুষ্টির জন্য সওয়াল করতে নক্ষত্র বা গ্রহদের হাজির করার মধ্যে যথেষ্ট প্রতারণা ছিল ঠিকই কিন্তু আদালতে সাক্ষীদের হাজির করতে গিয়ে দেখা গেল তারা আগেকার স্থানটিতে নেই। তারা স্থান পরিবর্তন করে ফেলেছে। খোঁজ, খোঁজ তাদের। ওই খোঁজের পথেই আকাশ দিগন্ত আরও প্রসারিত হয়ে পড়ল—প্রমাণ চান তো আমি হাজির

করতে পারি Copernicus-কে—তিনি এমনই এক রাজদরবারের রাজ-জ্যোতিষী ছিলেন। এই ব্যাপারে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ পাবেন Galileo-র কাছে। কিন্তু, কি যেন বলছিলাম; ওঃ সেই স্বর্ণ-পিপাসার কথা। হাঁ, আজও দেখতে পাবেন 'লকারে লকারে' সেই পিপাসার প্রমাণ। দেখতে পাবেন, মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাত্যহিক জীবনেও।

আগেকার কথায় ফিরে আসা যাক। স্বর্ণ-রেণু উড়িয়ে দিয়ে, স্বর্ণ কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে আমি তারই মধ্য দিয়ে চুপি চুপি পা ফেলে এগিয়ে চলেছি। আশঙ্কা, কেউ যদি দেখে ফেলে! কেউ যদি টের পায়?

শ্রোতারা আমার সংগে সংগে এগিয়ে আসুন। অথবা, দেখুন আমাকে।

আলো-আঁধারের সে রাজ্যে আমি চুপি চুপি এগোচ্ছি, নিজের সংগে চুপি চুপি কথা বলছি। নিজের কাছেই পরামর্শ নিচ্ছি। স্বর্ণ-ধূলি প্রান্তর শেষ হয়ে এবার দেখতে পাচ্ছি ইতস্ততঃ ছড়ানো স্বর্ণ খণ্ড, ছোট বড় মেজ ও সেজ নানা আকৃতির, অধিকাংশই পার্থিব জ্যামিতিক ছকে কাটা। কী করি আমি? কী করতে পারি? উদ্দাম পুলকে আমি একটি খণ্ডকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠি। পরমুহূর্তেই আবার সাবধান হয়ে যাই। চুপি চুপি পা টিপে টিপে পথ চলতে শুরু করে দিই। একটি বিরাট স্বর্ণ-খণ্ড পিঠের ওপর চাপিয়ে নিয়ে আমি অনেক্ষণ ছুটে বেড়ালাম, সেটিকে একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে শুয়ে আর একটি খণ্ডকে জড়িয়ে ধরলাম। শয্যাসংগী হিসাবে ওর কি তুলনা আছে? কেমন শীতল, মধুর, উচ্ছ্বসিত-প্রাণ। এত প্রাণ আছে নিষ্প্রাণ স্বর্ণখণ্ডের দেহে! কত আকৃতি, কত বর্ণ. তেজষ্ক্রিয় ধূলিকণার রশ্মিপাতে কত উজ্জ্বল।

আমার শ্রোতারা হয়তো ভাবছেন, এইবার আজগুবি গালগল্প

শুরু হয়েছে। হয়তো বলতে শুরু করছেন এতক্ষণ ত তুমি বেশ বলছিলে, বাপু, শুনতেও তেমন মন্দ লাগছিল না, এবার তুমি কেমন একটু বে-খাপ্পা কথা বলতে শুরু করছ। জবাবে আমি বলব না, মোটেই বেখাপ্পা কথা আমি বলছিনা। হলপ করে বলছি, একটি কথাও বানানো নয়। আমি যা দেখতে পাচ্ছি, অবিকল তাই বলে যাচ্ছি। অবসর মতো আমি সাক্ষী হিসাবে হাজির করব জ্যোতিঃ পদার্থ বিজ্ঞানী Gamow কে। দলিল হিসাবে আমি পৃথিবীর স্বর্ণ-খনির ইতিহাস উপস্থিত করব,—এতেও যাঁরা সন্তুষ্ট হবেন না, এবং কমিশনের সামনে এই মামলার বিচারের জন্য যাঁরা প্রার্থনা জানাবেন তাঁদের আমি এক বিস্ফোরণশীল মহানক্ষত্রের সামনে চলে আসতে বলব। এত প্রতিশ্রুতিতেও যাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, তাঁদের আমি আরও কিছুদিন—ধরুন, আরও পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করতে বলব। যেদিন হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন (Fusion) নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের প্রযুক্তি-চাতুর্য আরও এগিয়ে গিয়েছে, সেদিনের প্রতীক্ষায় থাকতেই বলব। সেদিন একটি কারখানার গেটে আপনি এক বালতি জল, হাঁ, স্রেফ জল, নিয়ে হাজির হয়ে এক তাল সোনা নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।

আপাতত রইল সে কথা। আমি কি একটি সোনার পাহাড়ে ঠোকর খেলাম? প্রথমেই বেশ একটু ব্যথা লেগেছিল বই কি, কিন্তু যেই দেখলাম ওটা সোনার পাহাড় তক্ষুনি সব ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে প্রিয়তমার স্বর্ণ মাধুর্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। যত কথাই বলি না কেন, আমরা এক স্বর্ণ-সভ্যতার সৃষ্টি। সোনার নাম শুনলেই আমাদের মন পুলকে আনচান করে উঠে।

আমার বাম পাশে একটি কৃষ্ণ রাজ্য। মানে, সেখানকার ধুলো-বালিতে তেজস্ক্রিয় কোন পদার্থই নেই। সেই জন্যই ক্ষীণতম আলোও নেই আর বায়ুপ্রবাহ এমনই স্থির ও অনড় যে এখানকার আলোকিত

ধূলিকণা ওখানে যেতেই পারছেনা, সেখানে অন্ততঃ কিছুটা আলো ছড়াতে পারছেনা। আবার ওখানকার ধূলিকণাও পারে না আসতে এদিকে।

যা হোক, বাম দিকটা এড়িয়েই আমি চলছি সেই পাহাড়ের পাশ দিয়ে। বিরাট বিরাট সোনার চাই কাঁধে তুলে নিয়ে অতি কষ্টে হেঁটে চলছি সে রাজ্যে যেখানে সোনা ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

তারপর আর এক কাহিনী। গুপ্ত স্বর্ণ-উপত্যকায় অনেক, অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে আমার নুয়ে পড়া পিঠের ওপর থেকে সেই স্বর্ণ বোঝা নামিয়ে নিলাম। এখানে, সেখানে ডাইনে বাঁয়ে যে সকল স্বর্ণ-খণ্ড পড়ে রয়েছে, সেগুলি কুড়িয়ে আমি তৈরি করছি এক স্বর্ণ-প্রাসাদ। বহু দূর, বহু দূর থেকে কুড়িয়ে আনছি, পৃথিবীর সময়ের মাপে কত দিন, কত মাস, কত বছর কত শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে, অপরীর সেই স্বর্ণ উপত্যকায় একটি নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত মানুষের স্বর্ণ-প্রাসাদ ধীরে গড়ে উঠছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জ্যামিতিক রেখায় রেখায় কাটা স্বর্ণ-খণ্ড কত দূর দূরান্ত থেকে কুড়িয়ে এনেছি, মুখে মুখে গেঁথে দিয়েছি, এক এক খানা করে স্বর্ণ-ইষ্টক এনে আমি প্রাসাদ তুলছি। দিয়েছি ঘর্ম, ক্লেদ ও রক্ত বিন্দু। খুঁজে দেখতে পাবেন, প্রত্যেকটি ইটে রয়েছে আমার ঘর্মবিন্দু, প্রতিটি গাঁথুনিতে আমার রক্তবিন্দু। ক্লান্তি বা অনিচ্ছা কাকে বলে, আমি ভুলেই গিয়েছি।

ওই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে রোমান ও বাইজান্টাইন স্থাপত্য হয়তো বা খানিকটা তক্ষশীলাও—ওর প্রাচীর চিত্রে আমি স্পেনের গুহাচিত্র, দক্ষিণ, আমেরিকার মায়া সভ্যতাকেও নিলাম। নিউগিনির প্রস্তরযুগীয় মানুষের তালপত্র ছায়ার নিচে খানিক আমিও বিশ্রাম করে নিলাম।

এভাবেই গড়ে উঠল আমার স্বর্ণ-প্রাসাদ। তার কক্ষে কক্ষে

আমি ঘুরে বেড়াই, খিল খিল করে হেসে উঠি। প্রাচীরগুলিও হেসে ওঠে, মনে হয়, বিদ্রূপ করে।

প্রহরী হয়ে সেই প্রাসাদেব চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করি আমি। বাইরে থেকে খিলানগুলি ভাল করে পরীক্ষা করি, ঘুঁষি মেরে ওদের শক্তি পরীক্ষা করি।

আবার রাজা হয়ে আমি ওই প্রাসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করে আমি সিংহাসন দখল করে বসি। রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাকে আমি নিজেই কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে যাই, আবার সোনার তাল কুড়িয়ে নিয়ে এসে তার সামনেই দাঁড়াই, সুড়ঙ্গ তৈরি করে তাল তাল সোনা জড়ো করি। একটি অতি বৃহৎ সোনার চাঁই দিয়ে আমি সেই স্বর্ণ-প্রাসাদেব প্রবেশ তোরণ আঁটো সাঁটো করে বন্ধ করে দিলাম। তারই ফোকর দিয়ে আমি তাকিয়ে থাকি আকাশ মহাকাশের দিকে। স্বর্ণলোভীর দল এসে পড়ল নাকি এই আশঙ্কায় আরও শক্ত করে ওই প্রাসাদ-পুরীর খিল এঁটে দিয়ে আমি আকাশে রকেট, বা, সে ধরনের কিছুর আর্বিভাব আশঙ্কা করছি।

ছিদ্রপথে দেখছি, কৃষ্ণবর্ণ বাষ্প মেঘ স্তূপের পাশ দিয়ে কী যেন উড়ে আসছে, একটি দুটি নয়, হাজার ব লক্ষও হতে পারে। আমি ছুটে যাই সুড়ঙ্গের দিকে, সেখানে শক্ত হয়ে দাঁড়াই ; আবার ভয়ে আঁতকে উঠি, চিৎকার করি ; স্বর্ণলোভী দলের দিকে কটূক্তি নিক্ষেপ করি। অনেকক্ষণ বিলম্ব করেও যখন দেখলাম তারা এল না, তখন ধীরে ধীরে চলে এলাম তোরণের পেছনে। ছিদ্রপথে তাকালাম মহাকাশের দিকে। দীর্ঘ পুচ্ছ দিয়ে মহাকাশকে লেহন করতে করতে ওরা চলে যাচ্ছে অন্য দিকে, বিপরীত দিকে। দেখেই চিনলাম, ওরা ধূমকেতুর দল। দীর্ঘ কক্ষে নিজের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে করতে তারা চলে এসেছিল এখানে, আবার চলেও গিয়েছে সেই কক্ষপথেই। অত্যন্ত

নির্বিরোধ—মহাকাশে এমন নিরীহ, এমন চাঞ্চল্যহীন কাউকেই কোথাও দেখিনি। শ্রোতাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে এদের দুই স্বগোত্রীয়ের সন্ধানেই আমি ঘুরে বেড়িয়েছি মহাজাগতিক হিমঘরে। 'হেলি' ও "কোহোতোকের" ঠিকানা পাবার আশায় সূর্যলোকের চারিদিকে অন্ধকার হিমলোকে আমি কতজনের দোরে কড়া নেড়েছি।

এবার শুনুন স্বর্ণ কাহিনী

যাক, খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এবার শুরু করা যেতে পারে। স্বর্ণ-বাজ স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট। মাইকের সামনে আপনারা তাঁকেই দেখছেন আমি আগেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে কোন কঠিন তত্ত্ব আপনাদের শোনাব না; সেজন্যই আমি নিউট্রন প্রোটনের কঠিন খেলাটিও বাদ দিয়েই যাচ্ছি। যদিও সেটি এই কাহিনীর একটি অপরিহার্য অংশ। আমি জানি "Mathematics is the queen of science:" "গণিতই বিজ্ঞানের রাণী"—তথাপি আমি কোন গাণিতিক জটিলতায়, বা পরিসংখ্যানিক গোলকধাঁধায় প্রবেশ করছি না—। ওই গোলকধাঁধা থেকে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসতে না পারলে কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় না, "সীতার অগ্নি পরীক্ষা" অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তথাপি আমি সেদিকে যাচ্ছি না

বিস্ফোরণ উন্মুখ একটি মহাসূর্যের অথবা, মহা নক্ষত্রও বলতে পারেন, সামনে দাঁড়ানো যাক

পেঁয়াজের খোসার পর খোসার মতো রয়েছে এই নক্ষত্রদেহে গ্যাস-পুঞ্জ। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন তাপ মাত্রা কিন্তু, তার আগে জেনে রাখা ভাল, ওর বাইরের দিকে ফাটছে পরমাণু বোমা,—সেই পরমাণু বোমার তাপেই গভীরে গিয়ে ফাটাচ্ছে হাইড্রোজেন-বোমা পরমাণু বোমার তাপ না পেলে হাইড্রোজেন বোমা ফাটে না, একথা আপনারা জানেন।

মহাকাশে সূর্যের ওই বোমা ফাটাফাটির ব্যাপারটি না ঘটলে আমরা তাপ, আলো, বা শক্তি (Energey) কিছুই পেতাম না। সূর্যের ওই "বোমা বাজিই" আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে—। এবং এ কাহিনী প্রত্যেকটি নক্ষত্রেরই। কোটি কোটি নক্ষত্রের বিকিরিত আলো ও উত্তাপের উৎসটি কোথায়? অন্যান্য কণিকা ও রশ্মিগুলি কোথায় কি ভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে? সূর্য সাক্ষী থাক। আমি কাহিনীটি বলে যাচ্ছি। 'ভর'কে (Mass) শক্তিতে (Energy) রূপান্তরের কাহিনী রয়েছে সূর্যে এবং অন্যান্য নক্ষত্রে। যে পদ্ধতিতে ওই নাক্ষত্রিক উনুন জ্বলছে তা বহুকাল বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করে এসেছে। প্রথমে মনে করা হত, কয়লা, বা অনুরূপ পদার্থই সেখানে জ্বলছে। পৃথিবীতে কয়লা, বা, তেল পুড়িয়ে যে ভাবে শক্তি (Energy) পাওয়া যায়, ঠিক সে ব্যাপারই ঘটছে নক্ষত্র দেহে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এই প্রশ্নের সামনে হিমসিম খেয়েছে। অথচ, সূর্য-দেহে বস্তুর পরিমাণ কতটা, তা জানা ছিল। সেই হিসাবেই কয়লা পোড়ানোর মতো ব্যাপার ঘটলে সূর্যের আয়ু খুব বেশী করে ধরলেও ত্রিশ হাজার বছরের বেশী হওয়া উচিত নয়। অথচ সূর্য যে ইতিমধ্যে তিন শত কোটি বছরের বয়স সীমা অতিক্রম করে এসেছে।

ইতিমধ্যে, সূর্যকে আড়ালে রেখে পৃথিবীতে চলল পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে দীর্ঘ পরীক্ষা। এবিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন, Macroscopic world-এর (সূর্য, তারকা, ছায়াপথ ইত্যাদি) খবর পাওয়া যাবে Microscopic world বা পরমাণুর জগতে। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর "ভর-শক্তি সমতা সূত্র" (Mass-Energey equivalance equation) বিজ্ঞান জগতকে উপহার দিলেন—। 'শক্তি' ও 'ভর' যে একটি অপরটিরই রূপান্তর, এর আগে তার এমন পরিচ্ছন্ন প্রকাশ আর কারো কাছেই পাওয়া যায় নি।

পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠনে চিত্র যতই পরিষ্কার হয়ে উঠল, ততই জ্যোতিষ্কলোকের এই অপরিসীম দীর্ঘ জীবনের হেতুও খুঁজে পাওয়া গেল। ১৯৩৮ সালে প্রথম জানা গেল, সূর্য দেহের বহিঃস্তরে যখন চলছে পরমাণুর বিদারণ (Fission) ঠিক, তখনই তার অন্তঃস্তরে চলছে পরমাণুর সংযোজন (Fusion)। অন্য কথায়, বহিঃস্তরে হাইড্রোজেন পরমাণু ভেঙ্গে 'হিলিয়াম মুক্তি পাচ্ছে, গভীর স্তরে গিয়ে সেই হিলিয়াম অপেক্ষাকৃত ভারী কেন্দ্রীন (Nucheus) গড়ে তুলতে গিয়ে কিছুটা 'ভর' বিসর্জন দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ, 'ভর' এর কিছুটা বিলয়ন (Anihilation) ঘটছে।

যেহেতু Mass 'বা' "ভর" খুইয়ে সূর্য, বা যে কোন নক্ষত্রকে এই বিপুল পরিমাণ শক্তি ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিতে হচ্ছে, সে জন্যই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তারা প্রতিদিনই নিজেদের ফতুর করে তুলছে। বর্তমানে যে হারে সূর্য হাইড্রোজেন ব্যবহার করছে, তা অব্যাহত থাকলে একশত কোটি বছরে সে তার দেহের শতকরা মাত্র এক ভাগ হারাবে। যদিও ক্ষয়ের পরিমাণ অতি সামান্য, তথাপি, এটা অনস্বীকার্য যে সূর্য ক্ষয় হচ্ছে এবং একদিন তার মৃত্যু ঘটবে। জ্যোতির্বিজ্ঞান যাকে বলে 'শ্বেত বামন' অবস্থা তাতে পৌছুতে তার সময় লাগবে তিন হাজার কোটি বছর। অর্থাৎ, অন্ততঃ তিন হাজার কোটি বছরে সূর্যের সমস্ত জ্বালানি—হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

অন্যান্য নক্ষত্রেও পরমাণুর বা পরমাণু-কেন্দ্রীনের এই সংযোজন বা Fusion চলছে। ব্যাপারটির তুলনা করা হয়, হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের সংগে। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি সংযোজন সংক্রান্ত, তথাপি, কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। নক্ষত্র-দেহে এই কাজটি চলেছে সহস্র কোটি বছর জুড়ে। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেত্রে কাজটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। এক

সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে বোমাটি ফেটে যায়।

এবার আসুন, বিস্ফোরণোন্মুখ নক্ষত্রটির সামনে, তার মুখোমুখি দাঁড়ানো যাক। এর আগেই উপরের স্তরে পরমাণু-বিস্ফোরণের ফলে হিলিয়াম মুক্তি পেয়ে চলে গিয়েছে অভ্যন্তরে এবং সেখানে অপেক্ষাকৃত ভারী কেন্দ্রীন গড়তে গিয়ে গড়ে তুলেছে অকসিজেন ও নিওন। আমরা যখন প্রথম ওর সামনে দাঁড়ালাম তখন অভ্যন্তরীণ তাপ মাত্রা ছিল ত্রিশ কোটি ডিগরি। কিন্তু নক্ষত্রটি যতই আরও সংকুচিত হচ্ছে, ততই ওর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তাপমাত্রা আরও বাড়তে থাকায় নিওন ধ্বংস হয়ে গেল, গড়ে উঠল ম্যাগনেসিয়াম। ৬০ কোটি ডিগরি তাপমাত্রায় এই কাণ্ড ঘটল, অর্থাৎ একটি মৌলকণিকা রূপান্তরিত হল আর এক মৌলকণিকায়।

এ অবস্থায় সে নক্ষত্রের চিত্রটি একবার দেখে নিন; একেবারে অভ্যন্তরীণ স্তরে অকসিজেন ও ম্যাগনেসিয়াম, দ্বিতীয় স্তরে দেখতে পাচ্ছেন অকসিজেনও কিছুটা নিওন; তৃতীয় স্তরে দেখবেন হিলিয়াম এবং চতুর্থ, বা, একেবারে বহিস্তরে হাইড্রোজেন।

একেবারে অভ্যন্তরীণ স্তরে অকসিজেন যখন পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন নক্ষত্রটি আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেলো। নক্ষত্রের সারা দেহের, বিশেষ করে, তার অগ্নিগহ্বরের তাপ কিন্তু আরও বাড়ছে।

লক্ষ্য করুন, তাপমাত্রা এখন উঠে গিয়েছে একশত কোটি ডিগরি পর্যন্ত। উঠে গেল দুইশত কোটি ডিগরি পর্যন্ত। এখন একবার লক্ষ্য করুন সেই অমিত শক্তিশালী চুল্লিটির দিকে যা নক্ষত্র নামে পরিচিত। যা ছিল হাইড্রোজেন, তা হয়ে গেল হিলিয়াম, হিলিয়াম হয়ে গেল ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম—এ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফসফরাস, সালফার, ক্লোরিন, আরগন, ক্যালসিয়াম— একই কড়াইয়ে এতগুলি পদার্থের রান্না চলছে!

তাপমাত্রা উঠে যাচ্ছে। ৫ শত কোটি ডিগরি। এবার দেখুন, ওঁরা এসেছেন : আরসেনিক, রূপা, টিন, বেরিয়াম, সোনা, প্ল্যাটিনাম, সীসা, ইউরেনিয়াম—পেঁয়াজের এক একটি খোসা, মানে, এক একটি পদার্থ। আদি হাইড্রোজেনের রূপান্তর বিভিন্ন তাপমাত্রায়। একটি সৃষ্টি করতে গিয়ে যে অন্যটি ধ্বংস হয়ে গেল তা নয়। তারা পাশাপাশি রইল নক্ষত্রের তাপ-বৈষম্য অনুযায়ী।

এবার আসুন স্বর্ণপিয়াসীরা, আর একটু এগিয়ে আসুন। বিস্ফোরণে ফেটে যাবার মুখে সেই নক্ষত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে যান। যদিও জানি, চার শত আলোকবর্ষের মধ্যে আসা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে, তথাপি চলে আসুন। এমন কত বিপদের সামনে আপনারা ছুটে গিয়েছেন সোনার খোঁজে। একটি ভিত্তিহীন গুজব শুনে আপনার কেমন পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলেন, সে ত আমি দেখেছি।• •

অবশেষে নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হল। তার গহ্বরের সব সোনা, সব এ্যালুমিনিয়াম, লোহা ও টিন ছড়িয়ে পড়ল মহাকাশের এক অতি-বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। এবার আরও এগিয়ে আসুন, মহাকাশ প্রাঙ্গণ থেকে সোনাদানা কুড়িয়ে নিয়ে যান। লোহা, ইউরেনিয়াম, রূপা, সোনা, প্ল্যাটিনাম—যা' খুসী, প্রাণ যা চায়, তাই নিয়ে যান। চারশত বছর আগে বৃষরাশিমণ্ডলে এমন একটি নক্ষত্রে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। আজও সে সমানে সোনাদানা ছড়িয়ে যাচ্ছে। চলে আসুন, মাত্র ৪ শত আলোকবর্ষ দূরে। মহাজাগতিক হিসাবে এই এপাড়া-ওপাড়া। এমনি কিছু দূরে নয়।

আচ্ছা এবার শুনুন, পৃথিবীর গর্ভে সোনাদানা ও নানা ধাতুর কাহিনী। বিস্ফোরিত নক্ষত্রের দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়া ওই গ্যাস-পুঞ্জ ও ধূলিকণা (silicon) মহাকাশের শীতলতায় জমাট বাঁধতে শুরু করল, গড়ে উঠল গ্রহগুলি। ওই সোনা, রূপা, টিন ও লোহা পেটে নিয়েই গড়ে উঠল আমাদের পৃথিবীও।

আমাদের ছায়াপথে এ ধরনের ঘটনা বর্তমানে খুবই বিরল। এক শত বছরে দু-একটির বেশী ঘটে না। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র রয়েছে উত্তরের আকাশে ছায়াপথ-নীহারিকা এ্যানড্রোমিডায়। প্রায় প্রতিদিনই সেখানে নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে এবং সেই সঙ্গে বুঝতেই পারছেন, সোনাদানা ছড়ানো চলছে অবিরাম। একটু সাহস ও সঙ্কল্পে ভর করে চলে যান সেখানে। মাত্র ১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে!

যাঁরা এটুকু ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক বা অশক্ত তাঁদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছেন। পরমাণুর অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন শক্তির প্রকাশ হচ্ছে পরমাণু বোমা, সে শক্তিরই নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হচ্ছে পরমাণু চুল্লী এবং সে চুল্লী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি।

হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন বা মিলন-শক্তির এক অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ আপনারা দেখেছেন হাইড্রোজেন বোমায়। কিন্তু সে শক্তির নিয়ন্ত্রিত রূপ যে কি হতে পারে, কীভাবে ওই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যায়, তা এখনও রয়েছে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে। কিন্তু এটা অনেক আগেই জানা গিয়েছে, এই শক্তি যেদিন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসবে, সেদিন এই প্রযুক্তিভিত্তিক সভ্যতা, তার শিল্প, তার অর্থনীতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে।

আগেই বলা হয়েছে সূর্য বা যে কোন নক্ষত্র তার গহ্বরে যেভাবে শক্তি (energy) সৃষ্টি করে, পৃথিবীতে তার অবিকল পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে হাইড্রোজেন বোমায়। সূর্য-গহ্বরে যে প্রচণ্ড তাপ রয়েছে সেই তাপ সৃষ্টি করা হল, (পরমাণু বোমা ফাটিয়ে) এবং সেই তাপে হাইড্রোজেন পরমাণুকে ঝালাই করে, অথবা বলতে পারেন, সংযোজন ঘটিয়ে তৈরি করা হল হিলিয়াম পরমাণু— যা'

অপেক্ষাকৃত ভারী। এই কাজ করতে গিয়ে ছাড়া পেয়ে গেল সেই পরিমাণ শক্তি যা পরমাণুর বিভাজন-জাত শক্তি থেকে হাজার হাজার গুণ বেশী এবং যে কোন অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ থেকে কোটিগুণ বেশী।

সূর্যের হাতে রয়েছে প্রচুর সময়,—সে এ কাজটি করতে পারে শত কোটি বছর সময় জুড়ে। কোন ব্যাপারেই তার তাড়া নেই। কিন্তু মানুষের হাতে এত দীর্ঘ সময় নেই। তাকে কাজটি সমাধা করতে হবে অল্প সময়ের মধ্যে। মানুষকে "শর্ট-কাট্" খুঁজতেই হবে। কৃত্রিম উপায়ে সে deuterium ও tritium তৈরি করে নিল। সাধারণ হাইড্রোজেন গোষ্ঠিরই অন্তর্ভুক্ত এর প্রথমটিতে রয়েছে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর 'ভর' এবং দ্বিতীয়টিতে রয়েছে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর 'ভর'। মানুষ ইচ্ছা করলে প্রয়োজনমতো এদের সঙ্গে আর একটি হাইড্রোজেনের 'ভর' সংযোজন বা 'ঝালাই' করে নিতে পারে। অর্থাৎ এই পরমাণু দুটিকে আরও "ভারী" করে নিতে পারে। কিন্তু, সেজন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড তাপ। পরমাণু বোমা ফাটিয়ে তাৎক্ষণিক তাপ সৃষ্টি করে এই সংযোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ব্যাপারটি করা হয়েছে মোটামুটি এইভাবে: deuterium বা tritium জড়ো করে তার মধ্যে একটি পরমাণু-বোমা ঢুকিয়ে রাখা হল। পরমাণু বোমাটি বিস্ফোরিত হওয়া মাত্র এত তাপ সৃষ্টি হল যে deuterium বা tritium স্তূপে আগুন জ্বলে উঠল। অধিক ভারী পরমাণু গড়তে গিয়ে তারা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। আমরা হাইড্রোজেন বোমা চিনলাম।

এমন বিস্ফোরণ ঘটল, যা মূল পরমাণু বোমার শক্তির তুলনায় হাজার হাজার গুণ বেশী শক্তি রাখে। প্রমাণ, তার ধ্বংসকার্য। এই শক্তিকে কি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যায় না? সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সামনে এটা এক অতি কঠিন প্রশ্ন।

এ নিয়ে গবেষণা চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জাপান এবং ভারতেও। কোন পথই কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না, যদিও সবাই জানেন পথ একটি খুঁজে পাওয়া যাবেই। প্রথমতঃ পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ মানুষের আজও জানা নেই—যে পদার্থের চুল্লি এক শত, দুই শত, তিন শত কোটি ডিগ্রি তাপ সহ্য করতে পারবে। সূর্য বা নক্ষত্ররা রয়েছে অনন্ত শূন্যতায়, তাই তাদের চুল্লী চালু করতে ওই সমস্যা আদৌ দেখা দেয়নি। আজ যখন মানুষ পৃথিবীতে "কৃত্রিম সূর্য" বা 'খোকা' সূর্য-সৃষ্টির কথা ভাবছে, তখন তার মনে প্রথম প্রশ্নটি হল কোন্ আধারে শুইয়ে রাখব খোকাকে।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, হাইড্রোজেন বোমা ফাটাতে পরমাণু বোমা ব্যবহার করেছি,—'খোকা সূর্য' সৃষ্টি করতেও কি আমরা তেমনই পরমাণু বোমা ফাটিয়ে চলব? মহাকাশে সূর্য বা নক্ষত্ররা পরস্পর থেকে এতদূরে রয়েছে যে তাদের কাছে এগুলি কোন সমস্যাই ছিল না। যাই হোক, সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে।

নিঃশব্দে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে এ ব্যাপারে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের চুক্তিও রয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা বলতেই হবে, কে কতটা এগোচ্ছেন বা এগিয়েছেন, তা জানার কোন উপায়ই নেই। কেন না, এ হবে এমন একটি আবিষ্কার বা উদ্ভাবন, যা মানব-সভ্যতাকে এক ধাক্কায় অনেক দূর এগিয়ে দেবে—যা বাষ্পীয় শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি বা পরমাণু শক্তি একযোগেও আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারে নি। বাস্তবিক, ওই একটি ব্যাপারের ওপর মানব-সভ্যতা তার সর্বস্ব পণ রেখে বসে আছে। হাইড্রোজেন পরমাণু কেবল ধ্বংস করে না, সৃষ্টিও করে—এটা প্রমাণিত হবে সেদিনেই যেদিন মানুষ এমন চুল্লী তৈরি করতে পারবে যা শত কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে এবং সেই

প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য পরমাণু বোমাকে ডেকে নিয়ে আসে না। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার কথা যতই বলা হোক না কেন, সবাই তাদের সব কথা প্রকাশ করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। এর সঙ্গে কৃতিত্ব · গৌরব অর্জনের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, তা থেকে নিজেকে সাবধে আনা সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানীরাও আমাদের মতোই মানুষ

প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় সংসদে জনৈক মাননীয় সদস্য এমন কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন যা তাঁর পক্ষে করা উচিত হয়নি। ব্যাপারটি অবশ্যই "গোপনীয়" তালিকাভুক্ত নয় এবং সব কিছু জানার অধিকার সংসদ-সদস্যদের রয়েছে। কিন্তু কাজ কতটা এগোচ্ছে, 'বিজ্ঞানীরা কোথায় এ কাজ করছেন, তাঁদের কাজের ফলাফল কি আশাপ্রদ'—ইত্যাদি প্রশ্ন এ ব্যাপারে না করাই উচিত। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য অসাধারণ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "কাজ চলছে এটাই জানি। আর কিছু জানি না।"

আমার শ্রোতারা আমাকে নিশ্চয়ই ভুল বুঝবেন না যে প্রশ্নটি নিয়ে পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীসমাজ ভাবছেন, তা' নিয়ে কেন আমরা গলা বাড়িয়ে কথা বলতে যাব? আমাদের একটু অসতর্কতায় তাঁরা প্রচণ্ড লাভবান হয়ে যেতে পারেন—এটা নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা।

কিন্তু কেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই একটি সাফল্যের পিছে তার সর্বস্ব পণ রেখে বসে আছে? কেন এই সম্ভাবনার সামনে আমরা রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়ে উঠছি? কেন না ওই যে একটু আগে deuterium-এর কথা বলা হল, তা রয়েছে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্রের প্রতিটি জলবিন্দুতে। "নিয়ন্ত্রিত তাপ পারমাণবিক সংযোজনে" (Controlled thermonuclear fusion) এই deuterium-কেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে হাইড্রোজেন বোমায়। মনে রাখবেন, যেদিন পৃথিবীর সমগ্র ফসিল

জ্বালানী (কয়লা, তেল ইত্যাদি) নিঃশেষিত হয়ে যাবে, সেদিন ওই জল-জ্বালানী ছাড়া কোন উপায়ই থাকছে না। জলবিন্দু থেকে ওই deuterium নিষ্কাশনের কায়দা ভারত রপ্ত করে ফেলেছে। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের "ভারী জলে"র কারখানাগুলি দেখে এসেছেন—"ভারী জল" মানে deuterium oxide—মানে, সেই জল, যাতে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি আরও বেশী ভারী।

সমুদ্রজলে রয়েছে অফুরন্ত জল-জ্বালানী—যে কোন দেশ, অবশ্য যদি তার প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকে—ওই জ্বালানী কুড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবে। মোট কথা, এই গ্রহে মানব-সভ্যতা ও প্রযুক্তির শেষ দিন পর্যন্ত শক্তি উৎপাদনের জন্য জ্বালানী সঙ্কট বলে কিছু থাকবে না।

'ভারী জলের' প্রয়োজন রয়েছে পরমাণু চুল্লীতেও। সেখানে moderator হিসাবে এর ব্যবহার—অর্থাৎ চুল্লী থেকে 'পলাতক' নিউট্রনকে আটকাবার জন্য এর প্রয়োজন হয়ে থাকে। আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি ভারতের প্রথম পরমাণু চুল্লীর দিনে ভারতকে বিদেশ থেকে ১২ কোটি টাকার এই জল আমদানি করতে হয়েছিল। এখন ভারত এ ব্যাপারে স্ব-নির্ভর। ওড়িশার তালচেরে আর একটি ভারী জলের কারখানা বসছে।

শ্রোতারা অবশ্যই বিস্মিত হবেন সভ্যতার আদিকাল থেকে এই গ্রহবাসীরা সর্বসাকুল্যে যে শক্তি বা energy ব্যবহার করেছে, তা এক ঘন কিলোমিটার সমুদ্র-জল থেকেই পাওয়া যেত। হয়নি এজন্য যে "প্রযুক্তির ওই আলাদীনের প্রদীপটি জ্বালানোর বিদ্যা" তার আয়ত্তে আসে নি। পারেনি এজন্য যে যন্ত্রাগারে একটি সূর্য দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যে সম্ভবপর, হাইড্রোজেন বোমা ফাটার আগে সে কথাটি সে বুঝতেই পারে নি।

স্বর্ণ-পিয়াসীরা নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠছেন। তাপ-পরমাণু

বিজ্ঞানের এসকল নিরস ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনাদেব মনে বিরক্তির সঞ্চার করছে। আচ্ছা, এবার আসুন।

যে নক্ষত্রকে আমরা দেখেছি মহাকাশে বিস্ফোরিত হয়ে যেতে (মনে রাখবেন, সূর্যও একটি নক্ষত্র), তাকেই নিয়ে এসেছি যন্ত্রাগারে। আমাব আয়ত্তের মধ্যে। "কৃত্রিম নক্ষত্র" তার দেহ বিদীর্ণ করে তাপ দিচ্ছে ; দিচ্ছে অন্তহীন বিদ্যুৎ-প্রবাহ। কিন্তু তার কাহিনী কি শেষ হল ? হাজার কোটি ডিগ্রি পর্যন্ত বিভিন্ন তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন কণিকা নিয়ে সে খেলছে—একটি কণিকাকেই শতবার শতরূপে হাজির করছে,—ঢেলে দিচ্ছে প্ল্যাটিনাম, ইউরেনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম—আরও কত কিছু ? "কৃত্রিম সূর্য", কিন্তু সে আপনাকে উপহাব দিচ্ছে 'নির্ভেজাল খাঁটি সোনা"—। স্বর্ণপিপাসুরা। সেই ভাবীকালে কৃত্রিম সূর্যের সামনে এক বালতি জল নিয়ে দাঁড়াবেন—বগলদাবা করে নিয়ে যাবেন একতাল সোনা !

অপরার বুকে স্বর্ণ-প্রাসাদে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে স্বর্ণ-রাজ আপনাদের এই স্বর্ণ কাহিনী শোনালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রাসাদের ছিদ্র পথে কি দেখছি ? এ যে আর এক নতুন উৎপাত। বোধ হয়, ওরা এসে পড়ল। পৃথিবীর স্বর্ণপিপাসুরা, বোধ হয়, রকেটে চড়ে এসে গিয়েছেন এবং কোথায় ওই স্বর্ণ-ভাণ্ডার রয়েছে, তাই খুঁজে দেখছেন। উঠলাম, সংকুচিত পায়ে, কেউ টের না পায় এমন ভাবে, সেই ছিদ্র পথের মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আকাশের দিকে তাকালাম। একের পর এক কয়েকটি নক্ষত্রকে চলে যেতে দেখলাম। ওরা নিরুপদ্রব। কিন্তু, বলা ত যায় না।

মস্তক থেকে স্বর্ণ মুকুট নামিয়ে দিলাম, খুলে ফেললাম স্বর্ণবাস,—স্বর্ণ-সিংহাসনটিও তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম সুড়ঙ্গে। বন্ধ করে দিলাম তার সংকীর্ণ দ্বার পথটি। স্বর্ণ-প্রাসাদে বন্দী করে রাখলাম স্বর্ণকে। উলঙ্গ রাজা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কক্ষে, কক্ষে,—প্রাচীরে প্রাচীরে স্পর্শ

রেখে যাচ্ছি। কথা বলছি তাদের কানে কানে। নিজের কান রেখেছি ওই ছিদ্র পথের দিকে, একখণ্ড হৃদয়ও রেখে দিয়েছি সযত্নে ওই অন্ধকার গুহা গহ্বরে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বাইরের ওই পর্বত গুহার পেছনের দিকটায় যেখানে অন্ধকার, সেখানে ত খুঁজে দেখা হয়নি। সেখানেও ত আরও কিছু সোনা থাকতে পারে। কত সহস্র কোটি বছর আগে যে নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিল, তার উদরের খানিকটা অংশ স্বর্ণরূপে লুকিয়ে থাকতে পারে ওই পার্বত্য গুহায়। খিলানে আঁটা সোনার কেল্লার দোরটি এক পাশে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চার দিকে দাঁড়িয়ে থাকা আলোক-স্তম্ভগুলিকে পায়ে মাড়িয়ে কৃষ্ণাঞ্চলকে আমার কঠিন হাসির হাতুড়ি মেরে ছুটে গেলাম পেছনের সেই পর্বত—উপত্যকার দিকে। আনতদেহ উলঙ্গ রাজা সোনার পাহাড় পিঠে তুলে নিয়ে আবার ঢুকলেন সেই প্রাসাদে, গেলেন সেই সুড়ঙ্গের কাছে, আরও সোনা বন্দী করে রাখলেন ওই অন্ধকার কারাকক্ষে। হাসলেন এক প্রচণ্ড কৃতিত্বের হাসি। তার প্রতিধ্বনিত রূপ আরও মধুর লাগল; সোনালি শব্দ কোনদিকেই বের হবার পথ পেল না, কক্ষে কক্ষে বিচরণ করে অশরীরী অবাস্তব সত্তা প্রবেশ করল কি ওই স্বর্ণগুহাতেই? সোনার তালগুলির সঙ্গে একই ভাবে অন্ধকারে বন্দী হয়ে থাকতে?

কিন্তু, ছিদ্র পথটিকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না কেন? প্রাচীরে প্রাচীরে খুঁজে কোথাও পেলাম না। প্রাসাদে ঢোকার পথে পায়ে পায়ে মাটির তেজস্ক্রিয় কণিকা গুলিকে সরিয়ে দিয়েছি নাকি?—এবং সরিয়ে দেয়ার ফলে সেখানে অন্ধকার। যদি তাই হয়ে থাকে, ছিদ্র পথের সামনে যদি কোন অন্ধকার নেমে থাকে, তবে আরও চমৎকার! দেখতে পাচ্ছি কোন ছিদ্রপথ নেই! কারো সুযোগ নেই এ প্রাসাদে প্রবেশের। নিরাপদ, নির্বিরোধ অস্তিত্ব। এ প্রাসাদ আমার, এই স্বর্ণসম্পদ আমার। আমি শুধু আমারই। আর কারোরই নই।

পৃথিবীর কত মাস, কত বছর, কত শতাব্দী চলে যাচ্ছে,—! আমি সেই প্রাসাদের প্রাচীরে প্রাচীরে স্পর্শ রেখে যাই, খিলানের উপর হাত বুলিয়ে আসি, প্রশস্ত ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকি, স্বর্ণসুড়ঙ্গের দোরে বসে কাটিয়ে দিই।

অকস্মাৎ এক অতি দীর্ঘ ডাক।

॥ "তুমি পৃথিবীর সন্তান" ॥

চমকে উঠলাম। কোথা থেকে, কোন দিক থেকে সে ডাক আসছে বুঝতে পারছি না। ওই একটা ডাক, মনে হল, নানা দিকে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। আবার সেখান থেকেই চলে এল এই প্রাসাদের দিকে। এই প্রাসাদকে জড়িয়ে ধরল। মনে পড়ল সর্বজ্ঞকে, মনে পড়ল রকেটটিকে, রকেটে যে সকল যন্ত্রপাতি রয়েছে, সেগুলিকে। ওরা সকলে মিলে চিৎকার করছে "তুমি পৃথিবীর সন্তান"।

ওরা কোন্ দিকে রয়েছে, কোথা থেকেই বা এই ডাক দিল তাও ধরতে পারছি না। কোন ছিদ্রপথে এই ডাক এখানে ঢুকল তাও বুঝতে পারছিনা।

প্রাসাদের দেয়ালে, দেয়ালে আমি ছিদ্রপথ খুঁজে যাই, প্রাচীরে প্রাচীরে আঘাত হেনে চলি; কিন্তু, পথ আমি খুঁজে পাইনা। এক সঙ্গে সকলে মিলে যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, "তুমি পৃথিবীর সন্তান", যদিও সময়ের পরিমিতি জানাবার একটি সংকেত মাত্র, একটি ঘণ্টাধ্বনি, বেশী কিছু নয়; তবুও এর মধ্যে শুনতে পেলাম আমি কতকগুলি নক্ষত্রের ডাক, কতকগুলি ছায়াপথের আহ্বান এবং সব চেয়ে অমোঘ, বা অব্যর্থ ভাবে যার গলাটি চিনে নিলাম সে আমার পৃথিবীর।

কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটে বেড়াই, শব্দটি কোন পথে এসেছে,

তা দেখতে দেয়ালে দেয়ালে হাতড়ে বেড়াই, চিৎকার করে উঠি। জানিয়ে দিই, হ্যাঁ, আমি চলে আসছি। চলে আসছি রকেটের মধ্যে, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সান্নিধ্যে, অথবা, সাইক্লোট্রনটির বিরাট দেহ ও বিপুল গতির সামনে। আমারই তৈরি প্রাসাদে আজ আমি বন্দী। বন্দী মুক্তি চায়, কিন্তু, সে পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। আরও আঘাত। প্রচণ্ড, প্রচণ্ডতর আঘাত। যে প্রাসাদ সে গড়ে তুলেছে, যে প্রাসাদের প্রতিটি ইষ্টক খণ্ডকে সে স্বেদ ও রক্ত দিয়ে গেঁথে তুলেছে, তুলেছে মমতা দিয়ে সে প্রাসাদকে সে ছিঁড়ে ফেলবে, উড়িয়ে দেবে খণ্ড খণ্ড করে।

হ্যাঁ, এই যে, এই যে একটু নড়ছে। মারো, আর এক লাথি; আর একটু নড়ছে। প্রচণ্ডভাবে মারো, নির্মম ভাবে। অনেক রক্ত দিয়ে ওকে গড়ে তোলা হয়েছে। এবার ভেঙ্গে ফেলতে দাও। দাও আরও অনেক, অনেক রক্ত।

এতদিনের বন্দী ছুটে যাবে মুক্তির জগতে; জীবনের বিপুল প্রগলভতায়; উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গায়িত জীবন কাহিনী শোনাতে শোনাতে।

অবশেষে ধ্বসে পড়ল সেই স্বর্ণ-প্রাসাদ। মাত্র একটুখানি, একটি ভগ্নাংশ মাত্র। আবার আঘাত হানলাম; প্রচণ্ড প্রতিশোধের ঘুঁষি মেরে উড়িয়ে দিলাম এক বিরাট অংশকে। হাঁ, সামনেই অসংখ্য নক্ষত্র, অপরার গ্যাসীয় আবরণের ফাঁকে ফাঁকে তাদের আমি দেখছি। তারাও দেখল, হেসে উঠল, অভ্যর্থনা জানাল। আমি ছুটছি সে দিকে যে দিকটায় রকেটটি দাঁড়িয়ে আছে। লাথির পর লাথি মেরে আলোক-স্তম্ভগুলি গুঁড়িয়ে দিয়ে রকেটটি যে দিকে রয়েছে সে দিকটি তাক্ করে আমি ছুটছি। সর্বজ্ঞকে চাই আমি; তাকে আমি জড়িয়ে ধরতে চাই, ভালবাসতে চাই। সে ডাক না দিলে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম বিচিত্রা রহস্যময়ীর কথা। ভুলে গিয়েছিলাম

আকাশ মহাকাশের কথা। আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমার পৃথিবীকেও।

পেছনে পড়ে রইল স্বর্ণ-প্রাসাদ, যুগ যুগ ধরে গড়ে তোলা স্বর্ণ-সভ্যতার প্রতীক। তার প্রতি আমার কোন মমতা নেই।

এক একবার পেছনের দিকে তাকিয়ে থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছি স্বর্ণ-প্রাসাদের দিকে, স্বর্ণ-উপত্যকার দিকে।

রকেটে ফিরে এলাম। সর্বজ্ঞ তার কটা রক্তবর্ণ বৈদ্যুতিক চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকাল। হয়তো আমার এই পদ-যাত্রা, কঠোর শ্রমে স্বর্ণ-প্রাসাদ গড়ে তোলা তার মোটেই পছন্দ হয়নি। হয়তো আমার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি তাকে নিদারুণ পীড়া দিয়েছে হয়তো সে জানতে চাইছে, কোথায় ছিলে এতকাল? কোথায় কাটিয়েছিলে?

হয়তো পৃথিবীর সময়ের মাপে এই ২৫ হাজার বছর ব্যাপী অনুপস্থিতিকালে সে কি কি দেখেছে, বা, কোন্ কোন্ নক্ষত্রমণ্ডল অতিক্রম করে এসেছে, সে কথাই সে আমাকে জানাতে চাইছে। জানাবার আগ্রহ থাকলে সে আমাকে জানিয়ে দিক কিন্তু, আমি কোন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি না একটি প্রাণহীন যন্ত্রের কাছে জবাবদিহি করতে আমি রাজি নই কিন্তু, অপরা এখন কোন নক্ষত্রমণ্ডলের পথ দিয়ে যাচ্ছে, সেটা যদি সর্বজ্ঞ আমাকে জানিয়ে দিতে পারত, ভাল হত আমি অবস্থাটি বুঝে নিতে পারতাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিভিশনের পর্দায় কতকগুলি নক্ষত্রের কালো বিন্দু জেগে উঠল। এমন কিছু জম-জমাট নক্ষত্র এলাকা নয়। বহু দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা কতকগুলি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র—সেই বিন্দুগুলি মুছে ফেলে 'অপরা' টেলিভিশনের পর্দায় আর একটি ছবি আঁকল, কমলা লেবুর ছবির মতো অনেকটা। দুইটি ছবি মিলিয়ে অর্থটি এই যে, এটা কোন সুপরিচিত নক্ষত্র মণ্ডল নয়। তবে নক্ষত্র গুলির

অবস্থান অনুযায়ী লাইন টেনে নিলে সেটা একটি কমলা লেবুর মত দেখাবে এবং সেটার নাম দেওয়া যেতে পারবে কমলা-মণ্ডল।

যন্ত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়; আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ছায়াপথের কতকগুলি নক্ষত্রের অবস্থান-মানচিত্র দেওয়া হয়েছে তার মস্তিষ্কে এবং বলে দেওয়া হয়েছে কোন নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবেশ করেই সে ওই মণ্ডলের নামটি মিলিয়ে দখে পদার ওপর তার ছবি ফেলবে। এই নির্দেশ দেওয়া রয়েছে কতকগুলি 'নিউরন' বা, "মস্তিষ্ক পরমাণুব" রাসায়নিক ভাষায় এর বাইবে পা ফেলার কোন ক্ষমতাই তাকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু, এই মাত্র সে একটি অ-চেনা নাক্ষত্রিক এলাকার নামকরণেব প্রস্তাব কবে বসল।

যে ভাবে বস্তু-পবমাণু ভাঙ্গে, অথবা, জীবন-কোষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে নতুন কোষ সৃষ্টি কবে, সে বকম কোন ক্ষমতাই "নিউরনের" নেই— মানুষের, বা, জীব-দেহের মস্তিষ্কে জীবনের প্রথম দিনে যে পরিমাণ নিউরন থাকে, মৃত্যুব দিনেও তাই থাকে। কোন অবস্থাতেই "নিউরন" অন্য নিউরন সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ, সর্বজ্ঞের এই ছবি আঁকার অর্থ, তাকে যতটা নিউরন দেওয়া হয়েছিল—প্রতিটি নিউরনে এক একটি বিশেষ কাজেব নির্দেশ—তাব অনেক বেশী সে তৈরি করে ফেলেছে।

আশঙ্কিত হলাম এই ভেবে যে সে আমাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। মস্তিষ্কের নিউবনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সে আমার চেয়েও মেধাবী হয়ে উঠতে পারে—এবং ক্রমশঃ সে আমাকে চালনা করার মতো সাহসও পেয়ে যেতে পারে। ঠিক বুঝতে পারছি না ইচ্ছা করলে এ মুহূর্তেই আমি নব উদ্গাত এই অঙ্কুরটি বিনাশ করতে পারি—কিন্তু, তারপর? আমি দাঁড়াব কোথায়?

তার চেয়ে আমি বরং দেখব একটি অঙ্কুরের বিকাশ, শাখায়

প্রশাখায় বিকশিত এক বিরাট বৃক্ষ। সে আমার প্রতিযোগী হবে, আমাকে পরাস্ত করবে এই আশঙ্কাই বা করব কেন? সে হোক্ আমার সহযোগী, সহায়ক, বন্ধু।

সর্বজ্ঞ পর্দার ওপর আর একটি ছবি তুলে ধরেছে—। একটি সংকীর্ণ, দীর্ঘায়ত, কালো রেখা। তার মধ্যে সামান্য দূরত্বে অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ দুটি বিন্দু। প্রতিযোগিতা করে একে অন্যের পেছনে ছুটে চলেছে, একটি অন্যটিকে পেছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে গেল। যেটি ছিল পেছনে সেটি আবার এগিয়ে গেল। মনে হচ্ছে একটি চমৎকার খেলা—এ খেলার অর্থ আমি বুঝি না। সর্বজ্ঞ যে কি বোঝাতে চাইছে, তাও ধরতে পারছি না।

হয়তো নতুন কিছু নিউরন আয়ত্ত করে সর্বজ্ঞ আমার সঙ্গে কৌতুক করছে। বাচ্চারা হাঁটতে শিখলে যেমন এদিকে-ওদিকে নিরর্থক ছুটে বেড়ায়, সর্বজ্ঞও সে ধরণের নিরর্থক কাজ নিয়ে ব্যস্ত না, এই ছবির কোন অর্থ নেই। এটা সর্বজ্ঞের মস্তিষ্ক-বিকৃতির প্রকাশ: মস্তিষ্ক থাকলে বিকৃতির সম্ভাবনাও থাকে।

এ কি পৃথিবীর ছায়াছবি? অথবা অন্য পৃথিবীর?

মীন মণ্ডলের ভেতর দিয়ে অপরা কেন যে এই পথটি বেছে নিল বুঝতে পারছি না। উল্লেখযোগ্য কোন নক্ষত্র নেই বললেই চলে, অধিকাংশই নিতান্তই সাধাসিধে ধরনের; মধ্যবিত্ত সম্পদও নেই বা সম্পদের জাঁকও নেই। পৃথিবী থেকে ছায়াপথের এই অঞ্চলটি কেমন যেন ধোঁয়াটে দেখায়। আপনারা নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন।

এখানে আপনাদের মনের একটি সম্ভাব্য খটকা দূর করা প্রয়োজন। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আমি পৃথিবী থেকে ১ শত আলোকবর্ষ দূরে গিয়েই আবার ৫০টি আলোকবর্ষ দূরত্ব থেকে কথা বলছি। এমন অবস্থাটি দাঁড়াত না যদি অপরা সহজ ও সরল পথে

ছুটত। সে চলছে অত্যন্ত বাঁকা, জটিল ও কুটিল পথে। যেখানে অভিকর্ষের কোন বিপদ নেই, থাকতে পারে না, সে পথটিই সে বেছে নিচ্ছে ঃ অনেকটা যেন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আলোকবর্ষের পর আলোকবর্ষ অতিক্রম করে যাওয়া। তাই এ মুহূর্তে যদি সে এক শত আলোক বর্ষ দূরে চলে যায় পরমুহূর্তেই আবার পৃথিবীর ৫০টি আলোকবর্ষের মধ্যে এসে যাচ্ছে। আবার পরমুহূর্তে দেখবেন, সে এক শত আলোক বর্ষ দূরে একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে তাক্ করে ছুটছে ও ছুটছেই।

যা বলছিলাম ঃ মীন মণ্ডলে যে সকল নক্ষত্র দেখছি তাদের মধ্যে একটিও শিশু বা কিশোরকে দেখতে পাচ্ছি না। সবাই প্রৌঢ়। তাদের পীতবর্ণ দেখেই তা বুঝছি এবং প্রায় সকলেই নিঃসঙ্গ। দুটি তিনটি, বা ততোধিক নক্ষত্রের জোট, যা আমি পেছনে অনেক দেখে এসেছি, তেমন একটি জোট এই এলাকায় দেখতে পাচ্ছি না। নিঃসঙ্গ নক্ষত্র দেখলেই সবজ্ঞ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার রেডিও টেলিস্কোপ, বেতার, ইনফ্রা-রেড টেলিস্কোপ, সব কিছু এক সঙ্গে চালু করে দেয়। এর কারণটি আমার জানা আছে। নিঃসঙ্গ নক্ষত্র দেখলেই তার মনে পড়ে সূর্যের কথা এবং সম্ভবতঃ মনে পড়ে পৃথিবীর কথা, পৃথিবীর জীবনের কথা। সে সর্বশক্তি দিয়ে আর একটি পৃথিবী খুঁজে বেড়ায় যেখানে জীবন রয়েছে। মুহুর্মুহু বেতার বার্তা পাঠিয়ে সম্ভবত নিদ্রিত গ্রহকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

মীন মণ্ডলে প্রবেশ করেই সে তা করতে শুরু করেছে। অসংখ্য বেতার তরঙ্গ যাচ্ছে, আসছে, তার মস্তিষ্কে সেগুলি লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আমি তার এই অর্থহীন তৎপরতার মধ্যে একটি মজা খুঁজে পেয়েছি। নক্ষত্রের পর নক্ষত্র সামনে আসছে, আবার পেছনে চলে যাচ্ছে। সর্বজ্ঞ সবার গায়ে আঁচড় কেটে চলেছে। অবশ্যই বেতার তরঙ্গের আঁচড়, কিন্তু, কেউ জবাব দিচ্ছেনা, কোন সাড়া শব্দ কোথাও থেকে আসছে না।

অবশেষে টেলিভিশনের ওপর এক বেতার তরঙ্গ লিপি! আমি লাফিয়ে উঠলাম। একটি প্রযুক্তি সমৃদ্ধ জীবন জগতের সন্ধান পাওয়া গেল নাকি?

তাকালাম সর্বজ্ঞের দিকে। তার চোখ দুটি কৃতিত্বের আনন্দে হাসছে। কিন্তু, কী নাম ওই নক্ষত্রের? নাক্ষত্রিক মানচিত্রের কোথায় রয়েছে ওই নিঃসঙ্গ আলোর দ্বীপটি।

আনন্দে উৎফুল্ল দুটি যান্ত্রিক চোখের দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্নের জবাব খুঁজি। টেলিভিশনের পর্দায় মীন মণ্ডলের মানচিত্র—তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি ত্রিকোণ আঁকা রয়েছে—। ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দুতে ওই গোলাকার চিহ্নটি।

মহাজাগতিক তরঙ্গ-দৈর্ঘে ঝাঁকে ঝাঁকে বেতার তরঙ্গ যাচ্ছে ওই নক্ষত্রের দিকে—অর্থাৎ ওই নক্ষত্রের প্রত্যাশিত জীবন-গ্রহের দিকে। পলকহীন চোখে আমরা দুজনেই তাকিয়ে রয়েছি ওই পর্দার দিকে। সম্ভাবিত জবাব আসবে ওই পর্দার ওপর।

জবাব পাওয়া মাত্রই আমি শুভেচ্ছা পাঠাব সেখানকার জীবনকে, প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ সভ্যতাকে, অথবা শ্রোতারা যদি অনুমতি দেন, সেখানকার মানব-গোষ্ঠীকে।

পৃথিবীর সময়ের মাপে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, কোন জবাবই নেই। এত অভিনন্দন পাঠানোর পরেও প্রত্যভিনন্দন নেই। অবশেষে একটি সংকেত এল, অথবা, বলতে পারেন, একটি তরঙ্গলিপি। কিন্তু, সেই তরঙ্গলিপির কোন অর্থই নেই আমার কাছে। অজানা গ্রহবাসীরা নিজেদের মধ্যে বার্তালাপের জন্য যে দীর্ঘ তরঙ্গের ব্যবহার করে তারই কয়েকটি তাদের অয়ন মণ্ডলের ছিদ্র পথের ফাঁক দিয়ে চলে এসেছে। তার বিশেষ কোন অর্থই নেই, আমার কাছে তার কোন তাৎপর্যই নেই। এ তাদের ঘরোয়া কথা, এর এখানে চলে আসার কোন কথাই ছিল না। অয়নমণ্ডলে প্রতিহত

হয়ে ফিরে যাবার কথা ছিল, কিন্তু, অয়নমণ্ডলের ছিদ্র পথ সামনে পেয়ে চলে এসেছে এখানে। মহাজাগতিক তরঙ্গ-দৈর্ঘের কোন খবরই ওরা রাখেনা। দুজনেই আমরা হতাশ হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তবুও সে নক্ষত্র জগতের সীমানা পার হয়ে আসার কালে তাদের আমরা ভুলিনি। মহাজাগতিক দৈর্ঘ্যে বেতারের তরঙ্গ লিপি ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি তাদের আকাশে। আশা করে বসে আছি, যদি তারা কোন দিন ওই তরঙ্গ লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারে তবে ভুলবেনা আমাদের কথা। যদি কোনদিন জবাব পাঠায় অর্থাৎ জবাব পাঠাবার মতো প্রযুক্তিতে উন্নতি তাদের ঘটে, তবে নিশ্চয়ই তারা জবাব পাঠাবে।

এক নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের রাজ্য সীমানা অতিক্রম করার কালে আমাদের দুজনের মনেই এই দুঃখ : দেখা হল, কিন্তু, কথা হল না।

সামনেই আর একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র। সবজ্ঞ যথারীতি বেতার আহ্বান পাঠাচ্ছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা করছে। কিন্তু, নিস্ফল। স্তরে স্তরে নিস্ফলতার ইতিহাস নিয়ে অপরা ছুটে চলেছে একাধিক আলোকবর্ষে বিস্তৃত এক গ্যাসীয় স্তূপের পাশ দিয়ে। এক অন্তহীন ও ক্লান্তিকর পর্যটন। কোথায় যে এর শেষ, বুঝতে পারছিনা।

সর্বজ্ঞ হাসছে অর্থাৎ, তার চোখ দুটি হাসছে। একটা কিছু যে মজার ব্যাপার সামনে আসছে এ তারই পূর্বাভাস। একটি যন্ত্র যে এমনভাবে অর্থপূর্ণ হাসবে, সেটা আমি সহ্য করতে পারব না। তার কাজের যে সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল আমি দেখছি, সে সীমানা সে লঙ্ঘন করছে। অনুভূতির দিক থেকে সে আমার সংগে পাল্লা দিতে চাইছে নাকি, ঠিক বুঝতে পারছিনা।

আপনারা মহাকাশ থেকে এই বেতার ভাষণ শুনছেন।

* * * * *

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন পথরেখা ধরে অপরা এগোচ্ছে। কোন্ সীমাতীত রহস্যের তটভূমিকে নিশানা করে সে ছুটে চলেছে তাও জানিনা। আর, পৃথিবী? সেখানে মাস, বর্ষ, শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সহস্রাব্দের চিহ্নলিপি অতিক্রম করে ছুটে চলেছে। যেতে যেতে আমাকে ডাকছে, আমি উন্মনা হয়ে উঠি, ফিরে তাকাই, কিন্তু কোথা থেকে ডাক আসছে, বুঝতে পারছি না। সমস্তটাই প্রহেলিকা, অপরার বুকে অন্তহীন গোধূলির মতোই ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

* * * * *

বাষ্প মেঘের ওপর একটি নক্ষত্র ভেসে উঠল। না, নক্ষত্র নয়, নক্ষত্রের ছবি। এ আলোকতরঙ্গ, চৌম্বক তরঙ্গ বা অভিকর্ষ তরঙ্গ, কিছুই বিকিরিত করছে না। অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ ধারণ করে একটি নক্ষত্রের ছবি ভেসে উঠল বাষ্প-মেঘের পটভূমিকায়। এ কি সেই ছায়া নক্ষত্র যাকে আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছিলাম ধনুরাশি মণ্ডলে এবং অন্যত্র? এর কথাই কি আমি শুনে এসেছিলাম Eddington-এর জবানীতে? সম্ভবত, তাই। ছায়ানক্ষত্র ছাড়া কেউ এমন কটা রক্তবর্ণ ধারণ করতে পারে না। একটি নক্ষত্রের ছবি নিয়ে আলোকরশ্মি একদা চলে গিয়েছিল ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমায়,— সেই পর্যটন পথে আকস্মিকভাবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মেঘবাষ্প। তাই, বাষ্পস্তূপের উপর নক্ষত্রের ছবি, একটির পরে একটি বিরতিহীন ধারাবাহিকতায় ফুটে উঠছে। বিস্মিত হচ্ছি, মুগ্ধ হচ্ছি। আমাদের ছায়াপথের কোথায় ছিল, বা এখনও রয়েছে ওই নক্ষত্রটি? কিছুই বুঝতে পারছি না। ছায়াটি প্রায় আমাদেরই সূর্যের মতন—তেমন বড় নয় আবার ছোটও নয়। মীন মণ্ডলের ওই মেঘ স্তূপের ওপর আমি আমাদের সূর্যের ছবিই কি দেখতে পাচ্ছি? হতে ও পারে, না ও হতে পারে। যদি সূর্যের ছবিই হয়, তবে পাঁচ দশ, এমন কি, · ৫শত কোটি বছর আগেকার

সূর্যের ছবিও হতে পারে। ছায়াছবির দৃশ্যের মতো কোন এক সূর্যের ছবির পর ছবি ভেসে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে—।

অপরা ছুটে চলেছে গ্যাসীয় পর্বতের সানুদেশের একটি সংকীর্ণ পথ দিয়ে। আবার ছবি……।

পৃথিবী, আমার পৃথিবী!

একটি অতি বৃহৎ গোলাকার গ্যাসপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছে—। দৃশ্যের পর সেই একই দৃশ্য। ছবির পর ছবিতে সেই একই কাহিনী লেখা।

গ্যাসপিণ্ড সঙ্কুচিত হতে হতে রূপ নিচ্ছে একটি গোলাকার বস্তুপিণ্ড—কিন্তু, তখনও প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছে—। তার দেহের উত্তাপ মহাকাশে এখনও ঢেলে দিচ্ছে।

চলছে সেই ছবি। ধারাবাহিক, বিরতিহীন পরিবর্তন। গ্যাসগুলি শীতল হচ্ছে, জল বিন্দুতে পরিবর্তিত হচ্ছে—দশ হাজার বা, বিশ হাজার বছর ধরে অবিরাম বর্ষণ।

চমকে উঠলাম। একি পৃথিবী? বিবর্তনের ইতিহাস মহাজাগতিক ছায়াচিত্রে? চার শত কোটি বছর আগে সেই আলোক-রশ্মি বেরিয়ে গিয়েছিল ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমায়, সে কি পথে আটক পড়ল ওই মীনরাশি মণ্ডলের বাষ্প-মেঘে? চিৎকার করে উঠলাম। জানালার পথে আকাশ মহাকাশ ছায়াপথকে জানিয়ে দিলাম; ওই যে পৃথিবী, আমার পৃথিবী। আবার, পেছনে ছুটে এসে সর্বজ্ঞকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে তাকে শিহরিত করে দিয়ে জানিয়ে দিলাম; ওই দেখো পৃথিবী; তোমার ও আমার পৃথিবী, চারশত কোটি বছর আগেকার অগ্নিপুঞ্জের পৃথিবী। সেই মানব যন্ত্রটির চোখেও সমান বিস্ময়! অথচ, ওই ছবি তার মস্তিষ্ক হয়েই ওখানে যাচ্ছে, টেলিভিশনের পর্দায়। আবার ছবি, অন্তহীন ধারাবাহিকতা।

বর্ষণশেষে সমুদ্র সৃষ্টি হল, আকাশে ভেসে চলল মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘে মেঘে বজ্র বিদ্যুৎ। জল, শুধু জল, অন্তহীন জলতট। দৃশ্যের পর দৃশ্যে শুধু জল! আর কিছু নেই। তারপর ধীরে ধীরে জেগে উঠছে তার ভূভাগ। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রান্তে দুই ফালি স্থলভূমি জেগে উঠেছে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে সেই দুটি স্থলভূমি প্রসারিত হচ্ছে বিষুবরেখার দিকে। একি পৃথিবী? ঠিক বুঝতে পারছিনা। যা ছিল অবয়বহীন তা অবয়ব পাচ্ছে—। কিন্তু এটা পৃথিবীর ছবি নাও হতে পারে।

আবার এক দৃশ্য। মহাদেশগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনও উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনও দক্ষিণ থেকে উত্তরে। ভেসে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। একটি মহাদেশ জুড়ে যাচ্ছে অন্য মহাদেশের সঙ্গে। আজ যা গড়ে তোলা হচ্ছে, কাল তা ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে।

আবার আর এক দৃশ্য। এ্যানডিস ও আল্‌স মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। পৃথিবী তখনও কাঁপছে, যে কাঁপন সুরু হয়েছিল তিন শত কোটি বছর আগে। ছায়াছবিতে সেই চঞ্চল, উদ্ভাসিত জীবনের কম্পন আসছে কিছুক্ষণ পরে পরেই।

পট পরিবর্তিত হচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে দুখানা শ্বেতবর্ণ তুষার-বস্ত্র নেমে আসছে বিষুবরেখার দিকে। আসছে, আসছে, পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে সেই কাহিনী। শুধু খানিকটা স্থল-ভাগ দেখা যাচ্ছে বিষুব রেখাতেই। সেখানে অরণ্যের উদ্ভব। পৃথিবীর বস্ত্রাঞ্চল শ্যামল। হ্যাঁ, এতদিনে, এতদিনে শিবালিক পর্বত দেখা যাচ্ছে—কিন্তু, ওদিকে ওই তুষারের মধ্যেও মাথা তুলে রয়েছে আজকের ইউরেশিয়া, ভূ-মধ্য সাগর, কারপেথিয়ান ও আলপসের শিখর।

কত কোটি বছরে পরিব্যাপ্ত ওই তুষার যুগের ছায়াচিত্র। ছবির পর ছবিতে সেই বিবর্ণ পুনরাবৃত্তি। অন্তহীন তুষার প্রান্তরে অতিকায় সরীসৃপ ও ম্যামথের দাপাদাপি দেখছি নাকি? ঠিক বুঝতে

পারছিনা—। কিন্তু, ওদিকে বাষ্প-মেঘস্তূপের সীমানা শেষ হয়ে গেল। ছায়াছবিও অপ্রত্যাশিতভাবে মুছে গেল। আলোকরশ্মির পিঠে চড়ে পরবর্তী ছবিগুলি কি চলে গেল ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমায়? একদিন তারা ওই ছবি নিয়ে যাবে পৃথিবীর আকাশে? সেখানে গিয়ে এই দীর্ঘ-যাত্রার পরিসমাপ্তি? হয়তো তাই। আবার তা নাও হতে পারে। ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমার পথে অন্য কোন বাষ্প-মেঘ যদি তাদের জন্য নিজের বুক পেতে দেয়? কে বলবে? কে বলতে পারে?

ধনুরাশি মণ্ডলে তন্ন তন্ন করে আমি খুঁজেছিলাম একটি ছায়ানক্ষত্র, সে খবর আপনাদের আমি আগেই বলেছি। সেখানকার 'মহাজাগতিক যাদুঘরে' বহু কাল আগে মৃত কোন নক্ষত্রের ছবি থাকতেও পারে: এই আশায় আমি সেখানকার প্রাচীরে প্রাচীরে চোখ রেখে এত দূর চলে এসেছি। মানে, এমন একটি নক্ষত্র, বা, তার সঙ্গী গ্রহদলকে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি যারা মরে গেছে অনেক কাল আগেই, কিন্তু তাদের আলোকতরঙ্গ বাহিত ছবি আজও ব্রহ্মাণ্ডময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তার মূল উৎসটি কোথায় ছিল, খুঁজে দেখছে। ধনুরাশি মণ্ডলে আমি তা পাই নি। পেলাম, মীন মণ্ডলে। একটি বাষ্প মেঘস্তূপের উপত্যকায় অপরার বুকে দাঁড়িয়ে।

অপরা এখন ওই মণ্ডলেরই আর একটি বাষ্প মেঘ উপত্যকার সানুদেশের পথ ধরে ছুটে চলছে। তার উপস্থিতি কেউ টের পাচ্ছে না—এমন কি, দূরবর্তী নক্ষত্র, বা, তাদের গ্রহগুলিও এই গোপন অভিসারের কোন সংবাদ রাখে না।

অপরা ছুটছে আর ছুটছে: উদ্দেশ্যহীন, বিভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন। দূরের বাষ্পমেঘে আবার ছবি: যতটা সম্ভব ঘাড় উঁচু করে, যতটা পারি দেখে নিচ্ছি। একি অন্য এক পৃথিবী? অন্য এক জীবন-কাহিনী আমাকে টেনে নিয়ে চলছে? ছবিগুলি অসম্পূর্ণ, ধারাবাহিকতার সম্পর্কহীন। এ দিয়ে আমি পুরো কাহিনী রচনা করতে

পারছি না, শূন্য পূরণের ক্ষমতা আমার নেই। ওই ত একটি পর্বতশৃঙ্গ, পাদদেশ নেই। অথবা, অরণ্য দেখছি একটা। শুধু তার তরুশীর্ষগুলিই আমার দেখার জন্য প্রতীক্ষা করছে। মোট কথা, সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে যা কিছু আলোকিত ছিল, তারই ছবি ওরা তুলে নিয়ে এসেছে—যেটুকু ঢাকা ছিল, অথবা, ছিল অন্ধকারে, তার কোন ছবি আসেনি। অন্ধকার অংশের নাগাল পায়নি সে। তাই গম্বুজ, প্রাসাদশীর্ষ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তার ভিত দেখতে পাচ্ছি না।

সমুদ্র! অতি প্রশস্ত জল সমতট। ছবির পর ছবিতে একই পুনরাবৃত্তি। সেই সমুদ্রে কয়েকটি কালো বিন্দু ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। জাহাজ নাকি? পৃথিবীতে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু হচ্ছে না কি? ঠিক বুঝতে পারছি না। ও কি দেখা যাচ্ছে মধ্য এশিয়া? না, কাস্পিয়ান সাগর? তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু, শিবালিককে (আধুনিক হিমালয়) আমি পরিষ্কার চিনতে পারছি একটি বাষ্প-মেঘের স্তূপের ওপর আর একটি বাষ্প-মেঘ—অথবা, কি যেন বলছিলাম, একটি বাষ্পীয় পর্বতমালার ওপর আর একটি পর্বত-মালা। সে আমার হিমালয়।

আবার পট পরিবর্তন। বাষ্প-মেঘের সীমানা শেষ হয়ে গিয়েছে। এর পরবর্তী ছবিগুলি কি চলে গেল সূর্যমণ্ডলের দিকে, মহাজগতে তাদের চক্রাকার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে? হতেও পারে।

সবজ্ঞের চোখে এখনও সেই পুলক। এধরনের পরবর্তী ছবিগুলির প্রত্যাশায় সে বসে আছে কি না, বুঝতে পারছিনা।

মহাসংগীতের স্বরলিপি :

মহাকাশ থেকে কথা বলছি আমি। মহাজাগতিক বেতার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আপনারা এই বেতার-ভাষণ শুনছেন। দ্রুত ছুটে-চলা উৎস থেকে বিকিরিত কোটি Mega Hertz বেতারতরঙ্গকে রিসিভারে

বন্দী করতে গিয়ে আপনাদের যে পদে পদে হোচট খেতে হচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় নেই।

টেলিসকোপের ফটোগ্রাফিক প্লেটে, রেডিও টেলিসকোপের ইলেকট্রনিক সংকেত, বিকিরিত একস্ রশ্মি, বা গামা রশ্মি, অথবা একটি বিপরীত কণিকা, সকলেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের কাছে এই জ্যোতিষ্ক জগতের ইতিহাস। মহাজগতের মহা-কাহিনী; এই পুঁথির অক্ষরগুলি স্তব্ধ, ও শীতল। তবুও আপনারা সেই মহাকাহিনী পড়েছেন। এই পড়া শুরু করেছেন বহু দিন আগে, যে দিনটি কাল কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। মহাজগতের স্তব্ধ, শীতল শিলালিপি, কিন্তু সেই শিলালিপি আসলে একটি মহাসংগীতের স্বরলিপি। সেই স্বরলিপির পাঠোদ্ধারের ক্ষমতা আমার নেই। তবুও চেষ্টা করছি। তবুও এখান থেকেই আমি সে কাহিনী শোনাচ্ছি আপনাদের।

মীন মণ্ডলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে অপরা। এখানেও একটি মহাজাগতিক 'যাদুঘর'—যা দেখেছিলাম ধনুরাশি মণ্ডলে এখানে রয়েছে 'পালশার', বা, স্পন্দনশীল নক্ষত্র; জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে-যাওয়া নক্ষত্র। এত ঘনীভূত তার দেহটি যে প্রতি ঘনইঞ্চির ওজন হবে শত কোটি টনেরও বেশী। অবিশ্বাস্য এক প্রচণ্ড গতিতে আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তিত হচ্ছে।

তারপর রয়েছে অন্ধকূপ, 'ব্ল্যাক হোল'—পালশারের চেয়েও বেশী ঘনীভূত। এত ঘনীভূত যে, এমন কি, তার নিজের আলোকরশ্মিও তার কব্জা থেকে বের হতে পারছে না। অমিত শক্তিশালী অভিশপ্ত জ্যোতিষ্কের দলকে চিরকাল অদৃশ্যই থাকতে হচ্ছে। এর কিছু কিছু আমি ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছি, আপনাদের হয়তো বলেছিও। দেখতে পাচ্ছি বিপুল দেহ গ্যাস ও ধূলির মেঘ-স্তূপ, নক্ষত্রের সূতিকাগার; আন্তর্নক্ষত্রলোকের কৃষ্ণবর্ণ শূন্যতায় ভাসমান জীবন-সৃজনের আদি কণিকা; দুই, বা, তিনের জুটি বাঁধা নক্ষত্র, বহু

আলোকবর্ষে বিস্তৃত কক্ষপথে কোটি বছরে এক এক বার আপন সংগীকে প্রদক্ষিণ করে আসছে।

দেখতে পাচ্ছি অন্য এক ছায়াপথ, সহস্র কোটি নক্ষত্র নিয়ে প্রচণ্ড ভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনিবেশগুলির এক একটি কোথায়, দূর দূরান্তে ভেসে চলে যাচ্ছে। কৃষ্ণবর্ণ শূন্যতায় আলোর দ্বীপপুঞ্জ, Shapley যাদের নাম দিয়েছেন Island universe, দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই এমন সহস্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড।

তারপর রয়েছে 'কোয়াশার', দেখতে নক্ষত্রের মতো, কিন্তু, শত কোটি সূর্যের সমবেত দীপ্তির চেয়েও বেশী দীপ্তিমান। ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম প্রান্তে, ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা চিহ্নে শ্বেতপতাকা নিয়ে প্রায় আলোকের সমান গতিতে আরও দূরে ছুটে চলে যাচ্ছে।

বিস্ময়ের বিস্ময় হচ্ছে এই কোয়াশার। বিজ্ঞানীরা যত বারই ওদের দিকে তাক্ করছেন, ততবারই পালিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, তারা এ মুহূর্তে ঠিক যেখানে রয়েছে, সেখানেই রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশেষ প্রান্তটি। কোয়াশার থেকে বেরিয়ে আসা দৃশ্য আলো ও বেতার তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বুঝে নিয়েছেন, আর এগোনো সম্ভবপর হবে না। তারা এসে গিয়েছেন ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমান্তে। এর ওদিকে আর কিছুই দেখার নেই। ব্রহ্মাণ্ডের এটিই হচ্ছে বহিঃপ্রান্ত, যেটি মহাকাশ-মহাকালের অখণ্ড-সত্তায় এমন একটি বিন্দু যেখান থেকে প্রবাহিত হচ্ছে কালস্রোত, যেখান থেকে শুরু হচ্ছে মহাকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের আদি মুহূর্তের আদি বিন্দু।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, জ্যোতিঃবিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির চিত্রটি মোটামুটি খুঁজে পেয়েছেন। কি ভাবে সৃষ্টি হল, বিবর্তনের কোন্ পথে এগিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান অবস্থায় পৌছুল, তার মোটামুটি একটি রেখাচিত্র আঁকা যেতে পারে। নক্ষত্রগুলির জন্ম হয় কি ভাবে, কি ভাবেই বা, তারা কৈশোর, যৌবন, ও বার্ধক্য অতিক্রম করে

অবশেষে আমাদের মতোই মারা যায়, তার একটি নির্ভরযোগ্য জীবনী রচনা আদৌ অসম্ভব নয়। অথবা, আমাদের চোখের সামনে আমাদের ওই ছায়াপথ—যা, আসলে ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রকোটি ছায়াপথের একটি—,Shapley একদিন যাকে ডেকেছিলেন "দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড" নামে—তাকে আজ আমরা আরও গভীরভাবে, নিবিড়ভাবে চিনে রাখতে পারছি।

এই সেদিনও, প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্রের দিকে তাকানোর জন্য আমাদের টেলিসকোপ ছাড়া কোন যন্ত্রই ছিলনা। কিন্তু দৃশ্য আলো সমগ্র বিদ্যুৎ-চৌম্বক বর্ণালির অতিসামান্য অংশই দখল করে রয়েছে। ওই বর্ণালির অবশিষ্ট ও বৃহৎ অংশই দখলে রয়েছে শক্তিশালী গামা রশ্মি থেকে শুরু করে বেতার তরঙ্গেরা। বিজ্ঞানীরা জানতেন, নক্ষত্ররা কেবল আলোক-তরঙ্গের ভাষাতেই কথা বলে না, তারা কথা বলে অন্য তরঙ্গের ভাষায়ও। কিন্তু, সে সকল ভাষার পাঠোদ্ধার করার মতো কোন যন্ত্রই তাদের হয়তো ছিল না। দীর্ঘকাল স্থায়ী এই অসহায়তার মুখে ১৯৩১ সালে Jansky দেখলেন তাঁর বেতার রিসিভারের আকাশ-তারে এমন কতকগুলি সংকেত আসছে, যাদের উৎস পৃথিবীতে নেই। শুরু হল বেতার—জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুগ। অর্থাৎ জ্যোতিষ্ক থেকে আসা বেতার-তরঙ্গকে বিশ্লেষণ করে সেই জ্যোতিষ্ক-জীবনের কাহিনী উদ্ধার করা।

কিন্তু, এ ছাড়াও নক্ষত্রের আরও কয়েকটি বিকিরণ-ভাষা রয়েছে, যেগুলি আসার পথে পৃথিবীর বায়ু মণ্ডল তাদের কেড়ে নিয়ে চলে যায়। একস রশ্মি, আলট্রা-ভায়লেট রশ্মি, ইনফ্রা-রেড রশ্মি, ইত্যাদির কথাই বলা হচ্ছে। এদের উদ্ধার করে আনতে হলে যেতে হবে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে, অথবা, বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে গিয়ে সেখানে বসে সে সকল ভাষার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। অপেক্ষা করতে হ'ল মহাকাশ যুগের আবির্ভাব পর্যন্ত।

একটু অন্যদিকে চোখ ফেরানো যাক। এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের দিকে। বস্তুর ক্ষুদ্রতম সত্তা কি হতে পারে, তা নিয়ে এক বিরাট সাধনাযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। Rutherford, Niels Bohr, Curie, Fermi এবং আরও অনেকে যখন পরমাণুর অভ্যন্তরীণ চিত্রটি আঁকার চেষ্টা করছেন, এবং যখন তা নিয়ে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক, সিদ্ধান্ত ও পাল্টা সিদ্ধান্তের লড়াই, অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যখন আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত, de Sitter আপেক্ষিকতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মাণ্ডের একটি গাণিতিক রূপ দেবার চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Hubble প্রচণ্ড গতিতে সেই আসর লক্ষ্য করে একটি "বোমা" ছুঁড়ে মারলেন: তাঁর নিজ চোখে দেখা একটি "ভয়ঙ্কর" সংবাদ। ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে: প্রতিটি জ্যোতিষ্ক, ছায়াপথ দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

প্রচণ্ড কলরবের সংগে প্রশ্ন উঠল: তবে কি আমরা রয়েছি এক ছন্ন-ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে? যে ব্রহ্মাণ্ড এগোচ্ছে অবলুপ্তির পথে? নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির আগে ছায়া-জগতের এক প্রান্ত দেশেই কি আমরা রয়েছি?

আপেক্ষিকতত্ত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে খটকা জাগল অনেকেরই মনে। সেখানে যে পরিষ্কার বলা হয়েছে The universe is finite, but unbounded.

আইনস্টাইন কিন্তু এক চুলও নড়লেন না। তিনি বললেন: যা বলেছি তা অভ্রান্ত। ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন গাণিতিক রূপ থাকতে পারে না।

Le-maitre আবির্ভূত হলেন তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের গাণিতিক চিত্র নিয়ে—আইনস্টাইন তত্ত্বের ভিত্তিতেই সামান্য অদল-বদল করে আর এক চেহারা।

ইউরোপে যখন এই কাণ্ড চলছে তখন Hubble এর কাছ থেকে

টেলিস্কোপটি নিয়ে Shapley তাকালেন মহাকাশের দিকে। বললেন, "তুমি যা' দেখেছ, ঠিকই দেখেছ। আমি দেখছি, দেখতে পাচ্ছি, মহাকাশের অনন্ত কৃষ্ণশূন্যতায় কতকগুলি আলোর দ্বীপ ভেসে চলেছে, প্রত্যেকটি দ্বীপ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড, দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডগুলি নিয়েই "ব্রহ্মাণ্ড"। এক আবর্তিত মহা-বিশ্ব, যার প্রতিটি অঙ্গই আবর্তিত হচ্ছে।"

এবার Hubble এর মুখেই তার দেখা ব্রহ্মাণ্ড চিত্রটির বিবরণ শুনে নিন। বিজ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্মাণ্ডের গাণিতিক চিত্রের মূল্য অনেক বেশী, কিন্তু তৎসত্ত্বে ও আমি সেগুলি এড়িয়েই যাচ্ছি। Hubble বলছেন. যতটা বুঝতে পারছি, ওর চেহারা একটি ফাঁপানো বেলুনের মতোই—মানে, সেই বেলুনে এখনও হাওয়া ভরতি করা হচ্ছে। ওই বেলুনের পিঠে যে কেউ দাঁড়াবেন, তিনি দেখতে পাবেন, অন্য সকলেই তাঁর কাছ থেকে দূরে দূরে চলে যাচ্ছে এবং যে যত বেশী দূরে রয়েছে, সে তত বেশী বেগে ছুটে পালাচ্ছে।

আমার শ্রোতারা অনুগ্রহ করে ধৈর্য্য হারাবেন না। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তত্ত্বের এক কঠিন জটিল ও শুষ্ক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আমি চলেছি। এ যে আমাদেরই বিশ্ব, আমাদেরই ছায়াপথ, আমাদেরই ব্রহ্মাণ্ড।

আপনারা হয়তো বলবেন. আমরা ভাড়া বাড়ির বাসিন্দা। দু'দিন থাকব, পছন্দমতো আর একটি বাড়ি পেলে উঠে যাব, জন্মান্তরে আমরা হ'ব অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা।

জবাবে আমি বলব, হাঁ, ভাড়া বাড়িই বটে কিন্তু. তাই ব'লে সে বাড়ির ইতিহাস জানবো না? বা, সেই বাড়ির পূর্বতন বাসিন্দাদের ছেলে মেয়েরা দেয়ালে যে আঁকিবুকি করে রেখে গিয়েছে তাও কি পড়ে দেখবো না?

জবাবে আপনি হয়তো ব'লে বসবেন: দু চার মাস আছি এ বাড়িতে, নতুন বাড়ি দেখে আবার চলে যাব। আঁকিবুকি দেখবেন আমার পরের ভাড়াটিয়ারা।

আমার জবাব : এ নিয়ে মোঁপাসার ছোট গল্পটি কি আপনি পড়েন নি? এক ভাড়াটিয়া, অবিবাহিত, ঘর নিলেন, কিন্তু ঘরণী নেই। দেয়ালে বাচ্চাদের আঁকিবুকি দেখে ভাবতে বসলেন, কেমন হতে পারে বাচ্চাগুলি : খুবই চালাক, ফুটফুটে চেহারা নিশ্চয়ই, অথবা, অসম্ভব দুষ্টু, ডানপিটে ছেলেমেয়েও হতে পারে। এই ছেলেমেয়েদের নিয়ে চিন্তা করতে করতে তাঁর প্রায় পাগলের মতো অবস্থা। কিন্তু, প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। তাই একদিন বেরিয়ে পড়লেন ওদের খোঁজে, কেমন চেহারা ওদের, মস্তান গোছের কেউ নাকি; সুন্দর, না কুৎসিত ইত্যাদি। তারপর যা হবার তাই হল, ভদ্রলোক এক সুবেশা, সুন্দরীকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এই যুবতীটি যে কে, তা আপনারা অনুমান করে নিন। আমি অসমাপ্ত কথায় ফিরে যাচ্ছি।

Hubble-এর কথামতো জ্যোতিঃবিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিলেন, ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রশ্ন দাঁড়াল : কিন্তু, সম্প্রসারিত হচ্ছে কেন? ১৯২৭ সালে Lemaitre তার কৈফিয়ৎ নিয়ে আসরে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, সুদূর অতীতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ জমাট ও কেন্দ্রীভূত ছিল একটি মহাপিণ্ডে (Super Atom)। সেই অতিকায় পিণ্ডটি হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে গেল এ সমস্ত পদার্থ চার দিকে প্রচণ্ড বেগে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, সেই পদার্থগুলি জমাট বেঁধে রূপ পেল ছায়াপথে, রূপ পেল নক্ষত্রের বিকাশে এবং পৃথিবীর ন্যায় গ্রহগুলি সৃষ্টির মধ্যে প্রথমদিনের সেই বিস্ফোরণ-বেগই ছায়াপথ ও অন্যান্য সকলকে আজও দূর থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এর নাম দেওয়া হল ঝনৎকার তত্ত্ব—"Big Bang" Theory। এর মোদ্দা কথা হল, অতীতের কোন এক মুহূর্তে এক আকস্মিক প্রচণ্ড "ঝনৎকার" দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড তার জীবন শুরু করেছে—এক আদি মহাপিণ্ডের বিস্ফোরণ দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড ইতিহাসের শুরু।

বিশ বছর অবাধে রাজত্ব করল এই তত্ত্ব। '৪৭ সালে দুইজন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী Bondi ও Gold অন্য তত্ত্বটি আবিষ্কার করলেন—ওদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন আর এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল। ঘোষণা করলেন ব্রহ্মাণ্ডের "স্থিতি-স্থাপকতা তত্ত্ব"। এঁদের বক্তব্য হল : ব্রহ্মাণ্ড কোন একটি মুহূর্তের বিস্ফোরণ দিয়ে তার জীবন শুরু করেনি। ব্রহ্মাণ্ডের এই সম্প্রসারণ অনন্ত কালে পরিব্যাপ্ত, হ্রাস বৃদ্ধিহীন রয়েছে এবং থাকবে এই গতিবেগ। যে সকল ছায়াপথ অনন্তে মিশে যাচ্ছে, তার স্থানে নতুন পদার্থ জন্ম নিচ্ছে, নতুন ছায়াপথ জেগে উঠছে। এঁদের মতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিও নেই, বিনাশও নেই। এক অবিনাশী সত্তার এক ক্ষণিক রূপই আমরা দেখছি : তার আদিও নেই : অন্তও নেই।

'প্রচণ্ড ঝনৎকার তত্ত্ব, ও স্থিতি-স্থাপকতার' তত্ত্বের সংঘর্ষ চলল আরোও প্রায় বিশ বছর। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই বললেন, "প্রচণ্ড ঝনৎকার দিয়ে যদি ব্রহ্মাণ্ড-জীবন শুরু হয়েই থাকে, তবে মহাজগতের কোথাও কি সেই বিস্ফোরণ কালের বিকিরণের অন্ততঃ কিছুটা খুঁজে পাওয়া যাবে না? সেই বিকিরণের দেখা মিলল, ১৯৬৫ সালে অতিকায় রেডিও টেলিস্কোপের তরঙ্গ আধারে। "স্থিতি-স্থাপকতা" তত্ত্ব একদিনেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল, মহাজগত থেকে এমন এক দুর্বল বেতার-সংকেত পাওয়া গেল যা এই আদি বিস্ফোরণের বার্তা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

"স্থিতি-স্থাপকতার" অন্যতম প্রধান প্রবক্তা Hoyle আত্মসমর্পণ করলেন। দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করলেন : মহাকাশ যে সকল কথা বলছে, তা শুনে এখন আর আমরা অবিনাশী অপরিবর্তনীয় চির-অস্তিত্বে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ডকে টেনে রাখতে পারছি না।

তা'হলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, এক দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড অন্য দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড

থেকে প্রতিমুহূর্তে দূরে চলে যাচ্ছে, এ পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি হবে? দুটি সম্ভাবনা অনুমান করা হচ্ছে।

এক, ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল সম্প্রসারিত হতে থাকবে, ছায়াপথগুলি একে অন্য থেকে দূরে চলে যেতে যেতে অনন্তে মিলিয়ে যাবে। দ্বিতীয়, এই সম্প্রসারণ গতি-বেগ ক্রমশঃ কমে আসবে, কমতে কমতে একদম বন্ধ হয়ে যাবে এবং অবশেষে সমস্ত ছায়াপথ নীহারিকা, নক্ষত্রমণ্ডল সংকুচিত হতে হতে আবার এক মহাপিণ্ডে এসে ঘনীভূত হয়ে আবার বিস্ফোরণ, অর্থাৎ সম্প্রসারণের প্রতীক্ষায় থাকবে। তবে কি আপনার আমার হৃদপিণ্ডের মতোই ব্রহ্মাণ্ড কি ক্রমিক পর্যায়ে সংকুচিত--প্রসারিত—সংকুচিত হতে থাকবে। অধিকাংশ জ্যোতি-বিজ্ঞানী বলছেন—হাঁ। তাই শুধু তফাত এই যে, আমাদের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন আমরা হিসাব করতে পারি মিনিট বা সেকেণ্ডের মাপে। কিন্তু এই মহাজগতের একটি মাত্র স্পন্দনে যে সময় লাগতে পারে, তা আমরা গাণিতিক হিসাবের মধ্যে আনতে পারছি না, বা. উপলব্ধি দিয়ে বিচার করতে পারছি না।

জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান ও ডঃ সাহা।

শ্রোতারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, স্বাতী সম্প ব্যভিচারের নানা অভিযোগ শুনে আমি বর্ণালি (spectroscope) দিয়ে তার দেহটি পরীক্ষা করে দেখতে এগিয়েছিলাম। এগিয়েছিলাম Russel এর সূত্র ধরে। সে সূত্র বলছে, কোন্ নক্ষত্রের দেহে স্বাভাবিকভাবে কোন্ পদার্থের প্রাধান্য থাকে, তার মোটামুটি একটি ছক রয়েছে। সেটার ব্যতিক্রম দেখলে বুঝতে হবে, অন্য নক্ষত্রের সংগে তার একটা মেলামেশা হয়েছে, যেটা সম্পূর্ণভাবেই অবৈধ! এবং সে জন্যই সেটা ব্যভিচারের পর্যায়ে পড়ে।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তত্ত্ব প্রসঙ্গেই এটা উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু, এটা Astrophysics, বা, জ্যোতি পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপার। মানে, বিজ্ঞানের সেই দূরবিস্তৃত শাখাটি যার মধ্যে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানও রয়েছে। অর্থাৎ, দুইয়ে মিলে একটি। পৃথিবীর পরমাণুর সংগে দূরতম নক্ষত্রলোকের এই সম্পর্কটির ব্যাপারে যাঁর কথা বিজ্ঞানীরা সর্বাগ্রে স্মরণ করেন, তিনি হচ্ছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। ১৯১৫ সালে Adams ও Kohlescutter দেখতে পান নক্ষত্রের উজ্জ্বল্যের সংগে তার বর্ণালির শোষণরেখার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু, কি যে সম্পর্ক, তা তাঁরা খুঁজে পেলেন না। ১৯২০ সালে ডঃ সাহা তাঁর Theory of thermal ionisation বা তাপ-অয়ন তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন, যার মধ্যে রয়েছে ওই প্রশ্নটির জবাব।— গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে তিনি বস্তুর আয়নিত অবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরিয়ে দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, জ্যোতিঃ পদার্থবিজ্ঞানের অভ্যুদয় সে দিনই ঘটল, যে দিন আসরে দেখা গেল ডঃ সাহাকে।

এর আগে Rutherford ও Bohr সে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু, সম্ভবতঃ পার্থিব পরমাণু নিয়ে অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় তাঁরা ওই পথটির দিকে ভাল করে তাকাতেই পারেন নি।

ডঃ সাহা দেখিয়ে দিলেন, কেবল মাত্র সূর্যদেহের প্রচণ্ড উত্তাপই তার দেহের পরমাণু-সংসারগুলি ভেঙ্গে দেয় না, নিম্নচাপও তা করতে পারে এবং করেও। কোথায়, কতটা এবং কি ভাবে তা করতে পারে তার নির্দেশ পরবর্তীকালে পাওয়া গেল তাঁর সমীকরণের মধ্যে। মোট কথা, বিজ্ঞানের এক বিরাট শাখার দোর খুলে দিলেন ডঃ সাহা ; যে শাখাটির নাম হচ্ছে জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান।

জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানের জনক ডঃ সাহা তাঁর জীবনকালেই এর বিরাট ব্যাপ্তি দেখে গিয়েছিলেন ; সম্ভবতঃ তিনি নিজেও এতটা আশা করেন নি। কিন্তু সেকথা এখন থাকুক।

খোলা দরজা পেয়ে সেখানে ঢুকে পড়লেন, Russel, Milne ও Fowler। আর ও কয়েকটি দোর খুলে দিলেন তাঁরা। সাহার সূত্র ধরে এগিয়ে গেলেন; বললেন, সাহা যেটাকে সৌর বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে এসেছেন, সেটা আসলে সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডলেরই বৈশিষ্ট্য। সাহার হাতে যেটা ছিল Solar, ওদের হাতে গিয়ে সেটা হল Stellar। পরবর্তীকালে ওই প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন Gamow, Burbunk-দম্পতি এবং অন্যরা।

সাহার সূত্র ধরে এগিয়ে গিয়ে আজ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ নক্ষত্রের বর্ণালি পরীক্ষা করে উষ্ণতা, বাষ্পের চাপ অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। তাদের দেহে কোন্ পদার্থের প্রাধান্য রয়েছে, বা, কোন্ পদার্থের রয়েছে ঘাটতি, তারও মোটামুটি আভাস পাওয়া গিয়েছে।

অন্য কারো সঙ্গে স্বাতীর কোন অবৈধ ক্রিয়া-কলাপ ঘটেছে কিনা, তা জানতে পারতাম আমি স্বাতীর দেহে বিশেষ পদার্থের প্রাচুর্য, বা, ঘাটতির হিসাব দেখেই। বর্ণালির রেখায় রেখায় তার চরিত্রলিপি পড়তে চেয়েছিলাম। তার সম্পর্কে যে নানা অভিযোগ!

অনন্ত সন্ধ্যার উপকূলে

এক অনন্ত সন্ধ্যার উপকূলে আমি বসে আছি একখণ্ড বিমর্ষ হাসি নিয়ে অপরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে ওই এক খণ্ড হাসি নিয়ে কবে যে তার জীবন শুরু করেছে, অথবা কবে তার জীবন শেষ করবে, কে তা বলতে পারবে?

এদিক থেকে সর্বজ্ঞ আমার চেয়ে অনেক বেশী সুখী, তার জীবনে এ সব প্রশ্ন নেই। কিন্তু, সমস্যা দেখা দেবে সেদিন যেদিন সে অপরার এই হাসির অর্থ বুঝবে, অথবা বলা যায়, যেদিন সে এটা উপভোগ করতে পারবে। সেদিন সে হয়ে উঠবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

অপরার ভালবাসার ক্ষেত্রে আমরা কি একে অন্যের প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠব? কিন্তু সে প্রশ্ন ভবিষ্যতের। আপাততঃ অপরা আমার, 'একান্তভাবেই আমার।

তার বুকে যে স্বর্ণ ভাণ্ডার আমি দেখেছি তার মধ্যে রয়েছে তার জীবনের ইতিহাস। আমি নিঃসন্দেহ যে, একটি বিস্ফোরিত অতিকায় নক্ষত্রের গ্যাস ও ধূলিস্তূপ জমাট বেঁধেই তার জীবন। ঠিক পৃথিবীরই মতো। পৃথিবীর গহ্বরে যে ভাবে সোনা সৃষ্টি হয়, ঠিক সে ভাবেই তার এই স্বর্ণ ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। নিকটে কোন সূর্য ছিল না। তাই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যেই তাকে জীবন কাটাতে হল। মহাকাশের হিমলোকে এমন এক দূরবর্তী স্থানে সে চিরকাল রয়ে গেল যেখানে কারও আকর্ষণ পৌঁছায় না।

মহাকাশে হয়তো এমন আরও অনেকে রয়েছে, কিন্তু তাদের কোন খোঁজ আমি এ যাবৎ পাইনি। অভিকর্ষ-মুক্ত এলাকায় এসে অপরা আপন বেগে ছুটে চলতে শুরু করল।

অথবা, এমনও হতে পারে, অপরা একটি মৃত পৃথিবী। হয়তো একদিন সে জীবন-সমৃদ্ধ ছিল, তার বুকের ওপর জীবনের বহু খেলা চলেছে যার কোন ইতিহাস সে রাখেনি, বা, রাখতে পারেনি। যদি একটি কঙ্কালও সে রাখত, অথবা, একটি তৃণখণ্ড, তবে আমি রেডিও-কারবন পদ্ধতি, বা, পটেশিয়াম-আরগন পদ্ধতি দিয়ে সেই জীবনের দিন লিপি লিখে ফেলতে পারতাম।

তার জীবনে তার সূর্যের মৃত্যু দেখে সে কি পালিয়ে এসেছে এই অন্ধকারে, শীতলতার রাজ্যে? সেই যে তার ইতিহাস শুরু হয়েছে, অন্তহীন যাযাবর জীবনের ইতিহাস, আজও তা সমানভাবেই চলেছে। একদিন আমার পৃথিবীর জীবনেও তা ঘটতে পারে। নিশ্চয়ই ঘটবে।

ক্ষুধার্ত সূর্যের মৃত্যু ঃ

সূর্যের মৃত্যু? হ্যাঁ, সূর্যের মৃত্যু। যা অবধারিত যা সুনিশ্চিত। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সূর্যের মৃত্যু-দৃশ্য, বা, তার মৃত্যু-যন্ত্রণার ভয়াবহতা কি ধরনের হতে পারে, ছায়াচিত্রের মতো তাই আমার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

এক হাজার কোটি বছর। এক হাজার কোটি বছর পরে সূর্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় ওই হিমলোকে গিয়ে দাঁড়ালাম। বার্ধক্যের প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়েছে সূর্য-দেহে। আয়তনে সে আরও বড় হয়ে উঠেছে। প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে মেদবৃদ্ধি ঘটায় তার গ্যাসীয় স্ফীত দেহ দিয়ে সে বুধ গ্রহকে ঢেকে ফেলেছে। আর অভ্যন্তরীণ অভিকর্ষ এত বেড়ে গিয়েছে যে তার চাপে হিলিয়াম পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে ভেতরের এক হাজার কোটি ডিগরি তাপ বহিস্তরকে আরও বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সূর্য আরও বড় হয়ে উঠেছে—লক্ষ, বা, কোটি গুণ বড় এক সূর্য পৃথিবীর আকাশে। কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা।

বুধকে সে আগেই গ্রাস করেছে। বুঝতে পারছি, এবার সে পৃথিবীকে গ্রাস করবে। কটা রক্তবর্ণ সূর্য পৃথিবীকে আপন অগ্নি গহ্বরে টেনে নেবার জন্য ধীরে ধীরে এগোচ্ছে—।

বুধ গ্রহকে টেনে নিয়েছে সে। কিন্তু, তার আরও চাই। তার ক্ষুধা মেটাবার মতো কিছুই পাচ্ছে না সে। তার নিজস্ব পরমাণু জ্বালানী নিঃশেষিত। ক্ষুধার্ত সূর্য তার বিস্তৃত সাম্রাজ্যে ক্ষুধার জ্বালায় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। উৎক্ষিপ্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হাত বাড়িয়ে টেনে নিল পৃথিবীকে, যে পৃথিবীকে সে দেড় হাজার কোটি বছর ধরে পালন করে এসেছে, স্নেহ দিয়েছে, তাপ দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, আজ এক মহাক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে সে খেয়ে ফেলল

সেই পৃথিবীকে। তার পেটে খাদ্য নেই, পরমাণু জ্বালানী নিঃশেষিত। একে একে সে খেয়ে ফেলল সব কয়টি সন্তানকে।

সূর্য সাম্রাজ্যের প্রান্তিক সীমানায় দাঁড়িয়ে এক হাজার কোটি বছর পরে আমি এই দৃশ্য দেখছি।

হাতড়ে বেড়াচ্ছে ওই ক্ষুধার্ত দানব। বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শেষ শস্যকণাটিও সে খেয়ে ফেলল। তার সাম্রাজ্যে এই অসহায় দুর্বল নিঃসঙ্গ গ্রহ প্লুটোও নেই।

খাদ্যের সন্ধানে সে চলে যেতে পারত নিকটবর্তী আলফা সেনটরির রাজ্যে। কিন্তু সে যে অনেক দূরে। ক্ষুধার্তের পক্ষে এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা সম্ভবপর নয়।

ক্ষুধার্ত মহাসূর্য আজ ক্ষুধার্ত পিশাচ। পিশাচ বিস্ফোরিত করে দিল নিজেকেই। নানা দিকে নানা অঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে সে খানিকটা হালকা হয়ে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাইল। তাও পারল না। ব্যর্থ হয়ে গেল। এবার আত্মসমর্পণ, বা, পলায়নের পালা। নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে দিয়ে পালিয়ে গেল অন্ধকারের শীতলতায়। সম্রাট হয়ে গেলেন ক্ষুধা ও দীনতার প্রতিমূর্তি। অনাহারে মৃত এক নাক্ষত্রিক কঙ্কালের অবশেষ রূপে মহাকাশের অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল সূর্য। আমাদের সূর্য।

অপরা কি এমন কোন সূর্যেরই দেহাবশেষ? মৃত নক্ষত্রের কঙ্কাল? হতে পারত। কিন্তু ওর দেহের তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা বলছে, না, তা নয়। জীবনের প্রথম দিন থেকেই সে মহাজাগতিক অন্ধকারের শীতলতায় কাটাচ্ছে। নইলে, তার ইতিহাস হত অন্য রকমের। তেজস্ক্রিয় ধূলিকণাগুলি থাকতই না। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

পৃথিবী! আমার পৃথিবী!

সূর্যের এই মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে আবার ফিরে এলাম নিথর সমুদ্র

তটে। এক অনন্ত সন্ধ্যার উপকূলে বসে পৃথিবীর দিকে তাকালাম। পঁচিশ কোটি বছর শেষের পৃথিবী। সে পৃথিবীতে আমি কি কোথাও আছি? নেই। কোথাও নেই। এমন কি, যারা আমার রক্তের হিমোগ্লোবিন কণিকা নিয়ে সেখানে এখনও বিচরণ করছেন তাঁদের মধ্যে আমি কোথাও নেই। তাঁদের কাছে আমি বিস্মৃত। এমন কি, অতীত যুগের একটি স্মৃতিকথাও নই।

চৃদিক থেকে এগিয়ে-আসা তুষার প্রস্তরের নিচে চাপা পড়া পৃথিবীর যেটুকু জীবনে বেঁচে আছে, তা হল ইউরেশিয়া, ভূমধ্যসাগর, আফ্রিকার একটি ফালি, দক্ষিণ আমেরিকার একটি নগণ্য অংশ।

পৃথিবীর জীবনে আবার তুষার যুগ। মলিন সূর্য তবু আকাশে এখনও ওঠে, আরও বহু কাল উঠবে, কিন্তু এই তুষার স্তূপের কাছে সে সূর্য অসহায়, সে সূর্য পরাস্ত।

এই আমার পৃথিবী। সে প্রতীক্ষা করছে আর একটি উষ্ণ অধ্যায়ের জন্য, প্রতীক্ষা করছে উষ্ণ জীবনের কলরবের জন্য, নতুন নতুন জীবনের আবির্ভাবের জন্য। একদিন যারা এসেছিল, তাদের পুনরাবির্ভাবের জন্যই তার প্রতীক্ষা।

অপরাহ্ণ বুকে, টেথিস সমুদ্রের তীরে অনন্ত সন্ধ্যার উপকূলে বসে আমি আজ আর একটি বেদনার্ত সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। পৃথিবীর জীবনে হিম যুগের সন্ধ্যা।

আরও কতকাল বসে সেই দৃশ্য দেখে চলতাম যদি না একটি কৃষ্ণবর্ণ নক্ষত্র দেখা দিত। মহাকাশে এদের সংখ্যা অনেক, কৃষ্ণবর্ণ এ সকল নক্ষত্র মহাকাশের অন্ধকারে দেখাই যায় না। হঠাৎ যদি কোন আকস্মিকতায় ওরা বাষ্পমেঘের পটভূমিকায় এসে উপস্থিত হয়, তবেই দেখা যায়। মনে হল, আমাকে দেখতেই সে ওখানে হাজির হয়েছে। তেজ বা দীপ্তি নেই, তবুও এরা তারা। কেননা, এদের সম্ভাবনা আছে, বুকে জ্বালানীও আছে। কিন্তু, পারমাণবিক বিক্রিয়া

এখনও শুরু করতে পারেনি। এরা মৃত নক্ষত্র নয়, বা, নক্ষত্রের কঙ্কালও নয়।

ক্রমশঃ দেখলাম একটি অতিকায় রক্তবর্ণ নক্ষত্রের ললাটে ওই কৃষ্ণবিন্দুটি শোভা পাচ্ছে। রক্তবর্ণ সন্ন্যাসীর কপালে কৃষ্ণ-তিলক! একের পর এক নক্ষত্র আসছে, প্রত্যেকের ললাটেই একটি করে কৃষ্ণ-তিলক।

বুঝলাম, অপরা এখন এমন এক নক্ষত্র রাজ্যের ভেতর দিয়ে চলেছে, যেখানে কৃষ্ণ—তারকাদেরই প্রাধান্য।

একটি ছায়াপথ, অন্য একটি দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড

কিন্তু, অকস্মাৎ এ-কী দেখছি আমি? অন্তহীন অন্ধকার ভেদ করে কি একটা যেন উঠে আসছে। ঠিক বুঝতে পারছি না। শ্বেত পদ্মের একটি পাপড়ি, অথবা, পাপড়ির একটি অংশ বিশেষ কেঁপে কেঁপে শূন্যতায় উঠে এল, যেন একখণ্ড প্রশান্ত হাসি। ঘাড় উঁচু করেও তেমন কিছু দেখা যায় না! তৎসত্ত্বেও ঘাড় উঁচু করে, দৃষ্টিকে যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে তাকাতে গেলাম। বুঝতে পারছি, এ কোন নীহারিকা, বা বাষ্প মেঘ নয়, কোন শান্ত শ্বেত নক্ষত্রও নয়। কিন্তু, দেখছি অতি সামান্যই। শ্বেতপদ্মের একটি পাপড়ি যেন মহাকাশে উঠতে গিয়ে অকস্মাৎ থেমে গেল।

সর্বজ্ঞের কাছে ব্যাপারটি বুঝতে চাইলাম, কিন্তু, সে কোন কিছুই বলতে পারল না। মনে হয়, ওটি এখন পর্যন্ত তার চোখেই পড়েনি। হয়ত বহু লক্ষ আলোক বর্ষের ওই শ্বেতপদ্মটির বেতার, বা, চুম্বক বার্তা এখনও তার কানে এসে বাজেনি, বা তার চৌম্বক টেপে সাড়া জাগায় নি।

আমি উন্মাদ, দিশাহারা হয়ে উঠলাম। ওই শ্বেতপদ্মের পাপড়ি আমাকে ডাকছে। মহাশূন্য আমার দৃষ্টিকে এমন ভাবে আড়াল করে

দাঁড়িয়ে রয়েছে যে প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদলের মাত্র একটি পাপড়িই আমি দেখতে পারছি।

সর্বজ্ঞকে কিছুমাত্র আভাস না দিয়েই আমি রকেট থেকে নেমে এলাম, নিথর সমুদ্রের তটভূমি বরাবর ছুটে চললাম। ওই সৌন্দর্যের সবটাই আমি দেখতে চাই। প্রয়োজন হলে মহাশৃঙ্গকে পরাভূত করেই। আমি বুঝতে পারছি, এ এক ধরনের দুষ্প্রবৃত্তি। মহাশৃঙ্গ যে কতটা উঁচু, বা, তার শিখরে ওঠার পথে যে অন্তরায় থাকতে পারে, সে কথা ভুলেই গেলাম।

সামনে রয়েছে, যাকে বলে, কিন্নর-মণ্ডল। আমি সে মণ্ডলের ছবি দেখতে পাচ্ছি—সে মণ্ডলকে অতিক্রম করে বহু দূরে সেই শ্বেতপদ্ম। মহাশৃঙ্গে উঠতে গেলাম, পা পিছলে গড়িয়ে পড়লাম। গোধূলি জগতের অস্পষ্টতার মধ্যে পাহাড়টি জড়িয়ে ধরতে গিয়ে সজোরে নিচে নিক্ষিপ্ত হলাম।

আবারও সে মহাশৃঙ্গের প্রস্তরখণ্ড ধরে উঠতে গেল, খানিকটা উঠলও বটে—কিন্তু, আবার গড়িয়ে পড়ল। রক্তাক্ত, ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত।

নিজের হাতে রক্ত বিন্দু। গোধূলি জগতের অস্পষ্টতায় সেগুলি কালো দেখাচ্ছে। কালো, চাপ চাপ রক্ত। রক্ত মানেই পৃথিবীর আদি সমুদ্রের ইতিহাস। প্রকৃতির সঙ্গে শতকোটি বছরের সংগ্রাম ও শান্তির ইতিহাস। সমুদ্রকে আমি নিয়ে যাচ্ছি পর্বত শৃঙ্গে। মানব বিবর্তনের আদি ইতিহাসে যদি সে সমুদ্রে না কাটাত, তবে তার দেহের রক্ত সৃষ্টি হত না।

আমার মধ্যে সেই আদি কাল ও আদিম বর্বরতা। সেই বর্বরকে আমি চিনি। এও আমি দেখেছি, একটি সৌন্দর্যকে উপভোগ করার হিংস্র প্রবৃত্তি স্বেচ্ছায় নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করার মধ্যেই চরিতার্থতার আভাস পেয়ে উন্মাদের মতো প্রস্তর স্তূপে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তাকেই সম্বল করে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্নর মণ্ডলের ওদিকে এখনও সেই শ্বেতপদ্ম জেগে রয়েছে।

মনে হচ্ছে, সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মহানায়ক রূপে আমি অদৃশ্য সোপান শ্রেণী হাতড়ে বেড়াচ্ছি শতকোটি বছর আগে সমুদ্রতলের অন্ধকার থেকে উপকূলের সূর্যালোকের দিকে উঠে আসার কালে জীব কোষগুলি যে সংগ্রাম করেছিল, প্রতিটি সোপানে দাঁড়িয়ে পরবর্তী সোপানটি খুঁজে নেওয়া, আমি তাই করে যাচ্ছি। আমি তাই শিখে এনেছি তাদের কাছ থেকে,—নিউক্লিক এসিডের রাসায়নিক সংকেতলিপিতে সেই নির্দেশটি কি আমার জন্য ছিল না?

স্তপরার গ্যাসীয় আবরণের সীমা অতিক্রম করে আমি অনেকটা উঠে এসেছি। এবার হয়তো শিখর স্পর্শ করব, ভাল করে তাকাব উত্তর মহাকাশের দিকে। নিচে মৃত্তিকা থেকে বিকিরিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের আলোর বিশেষ কিছুই এখানে এসে পৌঁছায় না। সীমাহীন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পর্বতটি আরও উঁচুতে মাথা তুলে রেখেছে। কিছুই দেখতে পারছি না, কিন্তু মনে হল, শিখর স্পর্শ করেছি। কিন্তু, ঠিক সে মুহূর্তেই পাথর ও শিলাখণ্ডের স্তূপ নিয়ে গড়িয়ে পড়লাম।

আমার বিশ্রাম নেই। চেষ্টায় বিরতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি সেই আদিকোষ, কোটি কোটি বছরের ইতিহাসের অন্ধকারে কেবলই শিলাখণ্ডে মাথা খুঁড়ে যুগে যুগে জীবনকে যে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। তাকে দিয়েছে বিচিত্র রূপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছে। সেই সংগ্রাম এখনও চলছে। জীবনের সীমিত পরিবেশের মধ্যে আমরা তা ধরতে পারি না। জীবন বিবর্তন কোন্ পথে চলছে, এক শত বছরের আয়ু দিয়ে তা বোঝা যায় নি, যাবে না।

আবার উঠলাম, অনেকটাই উঠলাম। ওপাশে নিপর সমুদ্র তার বর্ণ-তোরণের নিচে ঘুমোচ্ছে। গ্যাসীয় আবরণের নিচে বিচিত্র

সাজে দেখলাম অপরাকে! এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যতই উপরে উঠছি, ততই মহাশৃঙ্গও আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। প্রস্তর কঠিন অন্ধকারেরও যেন একটা বাস্তব সত্তা আমি উপলব্ধি করছি। মহাশৃঙ্গের সঙ্গে সেও হাত মিলিয়ে আমাকে পরাভূত ও বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু, আমি সে শ্বেতপদ্ম দেখবই, দেখব সেই চিরন্তন স্পন্দন, মহাবিশ্বের সংকোচন ও প্রসারণের অন্তহীন ইতিহাসের আমি সাক্ষী হতে চাই।

বহু দূরে রয়েছে পৃথিবী। বহু আলোক বর্ষ অতিক্রম করে সূর্য-সাম্রাজ্যের এক নগণ্য উপনিবেশের ততোধিক নগণ্য এক জীবন সত্তা আজ তার দর্পিত অহমিকায় মহাকাশ ও মহাকালকে স্পর্শ করতে চাইছে।

আপনারা কিন্নর-গুলের নিকটবর্তী এক অঞ্চল থেকে এই বেতার ভাষণ শুনছেন। শুনছেন, মহাশৃঙ্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন শিখর থেকে, যে শৃঙ্গের নাগাল সে এখনও পায়নি। পাবে কিনা, সে এখনও জানে না।

অন্ধকার, অন্ধকার, জমাট বাঁধা প্রস্তর অন্ধকার। নক্ষত্রবিরল এই অঞ্চল দিয়ে অপরা প্রায় আলোকের সমান গতিতেই ছুটে চলছে। আমি সংগ্রাম করছি, নিজেকে বহু শত ক্ষতবিক্ষত করে তুলছি। আর সেই সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড বিবর্তনের ইতিহাসটির পাতার পর পাতা আমার সামনে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। আদি কণা হাইড্রোজেনের ইতিকাহিনীর সামনে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার ইতিহাস সেই আদি মৌল-পরমাণুর ইতিহাস। অনন্ত ব্যাপ্ত শূন্যতার শীতলতা। তার মধ্যেই শূন্যতার সমুদ্রে বস্তু পরমাণুর সৃষ্টি। প্রশ্ন উঠতে পারে হাইড্রোজেন পরমাণুর সৃষ্টি করল কে? শূন্যতা থেকে পরমাণুর সৃষ্টি? আদি-কণা হাইড্রোজেন নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড জীবনের শুরু হ'ল, বুঝলাম। কিন্তু, তার আগে? এ প্রশ্নের কোন জবাব কেউ দিতে পারে

না। বিজ্ঞানীরা তা অকপটে স্বীকার করেন। যুগে যুগে দার্শনিকরা সেই অন্তহীন রহস্যের উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। কোন জবাব তাঁরা পেয়েছেন কিনা, তা আমার জানা নেই। আমি আদিও জানি না, অন্তও জানি না। জানি, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কাহিনীটি। আমি শুধু এক বিরাট রহস্যের মধ্যবর্তী অধ্যায়টির সামনে দাঁড়াতে পারি। আর কিছু পারি না।

প্রস্তর-কঠিন অন্ধকারের মধ্যে আমি মহাশৃঙ্গের শিখরটি হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমার চোখের সামনে শ্বেতপদ্মের একটি পাপড়ি, মনের সামনে এক মহা-ইতিহাস। এই দুইয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সংকেত লিপিতে লেখা এক মহা-ইতিহাসের পাতা একটির পর একটি খুলে যাচ্ছে। পড়ছি, কতকগুলি হাইড্রোজেন কণিকা মিলিত হল, সৃষ্টি হল নক্ষত্র। নক্ষত্রের জঠরে হাইড্রোজেন পরমাণুর আগুন জ্বলে উঠল। হাইড্রোজেন পরিবর্তিত হল হিলিয়ামে, হিলিয়াম পরিবর্তিত হল কারবনে···। এক মৌল পদার্থ থেকে অন্য মৌল পদার্থ। স্বর্ণ, লৌহ, ইউরেনিয়াম,—সমস্তই এক মৌল পদার্থ থেকে। আমি উঠ্‌ছি আর উঠ্‌ছি। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে সেই নক্ষত্র খান্ খান্ হয়ে গেল। সমস্ত ধাতু পদার্থগুলি নিয়ে গ্যাসপুঞ্জ ছড়িয়ে পড়ল। সেই খণ্ডগুলি জমাট বেঁধে মহাকাশের শীতলতায় রূপ পেল গ্রহরূপে। প্রতিটি গ্রহের ধাতুসম্পদ সৃষ্টি হল এ ভাবেই। পৃথিবীতে বা পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক জীবনে এমন একটি পদার্থ ও নেই,—যা মহাকাশে, বা, দূরবর্তী কোন বিলুপ্ত নক্ষত্রে একদা কাটিয়ে আসে নি।

আমি উঠে যাচ্ছি মহাশৃঙ্গের দিকে। কিন্তু, মহাশৃঙ্গও আমাকে ছলনা করেই আরও উপরে উঠে যাচ্ছে। যা বলছিলাম, মহাকাশের সে সকল সম্পদ নিয়েই পৃথিবী সৃষ্টি করল সমুদ্র এবং সমুদ্র সৃষ্টি করল

জীবন। জীবন ইতিহাসের শত কোটি বছরের কাহিনীটি আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। পৃথিবীর তরুলতা, অথবা জীবন বলতে যা কিছু বোঝায়, তার সমস্ত কিছুরই আদি ইতিহাস রয়েছে সমুদ্র জলে, সেখানকার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে একটি মাত্র কণিকা রূপে। একটি মাত্র কণিকা ভেঙে হল দুটি—দুটি ভেঙে চারটি—এ এমন একটি কণিকা যার রয়েছে স্মৃতিশক্তি, যে নিজের মতোই করে নিজের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে পারে প্রজাতি রূপে।

আমি তারই প্রজাতি। শত কোটি বছর আগে সমুদ্র-জলে আকস্মিকতার সৃষ্টি জীবকোষ। সংগ্রাম করে করে এগিয়েছে সে জীবকোষ, প্রতিটি মহীসোপানে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়েছে পরবর্তী সোপানের জন্য। সামুদ্রিক জীবনকে নির্মম ভাবে পালটে নিয়ে শুরু হল তার স্থলজীবন। আর এক মহীসোপান ধরেই আজ আমি উঠছি, উঠতে চাইছি আর এক অধ্যায়ের দিকে যেখান থেকে আমি দেখতে পাব একটি শ্বেত পদ্মকে। যে পদ্মটির ইশারায় আমি সব কিছু ভুলে গিয়েছি। ভুলে গিয়েছি সর্বজ্ঞকে। এবং আরও বিশেষ করে ভুলে গিয়েছি অপরাকে। মহাকাশে আমি শুধু একটি পাপড়িই দেখেছি : শ্বেত-সৌন্দর্যের সবটাই আমি দেখতে চাই। কেন না,

বেদাহম্‌ এতং পুরুষং মহান্তম্‌'

আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

আমি অন্ধকারের অতীত আদিত্য বর্ণ ওই মহান পুরুষকে জানতে চলেছি, যাঁর কাছে মৃত্যু বলতে কিছু নেই। পৃথিবীতে আমার মৃত্যু, সে একটি রূপান্তর মাত্র। একটি রাসায়নিক ভাষান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার দেহের সব কয়টি কণিকা থেকে যাচ্ছে পৃথিবীতে। হৃদপিণ্ড—যা আসলে একটি জটিল গঠন "কারবানিজেশন প্ল্যানট" মাত্র, প্রকৃতি তার সবগুলি "স্পেয়ার পারটস" খুলে নিয়ে মুক্ত করে দিচ্ছে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতিকে।

একটি কণিকাও পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। তারা থেকে যাবে বায়ুমণ্ডলে। নদী স্রোতে, মৃত্তিকা স্তরে। থাকবে বহু শত কোটি বছর ধরে, আমারই মতো আমার দেহ কণিকাগুলিও সূর্য প্রদক্ষিণ করবে, প্রদক্ষিণ করবে ছায়াপথও। সূর্যের মৃত্যুর দিনে অন্য সকলের সঙ্গে শীতলতায় তাদেরও অনন্ত নির্বাসন।

তারপর আর এক অধ্যায়, আমার জীবনের আর এক কাহিনী। ব্রহ্মাণ্ডের সংকোচনের দিনে ছায়াপথ নীহারিকা নক্ষত্র সূর্য পৃথিবী সমস্ত পরস্পরের কাছে চলে আসবে। ঘনীভূত হয়ে উঠবে এক মহাপিণ্ডে, বিজ্ঞানীরা অনেক ভেবে চিন্তে যার নাম দিয়েছেন "Super Atom"—অতিকায় মহাপিণ্ড। সেই মহাপিণ্ডে শত কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক নীহারিকার দেহ-কণার পাশে তারাও স্থান পাবে ব্রহ্মাণ্ড জীবনের পূর্ববর্তী অপর এক অধ্যায়ে যারা ছিল আমার মস্তিষ্কের-কঙ্কাল, অথবা, আমার দেহের যন্ত্র, অথবা, ছিল রক্ত কণিকা, প্রচণ্ড শক্তিধর সদাচঞ্চল: শিরায় শিরায় প্রবহমান। একটি নদী। অথবা, বলতে পারেন একটি সমুদ্র।

মহাশূন্যের সোপান ধরে উঠে চলেছি, ব্রহ্মাণ্ড-বিবর্তনের ইতিহাসের পাতাগুলি আপনা থেকে একটির পর একটি খুলে যাচ্ছে।

তারপর আর একদিনে সেই অমিত-ভর মহাপিণ্ড আপনাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে না পেরে বিস্ফারিত বিদীর্ণ হয়ে যাবে সৃষ্টি হবে ছায়াপথ, ছায়াপথের নক্ষত্র মণ্ডল—আদি হাইড্রোজেন হিলিয়াম গ্যাসরূপে শূন্যতায় ছড়িয়ে পড়বে।

ছায়াপথের কিন্নর মণ্ডলের প্রবেশ পথ থেকে আপনারা এই ধারাবিবরণী শুনতে পাচ্ছেন।

যা ছিল পৃথিবীর একটি জীবনের কণা, মহাপিণ্ডে-তা হয়ে উঠল আদিকণা হাইড্রোজেন। তার ভর কত, পারমাণবিক ওজনই বা কত, বা, তা থেকে কী ভাবে তেজোময় আলফা-কণা বেরিয়ে আসে,

এ মুহূর্তে, মহাপদ্ম দর্শনের ক্ষণটিতে, তা নিয়ে আমি কিছুই শুনতে চাই না এবং শোনাতেও চাই না।

মহাজগতের মহা-ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, হাইড্রোজেন রূপ পেল নাইট্রোজেন, কারবন, ও অক্সিজেনে—। এই তিন মিলে গড়ে তুলল অ্যামিনো এসিড। অথবা, বলতে পারেন, জীবনের মূল কণিকা। অথবা, এও বলতে পারেন, জড় রূপ পেল জীবনে। জীবন থেকে জড়, বা, জড় থেকে জীবন, সে শুধু রূপান্তর। সে শুধু এক বিস্ময়কর ভাবান্তর। একটি সীমানা লঙ্ঘন করে অন্য সীমানায় প্রবেশ। সেই মহাসৃষ্টির দিন থেকে, অথবা, বলতে পারেন অন্ধকারের গর্ভ থেকে আলোকের উঠে আসার দিন থেকে আমি কতবার যে এই সীমান্ত লঙ্ঘন করে চলে গিয়েছি, ফিরে এসেছি পূর্বাবস্থায়, তার কোন হিসাব কারো কাছেই নেই।

মহাশৃঙ্গের শিখর স্পর্শ করতে যাব, সেই সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াব, কিন্তু, তবিশ্বাসী ও হত গর্বিতদেহ আমাকে আবার ঠেলে নামিয়ে দিল। কিন্তু, আমি প্রমিথিউসের সন্তান। স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে আমি জগতে জগতে বিলিয়ে দিয়েছি পর্বতশৃঙ্গে শৃঙ্খলিত দেহ-ভার নিয়েও আমি চিরকাল সমুদ্র-সঙ্গীত শুনে এসেছি।

এখন, এখান থেকে, নিচের নিখর সমুদ্র কি দেখতে পাচ্ছি না, কৃষ্ণবর্ণের নিচে সে ঢাকা পড়েছে, ঢাকা পড়েছে অপরাও। মহাশৃঙ্গ সে যে কতকাল আগেই কৃষ্ণ-সাগরে ডুবে গিয়েছে বুঝছি, সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরছে। তৃষ্ণার্ত মানুষটি সে রক্ত অনায়াসেই পান করল আপন রক্ত, লবণাক্ত সমুদ্রের স্বাদ। মহাশৃঙ্গের শিখরে দাঁড়িয়ে আমি এক বিস্মৃত বিলুপ্ত মহাসমুদ্রের জল পান করে পরিতৃপ্ত হলাম। কিন্তু, হঠাৎ উত্তরে ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অন্ধকারের অপর প্রান্তে সেই শ্বেতপদ্মের পূর্ণ পাপড়িটি নিঃশব্দে হাসছে। ছায়াপথ-নীহারিকা

এ্যানড্রোমিডা ; অন্ধকারের মহাসমুদ্রে আর একটি দ্বীপ জগৎ, অন্য এক দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড।

রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত একটি মানব-কঙ্কাল মহাশৃঙ্গের শিখরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে শুধু 'এ্যানড্রোমিডাকেই' দেখছেনা, যে দিকেই সে তাকাচ্ছে অন্ধকারের মহাসমুদ্রে একটির পর একটি দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ড। সহস্রকোটি দল পদ্মের মতো বিকশিত। মহাকাশ মহাধারে ওই সহস্র কোটি দল মহাপদ্মের এক একটি পাপড়ি অন্ধকার থেকে উঠে এসেই দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। চঞ্চল, উৎক্ষিপ্ত, উদ্‌ভ্রান্ত মহাজগত বিস্ফারিত হয়ে ছুটছে, আরও ছুটছে—দিশেহারা, ক্ষিপ্ত। আমি তাকে আমার দৃষ্টির সামনে বেঁধে রাখতে পারছি না—লাল নীল ও সাদা পাপড়ি—এক একটি পাপড়িতে সহস্র-কোটি নক্ষত্রের ঝালর, শুধু ছড়িয়ে পড়ছে। বিশকোটি আলোক-বর্ষ দূরে 'সমুদ্র-সর্প' ছায়াপথ, সর্পাকৃতি-গঠন ওই দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড প্রশস্ত শয্যায় শায়িত ; তার পুচ্ছে চক্রাকৃতি আবর্তনশীল আর এক ছায়াপুঞ্জ,—নীল নক্ষত্রের এক মহাসমাবেশ। অন্য সকলের সঙ্গে সেও ভেসে চলেছে। অন্যদিকে ছায়াপথ 'ব্রহ্মার্তি'—ঋজু ও ক্ষীণদেহী জ্যোতিমেখলা সামান্য কয়েকটি নক্ষত্র নিয়ে এক বাষ্প জগৎ।

আরও দূরে চল্লিশ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে ছায়াপথ 'হোমাগ্নি'—ডিম্বাকৃতি এক অতি বিশাল আবর্তনশীল বলয় থেকে প্রতি মুহূর্তে লাল নীল নক্ষত্ররা ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিপুল বেগে আবর্তিত হচ্ছে এক পুষ্পবলয় এক হাজার কোটি আলোক-বর্ষে যার বিস্তৃতি।

বিশ লক্ষ আলোক-বর্ষব্যাপী অন্ধকার সমুদ্রের অপর তীর থেকে ছুটে আসছে ছায়াপথ 'বহ্নিরাজ'—হোমাগ্নির স্পর্শধন্য হতে চেয়েও পারছে না।

আমার সামনে সহস্র কোটি দল মহাপদ্ম ভেসে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে—। মনে হচ্ছে, আমি যেন এক আদি-অন্তহীন মহাসত্তার

সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সে আমার সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে, ঢেকে ফেলে আমার অস্তিত্বকেই মুছে ফেলল। সব কিছু কেড়ে নিয়ে সেই মহাবিশ্ব কি আর একবার নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠল?

আমি এখানে অবাঞ্ছিত এক আগন্তুক। তবুও চিৎকার করে, বিস্ফারণ-শীল মহাপদ্মের প্রতিটি পাপড়িকে আমার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—শোন, অমৃতের সন্তানেরা, এক কালাতীত অস্তিত্বের মধ্যে তোমাদের দেখে নিচ্ছি। 'আব্রহ্ম ভুবর্নলোকাঃ দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ"—শোন তোমরা, ওই মহাপদ্মের পাপড়িতে পাপড়িতে রয়েছে আমার জীবন ইতিহাস। কণা কণা রূপে কত কাল আমি অনন্ত ব্রহ্মলোকে ঘুরে বেড়িয়েছি। এক নক্ষত্রলোক থেকে অন্য নক্ষত্রলোকে; এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথে; আমি অনন্ত অন্ধকারের সমুদ্র কেটে বেড়িয়েছি। আমার দেহকে সমিধ করে তোমরা নক্ষত্রের বুকে আগুন জ্বালিয়েছ; কত জীবন-সমৃদ্ধ পৃথিবীতে আমাকেই তোমরা জীবনের আদিকণা রূপে ব্যবহার করেছ। বিশ্বাস হয় না? তবে দেখো, এই রক্তাঞ্জলি এনেছি তোমারই জন্য। মহাকাল মহাকাশ, এই ছায়াপথের এক গোপনচারীর বুকে বসে কত কাল ধরে তোমাকে দেখেছি আমি। তোমার সন্ধানে কত কোটি নক্ষত্রের কাছে তোমার পথ-পরিচয় জানতে চেয়েছি। আমি বৃদ্ধ তপস্বী মহাকালকে দেখে এসেছি তার বন্দীশালায়ঃ অরুন্ধতীর বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকিয়ে আমি কত কেঁদেছিঃ বিস্ফারিত নক্ষত্রের মৃত্যু-সভায় আমি ওই শ্বেত পদ্মটিই খুঁজেছি।

গ্রহণ কর এই রক্তাঞ্জলি। এই রক্ত কণিকা, হিমোগ্লোবিন, লোহা, কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন—এই ব্রহ্মাণ্ড থেকেই একদিন কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। তোমার হাতে এটা তুলে দেব বলেই আমি কত কাল ধরে নিখিলে বিচরণ করেছি। শোন ব্রহ্মলোক, যুগ থেকে

যুগান্তকাল অনন্ত জীবনে পরিক্রমা করে অবশেষে এই রক্তাঞ্জলি নিয়ে দাঁড়িয়েছি তোমার সামনে।

আপনারা মহাকাশ থেকে এই বেতার-ভাষণ শুনছেন। শুনছেন 'অপরা'র বুকে মহাশৃঙ্গের শিখর থেকে।

বদ্ধ অঞ্জলি ঊর্ধ্বপানে তুলে ধরে তাকালাম 'এ্যানড্রোমিডা'র দিকে। আমাদের ছায়াপথের সব চেয়ে নিকটে অন্য এক নীহারিকা-ছায়াপথ, অন্য এক দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড। আকৃতি অনেকটা আমাদের ছায়াপথেরই মতো। এতো সাদৃশ্য রয়েছে উভয়ের মধ্যে যে অন্য ছায়াপথবাসীরা অনায়াসেই ওদের যমজ বলে ধরে নেবেন। সর্পিল গঠন এই ছায়াপথে আমাদের ছায়াপথের মতো দশ হাজার কোটি নক্ষত্র—প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছে। তার পেছনে আরও, আরও ছায়াপথ। সকলকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রূপসী 'এ্যানড্রোমিডা'—কিন্তু তার পেছনেই আমি এক নীলবর্ণ ছায়াপথের নীল আঁচলটুকু দেখতে পাচ্ছি।

এখান থেকে আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি 'ম্যাগেলান মেঘ ছায়া'। নামে মেঘছায়া, আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ ছায়াপথ, অথবা আরও নির্ভুল করে বলতে হলে, উপ-ছায়াপথ। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ মেরুর আকাশে বরাবর এই ছায়াময়ীকে আপনারা দেখেছেন। একদা বহুকাল আগে—কত কাল আগে, সে প্রশ্নে বিজ্ঞানীরা একমত নন—সে ছিল আমাদেরই ছায়াপথে। তারপর সে আলাদা হয়ে যায় এবং উপ-ছায়াপথ হিসাবে আমাদের ছায়াপথ প্রদক্ষিণ শুরু করে। সংগে সংগে প্রতিদিনই সে দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে।

একটি কথা শুনে আপনারা বিশেষভাবেই পুলকিত হবেন। এখানেও দল বাঁধার রীতি রয়েছে। নির্দল ছায়াপথ এখানে দেখতেই পাচ্ছি না। আমাদের ছায়াপথ অন্য দশটি ছায়াপথকে নিয়ে বেশ শক্ত একটি দল বেঁধেছে। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন Local

Group—'মেগেলান' ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু দল ছাড়ছে না। বাস্তবিক তার দল ছাড়ার কোন উপায়ই নেই। 'ম্যাগেলান' যেমন দূরে চলে যাচ্ছে 'এ্যানড্রোমিডা' তেমনই আমাদের কাছে চলে আসছে—আসার গতিবেগও নেহাত কম নয়, সেকেণ্ডে আড়াই শত মাইল।

'এ্যানড্রোমিডা'র দিকে তাকিয়ে রইলাম। রূপসী তার সহস্র কোটি নক্ষত্রের মালা পরে হাসছে। শুধুই কি তাই? প্রতি মুহূর্তে তার দেহে একটি করে নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটছে,—পুরনো তারকার স্থলে নতুন তারা জন্মাচ্ছে—গ্যাসে গ্যাসে সে ছায়াময়ী এক রহস্য হয়ে উঠছে।

কিন্তু, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, আমি সেই ভাবীকালের দিকে তাকিয়ে আছি যখন 'এ্যানড্রোমিডা',—লাস্যময়ী বিক্ষিপ্তা আমাদের ছায়াপথের দ্বারদেশে এসে দাঁড়াবে কিন্তু হায়রে, ২০ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরত্ব অতিক্রম করে যেদিন সে পৃথিবীর উত্তর আকাশে গিয়ে দাঁড়াবে, সেদিন সূর্য নেই, পৃথিবী নেই,—আমাদের আজকের যৌবনদীপ্ত ছায়াপথ সেদিন একটি সংকীর্ণ গ্যাসীয় অস্তিত্ব। আমাদের ছায়াপথ তার সহস্র কোটি মৃত নক্ষত্রের শ্মশানশয্যা বুকে নিয়ে এক দীনতার ছবি।

কিন্তু, মহাশৃঙ্গের শিখরে দাঁড়িয়ে আমি কি দেখছি মহাকালকে? দেখছি, অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত আলোর বলয়গুলি প্রত্যেকেই আবর্তিত হচ্ছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কিসের তাড়নায় দূর থেকে দূরান্তরে ছুটে যাচ্ছে। কোন এক অদৃশ্য মহাশক্তি কি ওই আলোর বলয়গুলিকে অন্ধকার মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছে? ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার সামনে অন্ততঃ এক শত কোটি ছায়াপথ, অথবা বলতে পারেন এক শত কোটি মহাচক্র—যুগপৎ এক শত কোটি মহাচক্রের আবর্তন আমি দেখছি।

প্রতিটি মহাচক্রে কম করেও দশ হাজার কোটি নক্ষত্র, প্রতিটি নক্ষত্রের গড়পড়তা পাঁচটি করে গ্রহ . . . তথাপি কোন গ্রহে জীবন নেই ? সে জীবন, যাকে আমি চিনি, যাকে দেখেছি আমি যুগ যুগ ধরে,—তার কোন একটি ?

সেই এক গভীর তৃষ্ণা। অথবা বলতে পারেন, অনন্ত জিজ্ঞাসা। ছায়াপথে ছায়াপথে আমি অনন্তকাল কি কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াব ?

এদিকে দেখছি, ঝাঁকে ঝাঁকে আলোর দ্বীপগুলি মহাসমুদ্রে ভাসছে—অন্ধকার সমুদ্রে দ্বীপপুঞ্জগুলি ভেসে যাচ্ছে। তারা যাচ্ছে কি ব্রহ্মাণ্ডের শেষ প্রান্তের দিকেই ?

ব্রহ্মাণ্ড সীমান্তের দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলাম ব্রহ্মার্তির দিকেই। বিস্ফোরিত আদি মহাপিণ্ডে আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মার্তিকে জড়িয়ে ধরেই ছিল—অনেকদিন হাত ধরাধরি করে ছুটেছে ও—। ব্রহ্মার্তি কোন জবাব দিল না।

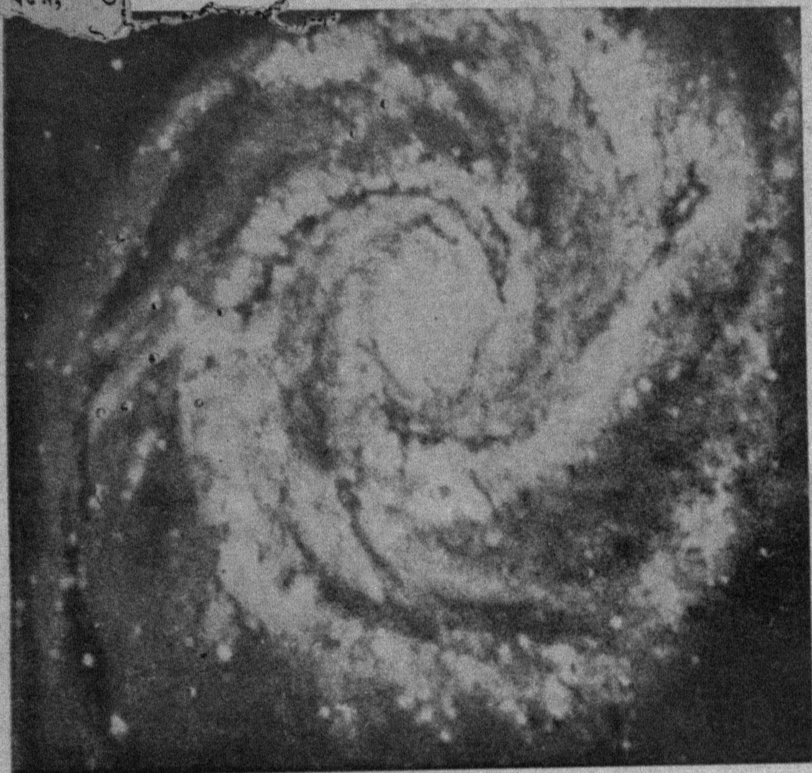
দশ হাজার আলোকবর্ষে বিস্তৃত আমাদের ছায়াপথ। এখানে দাঁড়িয়ে আরও দশগুণ বড় অন্য এক ছায়াপথ দেখতে পাচ্ছি। অতিকায় এক দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড, ছুটছে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে। শ্বেত পদ্মের একটি পাপড়ি চোখে পড়া মাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেল, সেখানে জেগে উঠল এক নীল বর্ণের দ্বীপপুঞ্জ—কী নাম ওই দ্বীপপুঞ্জের ? ঠিক মনে নেই। নীল পাপড়িটি ভেসে যাচ্ছে,—চলে যাচ্ছে দৃষ্টির অগোচরে। কি-যে এ সকলের অর্থ, বুঝি না।

আবার, পৃথিবী থেকে কন্যারাশি মণ্ডল যে দিকে দেখা যায় সেই পথ ধরে ৪ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে ছায়াপথের এক প্রকাণ্ড জোট। অথবা, বলতে পারি, এক গোছা ছায়াপথ, বিপুল বেগে ছুটে যাচ্ছে, যেন বাত্যাতাড়িত হয়ে। সেকেণ্ডে ৭৫০ মাইল বেগে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে এক বিরাট ছায়ালোককে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।



বহুদূরে মেগেলান মেঘছায়ার ওদিকে ঠিক এ দৃশ্যেরই পুনরাভিনয় চলছে। দুটি ছায়াপথ দুদিক থেকে পরস্পরের ঠোঁটের দিকে ঠোঁট এগিয়ে দিয়েছে—সেই স্পর্শবিন্দুতে পরস্পরকে ধ্বংস করে নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এমন লীলায়িত বিষচুম্বন মহাকাশে আর কোথাও দেখিনি (পৃষ্ঠা : ২২৯) ছবি : উইলসন পালোমার মানমন্দির।

নক্ষত্রের
নেই ?
ধরে,—তা



সমগ্র ছায়াপথটিকে একবার দেখে নিলাম। সর্পিল গঠন জ্যোতিঃ মেখলা আপন পুচ্ছ দিয়ে নিজের মস্তক স্পর্শ করতে চাইছে। দেখছি এক আবর্তনশীল মহাচক্র যার বহির্বৃত্ত জুড়ে রয়েছে ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র। এদের মধ্যে কোথায় আমার সূর্য? কোথায় পৃথিবী? কোন যন্ত্রগণক এই বিপুলতা ও বিশালতার মধ্যে আমাকে বলে দিতে পারবেনা কোথায় রয়েছে সূর্য, অথবা, কোন্ দিকে রয়েছে আমার পৃথিবী।

আরও দূরে ছায়াপথ সমুদ্র-সর্প। ছুটছে ৬৮ হাজার মাইল/সে। বেগে। যেন পলাতক প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। বন্ধনমুক্ত ছুটি মিলেছে জ্যোতি-সত্তা। য়াপথগুলিও

সমুদ্র সর্পঃ আসলে বহু ছায়াপথের একটি জোট। সর্পিল নীহারিকা-ছায়াপথ পরস্পরকে আলগোছে ধরে নিয়ে বাঁধা বিনুনির মতো বহু আলোকবর্ষে প্রসারিত দেহটি নিয়ে একটি মাত্র কুণ্ডল রচনা করেছে—যেন অতি বৃহৎ একটি অঙ্গুরীয়ের মধ্যে আরও সহস্র অঙ্গুরীয় আটক পড়ে কেবলই আবর্তিত হচ্ছে।

সকলেই ছুটে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, বিস্ফারিত হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একটি অতিকায় মহাপিণ্ডের বিস্ফোরণ" সকলকেই তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এক ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ অনস্তিত্বের মধ্যেই কি ব্রহ্মাণ্ডের পরিসমাপ্তি? তা হোক, কিন্তু তার আগে আমি এই বিকশিত মহাপদ্মটিকে স্পর্শ করতে চাই। আমি চাই সার্থক হতে। সূর্যলোক থেকে ছুটে এসেছি আমি শুধু এ জন্যই। ১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে নিকটতম পাপড়ি 'এ্যানড্রোমিডা'—এই দ্বীপব্রহ্মাণ্ডের দিকেই হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু···।

মহাজগতের একটি পিঞ্জর, নাম তার পৃথিবী। সে পিঞ্জরের কথা আমি ভুলেই গিয়েছি। একদা সেই পিঞ্জর থেকে একটি পাখি পালিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, সে মুক্তি পেয়েছে। সে বুঝতেই পারে নি মহাজগতের আর একটি পিঞ্জরে সে বন্দী হয়েছে। আজই সে জানল, অপরার অভিকর্ষ তাকে বেঁধে ফেলেছে। তার মুক্তি নেই।

ইতিমধ্যে তার কানে কানে মহাজগতের মহাসঙ্গীত, চরৈবেতি, চরৈবেতি—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। সে বুঝতেই পারছে না, সে কী করবে। চিরবন্দী চিরমুক্তির প্রত্যাশায় চিরকালই মহাকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—আজও আবার তাই দিল। নির্লিপ্ত, মহাজগতের কাছে এই কান্নার কোন অর্থ নেই।

নেই ? হঠাৎ কী হল ? পেছন থেকে এক প্রচণ্ড আলোর ঝটকা এসে ধরে,—অ্যানড্রোমিডাকে নয়, অন্য হাজার ছায়াপথ, আমাদের ছায়াপথের একেবারে দক্ষিণে কালপুরুষ নীহারিকাকেও আলোকিত করে তুলল ? একটি মুহূর্তে দশ হাজার আলোকবর্ষব্যাপী মহাকাশ আলোকে অবগাহন করে উঠল। নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ ? একটি অতিকায় নক্ষত্র ভেঙে চৌচির হয়ে গেল নাকি ? পেছনে তাকিয়ে দেখি সে এক অদ্ভুত, ভয়াবহ দৃশ্য। এক মহাজাগতিক মিলন বিচ্ছেদ, আসঙ্গ লিপ্সার চরিতার্থতা। চমকিত বিস্ময়ে হেসে উঠলাম। এ্যানড্রোমিডা থেকে অনেক দূরে প্রায় সমুদ্র-সর্পের কাছাকাছি এক ছায়াপথ-বিরল শূন্যতার সমুদ্রে, দুটি ছায়াপথ তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। লক্ষ আলোকবর্ষ-বিস্তৃত নাগ-নাগিনী পুচ্ছ দিয়ে একে অন্যকে বেষ্টন করে ফেলেছে এবং সে অবস্থাতেই ছুটে যাচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমান্তের দিকে। মহাশূন্য শিখরের অতল অন্ধকারে ডুবে থেকে আমি মহাজগতের এই মিথুন দৃশ্য দেখছি। পর মুহূর্তেই তারা একে অন্যকে ছেড়ে দিল, পরস্পর থেকে দূরে চলে গেল। ভাবখানা এই যে তারা যেন পরস্পরকে মোটেই চেনে না।

উভয়েরই দেহে কোটি নক্ষত্র ; এমনও হতে পারে, আরও বহু কোটি জীবন সমৃদ্ধ পৃথিবী নিয়েই তারা ভেসে চলছে। বিচিত্রবর্ণে সেজে উঠেছে নাগিনী,—প্রতিটি নক্ষত্রের বর্ণই স্বতন্ত্র লাল নীল শ্বেত ও লোহিত।

অন্যটির বিশেষ কোন সজ্জা নেই—শুধু কয়েক কোটি শ্বেত নক্ষত্র, মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত দীর্ঘরেখায় সাজানো। উভয়েরই কটি দেশে শ্বেতবর্ণ বাষ্প মেঘের আবরণ।

ওরা বেশী ক্ষণ দূরে থাকতে পারল না। ধীরে ধীরে কাছে চলে

গেল। পরম আগ্রহ করে রূপসীর বুকে মুখ গুঁজল তার সঙ্গীটি। হালকা বাষ্প বসন দিয়ে একে অন্যের সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলল, দুটি মিলে একটি হয়ে গেল। ভেসে চলল সে দিকেই যেদিকে অন্য ছায়াপথগুলিও ছুটে চলেছে।

মহাকাশের মিলন বিরহ কাহিনী এ ভাবেই শেষ হয়ে গেল ভেবে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু, পর মুহূর্তেই এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সহস্রকোটি নক্ষত্র যুগপৎ বিস্ফোরিত হয়ে ওই গ্যাসীয় আবরণ মহাকাশে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু. এতেও তাদের কাম-পিপাসা চরিতার্থ হল না। মহানাগিনী মহানাগকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে, তাকে আত্মস্থ করে ফেলে বিকট উল্লাসে নেচে বেড়াচ্ছে—এবং অবশেষে সেই গ্যাসীয় আবরণটি আবার কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে উভয়েরই সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলল।

আবার একটি মুহূর্ত। আবার একটি বিস্ফোরণ,—গ্যাসীয় আবরণ থেকে এবার বেরিয়ে এল প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ছায়াপথের দুটি কঙ্কাল আসঙ্গ লিপ্সা চরিতার্থ করে সর্বহারা, ক্লান্ত দু'টি কঙ্কাল—দুটি দ্বীপব্রহ্মাণ্ডের অবশেষ রূপে পড়ে রইল কয়েকটি অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের একটি ছোট্ট উপনিবেশ।

বহু-দূরে দক্ষিণে মেগেলান মেঘছায়ার ওদিকে ঠিক এ দৃশ্যেরই পুনরভিনয় চলছে এখন। দুটি ছায়াপথ দুদিক থেকে পরস্পরের ঠোঁটের দিকে ঠোঁট এগিয়ে দিয়েছে—সেই স্পর্শ-বিন্দুতে পরস্পরকে ধ্বংস করে নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এমন লীলায়িত বিষ-চুম্বন মহাকাশে আর কোথাও দেখিনি।

পেছনে আর এক দৃশ্য। এক ক্ষীণকায়া ছায়াসুন্দরীর দিকে চোখ রেখে বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে ছুটে আসছে এক অতিকায় ছায়াদানব, বিজ্ঞানীরা যাকে নাম দিয়েছেন Giant Gleaky—। ওই, দেখতে পাচ্ছি, আলোক-বর্ষ দূর থেকে সেই অতিকায় দানব ছায়া সুন্দরীর

ততোধিক সুন্দর কটিদেশের দিকে তার কঠিন, বর্বর ও নৃশংস প্রান্তিক বাহু এগিয়ে দিয়েছে। ছায়া সুন্দরী কাঁপছে। হয়তো বা, আর্তনাদ করছে। কিন্তু, আমার কানে তা পৌঁছচ্ছে না। আমি শুধু এক সুন্দরীকে তার কম্পমান অসহায়তার মধ্যে মহাকাশে শুধু আঁচড় কেটে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাকাশে ছায়াপথে ছায়াপথে এমন সংঘষ ঘটে থাকে এবং তা নিজ দলের মধ্যে ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। প্রতিটি নক্ষত্রের নিজস্ব চৌম্বক ও অভিকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে যখনই সংঘর্ষ ঘটে তখনই এক সঙ্গে কোটি কোটি নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে যায় এবং কেবল তাদের কঙ্কালগুলিকেই মহাকাশে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়।

বিজ্ঞানীরা যা-ই বলুন, দুই কামার্ত নগবাক্ষস তাদের আসঙ্গ লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য মহাকাশের নিভৃত কোণটি বেছে নিয়েছিল, কিন্তু, আমি সব দেখে ফেলেছি।

বিজ্ঞানীরা আরও বলবেন, আসলে তুমি ছায়াপথের মিলন বিচ্ছেদ আদৌ দেখনি। দেখেছ একটি গোটা ছায়পথের বিস্ফোরণ। আপন অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে না পেরে নক্ষত্ররা যে ভাবে ফেটে পড়ে, ঠিক সেভাবেই মাঝে মাঝে গোটা ছায়াপথ বিস্ফোরিত হয়ে যায়। এ ধরনের বিস্ফোরণের ফলে ছায়াপথ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, কিন্তু, পারস্পরিক অভিকর্ষ তাদের দূরে চলে যেতে দেয় না। অস্ত্রের টানে দূরে চলে গেলেও আবার তারা কাছে চলে আসে— পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

তাঁরা যাই বলুন, আমি দেখতে পাচ্ছি, মিথুনক্লান্ত দুটি কঙ্কাল আবার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। কী যে তারা পরস্পরের কাছে চাইছে, বুঝলাম না। শুধু দেখলাম, দুটি কঙ্কাল আবার পরস্পরকে গভীর আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল, কামার্ত বাসনার নিশ্চল

অভিব্যক্তির মধ্যে নিজেদের অবশিষ্ট কয়েকটি নক্ষত্রকেও পূর্ণাহুতি দিয়ে তারা মহাকাশ থেকে চিরদিনের জন্য মুছে গেল।

ব্রহ্মাণ্ডের শেষ প্রান্তে

ছায়াপথে-ছায়াপথে সংঘর্ষ দেখলাম। দেখলাম, দ্বীপ-ব্রহ্মাণ্ড অন্য দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডের গায়ে ঢলে পড়ে উভয়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আবার এও দেখলাম, দুটি কঙ্কাল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অসীম কৃষ্ণ-শূন্যতায় ভেসে চলে গেল।

মহাশূন্যের অন্ধকার শিখরে আমি বসে পড়লাম। এবার সত্যই আমি ক্লান্ত। আমারই ছায়াপথে অবিরাম সেই পুরোনো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলছে,— অত্যাচারী বৃদ্ধ নক্ষত্রের কপট তপস্যা, যৌবন-দৃপ্ত আর এক নক্ষত্রের অন্তর্বিলুপ্তি, নক্ষত্র-ভ্রূণদের দল বেঁধে ছুটে চলা,—সবই চলছে। মহাকালের এক রথচক্রের অন্তহীন আবর্তন শেষ হল, আর কিছুই আমার দেখার বাকি নেই। কিন্তু, তৃষ্ণা আমার মিটল না,—সেই অনন্ত তৃষ্ণা, যা আমাকে বেত্রাহত ছায়াপথের মতোই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। অতি বৃহৎ ছায়াপথ, নক্ষত্র, পৃথিবী, যাদের বলা হয় Macroscopic world, থেকে শুরু করে পরমাণু জগৎ, বা, Microscopic world.—সমস্তই যেন পেছনে কার প্ররোচনায় কেবল ছুটে বেড়াচ্ছে। কেবলই বলছে—'চরৈবেতি'—ছুটে চল, স্থির থেকো। বাস্তবিক এখানে আমার সামনে মহাজগৎ উন্মোচিত, সেখানে স্থির বলে কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

আবার ছায়াপথ যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়েছে, তারও অনেক দূরে, ন্যূনতম ১ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে ছায়ার মতো কি যেন একটা দেখতে পাচ্ছি। দূর থেকে সে আমাকে ইশারায় ডাকছে। তবে কি, ব্রহ্মাণ্ডের শেষ বলে ধরে

নিয়েছিলাম, তার মধ্যে প্রচণ্ড ভুল ছিল? আমি কি প্রতারিত হয়েছি?

খাড়া হয়ে দাঁড়ালাম। আকর্ণ হয়ে সে অতি দূরের ডাক শুনতে প্রস্তুত হলাম। ওই বিকশিত মহাপদ্মের ওধারে আর একটি ছায়াজগৎ? ঠিক বুঝতে পারলাম না। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন Quasi stellar Radio Source, 'কোয়াশার' বা নক্ষত্র নক্ষত্র-প্রতিম বেতার উৎস। ১৯৬১ সালে প্রান্তিক ছায়াপথ থেকেও অনেক দূরে এই ডাক শোনা গিয়েছিল।

তাকিয়ে রইলাম ওদিকে। নক্ষত্রও নয়, নীহারিকা নয় ছায়াপথও নয়, উভয়ের মিলিত একটি সত্তা। কিন্তু, এরাও ছুটছে—। প্রায় আলোকের সমান গতিতে (প্রতি সেকেনডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) দূর থেকে আরও দূরে ছুটে যাচ্ছে। একটি, বা, দুটি নয়, পলকের মধ্যে কয়েক শত কোয়াশার চোখের উপর ভেসে উঠে আবার পালিয়ে গেল—। এক একটি কোয়াশার দল লক্ষ কোটি সূর্যের সমান শক্তি ছিটিয়ে দিয়ে বিপুল বেগে পালিয়ে যাচ্ছে আমার সামনে থেকেই।

মহাশৃঙ্গের শিখরে এক অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এক বিরাট রহস্যের প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরছি—।

ওদের ডাক দেখে মনে হচ্ছে, ওরা এ জগতের, ছায়াপথের বা, এই ব্রহ্মাণ্ডের কেউ নয়। এক একটি কোয়াশারের আয়তন মহাজাগতিক হিসাবে অতি নগণ্য, একটি আলোকবর্ষেরও কম, অথচ শতটি ছায়াপথের সম্মিলিত তাপ ও বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, তারা সম্পাদিত হচ্ছে, স্পন্দনশীল নক্ষত্র, বা, পালশার-এরই মতো। ফলে ওই বিকিরিত শক্তি আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে, একটির পর একটি তরঙ্গে। এক অতি বিস্তীর্ণ চৌম্বক ক্ষেত্রে অতি দ্রুতগতি ইলেকট্রনই কি এই কাজ করছে? অথবা, এক অতি প্রচণ্ড নাক্ষত্রিক

বিস্ফোরণই কি এই অতি দ্রুত বিচরণশীল নক্ষত্র সৃষ্টি করে চলেছে? থাক, এ সকল জটিল প্রশ্ন। আমি ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে পাচ্ছি, এক ছুটে চলা উদ্‌ভ্রান্ত সত্তা। যেন নিজেকে নিজের মধ্যে রাখতে না পেরে কেবলই ছুটছে। অথবা, এক মহাস্পন্দন। আমার হৃদ্‌পিণ্ড থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রোটন, ইলেকট্রন, প্রতিটি ছায়াপথ, ছায়াপথের প্রতিটি নক্ষত্র, অথবা, ওই দূরান্তের কোয়াশার, সব কিছুই স্পন্দিত ঠিক বুঝতে পারছি না।

অথবা, গ্রীক দার্শনিকদের ভাষায়, এ এক সর্বব্যাপক মহাসংগতি সর্ব উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে যে রেখেছে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। কিছুই বুঝতে পারছিনা। বোধাতীত অস্তিত্বে বিস্ফোরণ-সংকোচনের মহাইতিহাসের দর্শক আমি।

আবার পট পরিবর্তন। তিনটি কোয়াশার দেখতে পাচ্ছি (3c 48 . 3c 196 : 3c 273) প্রত্যেকেরই একটি করে আলোকোজ্জ্বল পুচ্ছ,—দুই থেকে তিন লক্ষ আলোকবর্ষ ছড়িয়ে থাকা পুচ্ছগুলি কখনও কখনও মূল দেহের সামনে চলে আসছে, আবার পর মুহূর্তেই পেছনে চলে যাচ্ছে

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। পুচ্ছের দৈর্ঘ্য হিসাব করে জানা গেল, এ সকল কোয়াশারের বয়স তিন লক্ষ বছরের বেশী হবে না।

তিন লক্ষ বছর! তিন লক্ষ বছর আগে সেই দিনটিতে মানুষ পৃথিবীতে এসে গিয়েছে,—পৃথিবীর বুকে খাড়া হয়ে চলতেও তারা শিখেছে— কঙ্কালে কঙ্কালে তাদের ইতিবৃত্ত আমি পড়েছি; আমার আদি পিতার সামনেই ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম প্রান্তে কোয়াশার জন্ম নিয়েছে—তিনি তা দেখেন নি। অথবা, দেখলেও মহাজাগতিক বিবর্তনের কাহিনীটি তিনি বুঝতেই পারেন নি।

তবুও আমি সেদিন ছিলাম, আদি জননীর জরায়ুতে তন্দ্রাচ্ছন্ন

আমি কোয়াশারের জন্মবার্তা শুনে এসেছি—। মানুষের প্রজ্ঞা মেধার সৃষ্টি হয়েছিল তিন লক্ষ বছরেরও আগে। সম্ভবতঃ একটি মাত্র "নিউট্রন" কণিকা দিয়েই তার প্রথম আবির্ভাব, পুরো ইতিহাস আমার জানা নেই। আমি দেখছি, ওই দূরান্তে, ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমান্তে একটির পর একটি কোয়াশার ভেসে উঠছে। পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ব্রহ্মাণ্ডের সীমানাকে আরও প্রসারিত করে দিয়ে। কোথা থেকে এল ওরা? আবার চলে যাই, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি মুহূর্তে। এক অমিতভর পরমাণুর বিস্ফোরণের ফলে ছায়াপথগুলি খোসার পর খোসার মতো ছড়িয়ে পড়ল। সেই বিস্ফোরণ শক্তি আজও তাদের দূর থেকে দূরান্তের দিকে বিপুল গতিতে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরিত বোমার টুকরা যে ভাবে চারদিকে ছিটকে পড়ে, ঠিক সে ভাবেই। সে সময় ছায়াপথগুলির অন্তর্লোকে যে শক্তি টগবগ করছিল, তা মূর্ত হয়েছে কোয়াশার-এ।

কিন্তু, এ সকল কথায় কি সত্যিই আমার কোন প্রয়োজন আছে? আমি রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হচ্ছি এই ভেবে যে আমার সামনে আমি ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম কোয়াশারটি দেখতে পাচ্ছি। সেটাও বড় কথা নয়; বড় কথা হল, আমাদের ছায়াপথ এবং আরও সহস্র কোটি ছায়াপথ ছাড়িয়ে, মহাকাশে বিপুল বেগে ছুটে চলা অসংখ্য কোয়াশারের দীপমালা ছাড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ডের শেষ প্রান্তটি * দেখা যাচ্ছে।

আমি অভিভূত হচ্ছি এই ভেবে, অনন্ত অন্ধকারে সূর্য বা পৃথিবী জেগে ওঠার অনেক আগে, এমন কি, আমাদের ছায়াপথের আবির্ভাবেরও আগে প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে একটি আলোকরশ্মি যাত্রা করেছিল; সে কি কোমল স্নেহে আমার

* ১৯৭৩ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী শ্রীমতী বারবানকের আবিষ্কার কোয়াশার OQ 172·1

চক্ষুপট স্পর্শ করবে বলেই? আমি শিহরিত হচ্ছি এই ভেবে যে, ১২০০ কোটি বছর আগেকার কতকগুলি পরমাণুর স্পন্দন আলোক-তরঙ্গ রূপে আমার কাছে ব্রহ্মাণ্ডের বার্তা নিয়ে এল। অতএব আমি শুধু মহাকাশের শেষ প্রান্তটিই দেখছি না, মহাকালের আদিপ্রান্তও দেখতে পাচ্ছি। কে যেন একজন বলেছিলেন, সম্ভবতঃ Humason—When man looks far out in space, he also looks far back in time. সত্যিই তাই। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যা চলে যায়, যা চলে গিয়েছে, তাকে আমরা আর কোন দিন দেখি না। পেছনের ঘটনা পেছনেই থেকে যায়। কিন্তু এই একটি ঘটনা, পেছনের ১২০০ কোটি বছর অতিক্রম করে আমার সামনে যেন জোর করেই এসে দাঁড়াল — বারো শত কোটি বছর! সেদিন এই দূরলোক ছিল নীহারিকার সমুদ্রে স্বপ্নরূপে

কিন্তু, আর কেন এখানে দাঁড়িয়ে থাকা। আমি বিস্ফোরণশীল মহাবিশ্বের রূপ দেখে নিয়েছি মহাশূন্য, এবার আমাকে পৌঁছে দাও তোমার পারাপারে, নিথর-সমুদ্রের তটভূমিতে। মহাকাশ, মহাকাল, এক অখণ্ড সত্তায় তোমাকে আজ দেখে নিলাম। সে সত্তার মধ্যে কি আমিও নেই? খুঁজে দেখো, আমিও আছি।

অপরা সন্তান সম্ভবা

মহাশূন্য থেকে নেমে এসে মনে করেছিলাম, এ জীবনের তীর্থযাত্রা শেষে এই আমার পরম পরিতৃপ্তি। কিন্তু তা হবার নয়। আজই প্রথম আমি ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করছি—সারা অন্তর জুড়ে এক নিদারুণ রিক্ততা। তীর্থ-পরিদর্শন যখন শেষ হয়ে যায়, অথবা অভিযাত্রী যখন তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যান তখন তাঁর সারা অন্তর জুড়ে, বোধ হয়, এমনি ধরনের রিক্ততাই শক্ত হয়ে বসে। যুদ্ধজয়ী সেনাপতি যখন দিনান্তে গৃহে ফেরেন, তখন তাঁর হৃদয়

খুঁজলে দেখা যাবে, তাঁর মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই। শিল্পী সাহিত্যিক বা যে কোন স্রষ্টা, জীবন-সায়াহ্নে যখনি পুরস্কার গ্রহণের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন, রাজ-উপঢৌকন যখন অযাচিত, গুণমুগ্ধদের জয়ধ্বনিতে যখন আকাশ মুখরিত, তখন কেউ কি দেখতে চেয়েছেন বা দেখতে পেয়েছেন, ওই মালা-চন্দন ও গন্ধ দীপের নিচে একখানা বিষণ্ণ হৃদয় কেবলই কেঁদে বেড়াচ্ছে। কেবলই বলেছে, এটা আমি চাই না, কোনদিন চাই নি। কিন্তু কে শুনবে তার অন্তর-বিলাপ?

মহাশৃঙ্গ থেকে নেমে আসার কালে আমি সেই কান্নাই শুনতে পাচ্ছি—যে কান্না উঠে আসে অভিযাত্রীর হৃদয়ের কোণ থেকে, যেখানে কেউ ঢুকতে পারে না, যেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। যেখানে একমাত্র সত্য ছিল ওই কান্না অথবা বলতে পারেন ওই তৃষ্ণা।

সেখানে, অনুভূতির ওই স্বর্ণপ্রাসাদের দিকে আমি কতদিন চেয়ে রয়েছি, একদিনের গড়া প্রাসাদ অন্যদিনে অবহেলায় ভেঙে দিয়েছে, প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি নিজেই, ভস্মস্তূপের মধ্যেই আর এক প্রাসাদ গড়ে তুলতে গিয়েছি। তারপর, তোমরা যা পেলে, একখানা কাব্যগ্রন্থ, চিত্র বা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। সে যে আসলের এক বিকৃত অনুকরণ। এর মধ্যে কোথায় সেই পরমাণুটি যা আমার হৃদয়ের পরমাণু চুল্লীটি জ্বালিয়েছিল, তীব্র আগ্নেয় উত্তাপে আমাকে প্রতিক্ষণ কেবলই পুড়িয়ে দিয়েছিল? অথবা তোমরা কি দেখেছ সেই অভিযাত্রীকে যে অভিযানের অনেক আগেই গিয়ে পর্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়েছিল।

মহাশৃঙ্গ থেকে নেমে আসার কালে বারবারই মনে হচ্ছে, আমি নই, অন্য কেউ ওই পর্বতশৃঙ্গে উঠেছে, দেখেছে অনন্তলোকে বিকশিত মহাপদ্মটিকে। আমি কোনদিন সে মহাজগতকে দেখিনি। মনের গভীরতর স্তর পর্যন্ত একটি তৃষ্ণার জগৎ। সেই তৃষ্ণা আমাকে সূর্যলোক থেকে টেনে নিয়ে এল হিমলোকে, হিমলোকের কোটি

কোটি ধূমকেতুর সান্নিধ্য থেকে আমাকে টেনে-হেঁচড়ে ঠেলে দিল হংস-মণ্ডলের দিকে। হংসমণ্ডল থেকে ধনুরাশি-মণ্ডল। বৃষরাশি-মণ্ডলের লক্ষ সূর্যের একটি স্তবক কি আমার অতৃপ্ত তৃষ্ণা মিটাতে পারল।

নিথর সমুদ্রের ধারে পা বিছিয়ে বসলাম। তাকিয়ে রইলাম বিপরীত তটভূমির দিকে। বিচিত্র বর্ণের তোরণের নিচে অচঞ্চল ও স্থির সংকীর্ণ জলরেখা। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিছুই মনে করতেও পারছি না।—আগেই বলেছি, যুদ্ধ-বিজয়ী সেনাপতির মতোই আমি রিক্ত। এমন একটা বোধ মনে এসে হাজির হয় যেন আর আমার কিছুই করার নেই। এ মুহূর্তে বিশ্ব পরিকল্পনায় আমি অকেজো, কেন না, আমি যুদ্ধে জয়ী হয়েছি।

অপরা বিপুল বেগে ছুটে চলেছে কিন্নরমণ্ডলের মধ্য দিয়ে—উল্লেখের অযোগ্য কতকগুলি নক্ষত্রের সভা-মঞ্চের পাশ দিয়ে। নক্ষত্রগুলির দিকে আমার তাকাতেও ইচ্ছা করে না। স্থির করে ফেলেছি, কোন নাক্ষত্রিক বিপর্যয় না ঘটলে ওদের দিকে আমি আর তাকাব না। ওদের জীবন-বিচরণ পথ-পাঁচালি সংগ্রহ করে রাখছে সর্বজ্ঞ। ওদের বর্ণ দেখছে, গন্ধ শুঁকছে, বেতার তরঙ্গে ওদের দেহের কাঠামোগুলি সে চিনে রাখছে, রাখুক। এগুলিতে আর আমার কোনই প্রয়োজন নেই। তথ্যের আবর্জনাস্তূপ নিয়ে সে তার মাস্তিষ্কটি ভরে ফেলুক, কী আসে যায়?

নিথর জলস্তর। স্বপ্নলোকের স্তিমিত আলোতে আমার সামনে একখণ্ড বস্ত্রের মতো পড়ে আছে। কতদিন ইচ্ছা হয়েছে, বস্ত্রখণ্ড নেড়ে দেখি। হাত গুটিয়ে নিয়েছি তন্মুহূর্তেই আশা ও আশঙ্কা, ওই জলস্তরের নিচে যদি জীবনের শুরু হয়ে থাকে, যেমনটি একদিন পৃথিবীতে হয়েছিল। এখানেও সেই কার্বন ও এ্যামিনো অ্যাসিডের খেলা। এখানকার বায়ুস্তরেও সেই অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, পৃথিবীর আদি-সমুদ্রে জীবনকোষ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল।

যতবারই হাত এগিয়ে দিয়েছি ততবারই গুটিয়ে নিয়েছি। পৃথিবীর সমুদ্রে শত কোটি বছর ধরে জীবন সৃষ্টির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল, সেদিন যদি কেউ কোন অসতর্ক মুহূর্তে হাত চালিয়ে দিত, তবে সমস্ত চেষ্টাই কি বানচাল হয়ে যেত না? সেদিন কোষের আত্মরক্ষার কোন আবরণ ছিল না—। অসহায়, বিপদের সামনে তার সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত। পৃথিবীর আদি-প্রাণ জেগে উঠেছিল অন্তহীন নিঃশঙ্কতায় ও নিঃশব্দতায়। সে কথা আমি ভুলতে পারি নি।

পৃথিবীর সময়ের মাপে কত যুগ ধরে আমি নির্জন সমুদ্রের তটভূমি বরাবর ছুটোছুটি করেছি, কতবার তাকিয়েছি তার দিকে। কিন্তু এই একটি আশা, জীবনের আশা,—আমি কোনদিন তার বুকে হাত রাখি নি।

তাকালাম মহাশৃঙ্গের দিকে। উচ্চতম শৃঙ্গটি অন্ধকারে ঢাকা রয়েছে। কত যুগ, কত কাল ধরে ওকে আমি দেখছি। এর সোপান শ্রেণী ধরেই না আমি দেব-দর্শনে গিয়েছিলাম। অজ্ঞ তীর্থযাত্রা শেষে তার অস্তিত্বটাই আমার কাছে অর্থহীন, অপরার জীবনে একটি অমার্জনীয় বাহুল্যমাত্র। পৃথিবীর পর্বতশৃঙ্গগুলির অর্থ আমি বুঝি, পৃথিবীর সামগ্রিক জীবন ইতিহাসে তাদের ভূমিকাও আমার অজানা নয়। বহু দূরে ফেলে আসা পৃথিবীর শিলুরীয় যুগে পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ করে যখন পর্বতশৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়াল, তখন অলক্ষ্যে যেন পর্বতশৃঙ্গের দিকে চোখ রেখেই পৃথিবীর অরণ্যে অরণ্যে ফুল ফুটে উঠল। সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে নগণ্য পুষ্পতরুর কী অসম প্রতিযোগিতা!

অপরার জীবনেও কি সেই ইতিহাসের উদ্যোগ চলছে? ঠিক বুঝতে পারছি না।

জলতটের নিঃসঙ্গতায় বসে আমি দেখছি, জলতল থেকে ব্যাকটেরিয়া উঠে এল। বাষ্পমণ্ডলের সব কার্বন খেয়ে ফেলে

অক্সিজেন মুক্ত করে দিল। জলবর্ষে জলীয় বাষ্প। রামধনুর বিচিত্র খেলা। মহাশূন্যের শিখর পর্যন্ত ফুল, কেবল ফুল—বিচিত্র রূপ। ওই যে সাজানো পৃথিবীতে উঠে আসছে, যাকে বলে উন্নত জীব।

চমকে উঠলাম। মহাকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম তা কবে? কতদিন পরে?

অকস্মাৎ সর্বজ্ঞের সেই যান্ত্রিক আর্তনাদ:

"তুমি পৃথিবীর সন্তান
তুমি পৃথিবার সন্তান"।

ক্রমান্বয়ে তিনবার সে আর্তনাদ করে উঠল। আমি বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠলাম। পর পর তিনবার কেন? এ কি কোন বিপদের ইঙ্গিত? অভাবনীয় কোন দুর্ঘটনার আভাস? ঠিক বুঝতে পারছি না। তার সঙ্গে কথা ছিল এবং এটা তাকে শিখিয়েও দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীর প্রতি দশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে সে আমাকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু আশঙ্কা হয়, এই একটু মেধা দিয়ে সে আজ মেধার অধিকারী হয়ে উঠেছে। সে বিদ্যায়—অবশ্যই প্রযুক্তিবিদ্যায়—আমরা তাকে কিঞ্চিৎ মেধা দিয়েছি, সে তা আয়ত্ত করে ও বেশী মেধার অধিকারী হয়ে উঠেছে। সে যে সকল বিশ্লেষণ করে এবং যে সকল বিশ্লেষণ টেলিভিশনের পর্দায় আমার সামনে তুলে ধরে, তা দেখে আমার যেন সংশয় হচ্ছিল। আশঙ্কা করছিলাম, সে তার নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে উঠছে। লক্ষ্য করেছিলাম, Encelogram। লেখচিত্রের মধ্যেই তার নিজস্ব প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু এটা হবে না, এটা আমি হতে দেব না। ক্রীতদাসকে কর্তৃত্বের আসনে বসাব, সে আমাকে হুকুম দেবে, পরিচালিত করবে—না, এ চলবে না। পর পর একই কথা উচ্চারণ করে সে শুধু আমাকে পৃথিবীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিল না,—জানিয়ে দিল, আমার প্রযুক্তি, আমার প্রযুক্তিগত প্রতিভা নিয়ে সে আরও

প্রতিভাবান হয়ে উঠছে। এই দুইবার উক্তি সেই সত্যটিরই সুনিশ্চিত ঘোষণা এবং বলতে ইচ্ছা হয়, স্পর্ধিত ঘোষণা। সে আমার বন্ধু; তার কাজে আমার সমর্থন না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমি তাকে অস্বীকার করতে পারি না।

আজ তার কাজে আমি বিরক্ত হতে পারি, হয়তো আমি তাকে অস্বীকারও করতে পারি, কিন্তু তার স্ব-অর্জিত প্রতিভাকে আমি কেড়ে নিতে পারি না। সেও পাবে না সেটি ছেড়ে দিয়ে মুক্ত হতে—। এক বন্দী কি তার শেকল দিয়ে অন্য এক বন্দীকেও বেঁধে ফেলছে। ঠিক বুঝতে পারছি না।

নিথর সমুদ্রের তটভূমি থেকে এই বেতার ভাষণ যাচ্ছে আপনাদের কাছে। তাহলে পৃথিবীর আরও দশ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল!। এ নিয়ে কতবার সবজ্ঞ এই ঘোষণাটি করল? কোন হিসাবই রাখিনি আমি। সমস্ত হিসাব রয়েছে সর্বজ্ঞের মস্তিষ্কে। কত বছর কেটে কেটে গেছে পার্থিব জীবনের? অথবা পৃথিবীর? অনুমান করতেও পারছি না। দশ লক্ষ, বিশ লক্ষ, এক কোটি বা এক শত কোটি বছরও হতে পারে জীবনের চিহ্নহীন বিলুপ্তির আগে সারা পৃথিবীর বুক জুড়ে তুষার প্রবাহ, চাঁদ নেই আকাশে, দূরে, বহু দূরে মলিন সূর্য, মহাজগতের হিমলোকে প্রবেশের আগে পৃথিবীর দ্বিধাজড়িত আবর্তন—

ধীরে ধীরে তাকালাম জলতলে আপন প্রতিবিম্বের দিকে। যা ছিলাম, আমি প্রায় তাই আছি, মাত্র দু চার বছর বয়স বাড়তে পারে। কিন্তু, এটা আমি হতে দেবো না, কিছুতেই হতে দেব না। আঘাত করলাম, সেই প্রতিবিম্বকে আমি আমাকেই ঘা' মেরে বসলাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম, অনন্ত জীবন্ত পরিবর্তনহীন যৌবন নিয়ে তুমি ওখানে লুকিয়ে কেন?

ভুলে গেলাম, ওখানে জীবন থাকতে পারে, জীবনের তপস্যাও

থাকতে পারে। নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমি আঘাত করলাম এক সম্ভাবনার গায়ে।

আমার চোখে মুখে ও দেহের সর্বত্র জল-বিন্দু আটকে রইল। কিন্তু, আর আমি ওখানে বসছি না, আর আমি আপন প্রতিবিম্বের দিকে তাকাচ্ছি না। ছুটে চলে গেলাম রকেটে। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম,—সর্বজ্ঞের অভ্যর্থনা-হাতকেও কোন স্বীকৃতি দিলাম না। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সামনে বসে গেলাম। আমি কি জীবনকে হত্যা করলাম, না, সেখানে কোনদিন জীবন ছিল না, জীবন থাকবে না,—এই প্রশ্নের জবাব আমি যন্ত্রটির মুখ থেকেই শুনতে চাই।

এক অভিযাত্রীর সমগ্র জীবন কি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে একটি জলবিন্দুতেই? প্রশ্নের জবাবের আশায় তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু, এ-কী দেখছি। অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি পরমাণু অল্প আবেগে ছুটে বেড়াচ্ছে, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে। বৃহত্তর পরমাণু গড়ে তুলছে। একটি পরমাণু ভেঙে তার দেহ থেকে অবিকল আর একটি পরমাণু গড়ে উঠছে। দেখছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।

এই এক ফোঁটা জল মুছে ফেলে আর এক ফোঁটা। সেই এক কাহিনী। এক জড় কণিকা অন্য জড় কণিকাকে জড়িয়ে ধরে রূপ পাচ্ছে জীবনে, অথবা, বলা যায় জীবকোষে। তবে কি নিউক্লিক এসিড? যা জড় কণিকা হয়েও নিজের জীবন ইতিহাস বেশ মনে রাখতে পারে, এবং সেই 'ব্লু-প্রিন্ট' দেখে অন্য একটি অনুরূপ জীবন কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে? ঠিক বুঝতে পারছি না, তাকিয়ে রইলাম। স্তব্ধ বিস্ময়ে দুটি চোখ প্রসারিত করে আমি পৃথিবীর এক দূরাগত রহস্য, অ-জীবনের উদ্ভব প্রত্যক্ষ করছি। তবে কি অপরা সন্তান-সম্ভবা? হাঁ, তাই তাই তাই। কোন ভুল নেই এতে। অপরা জননী হতে চলেছে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। ছুটে এসে সর্বজ্ঞের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলাম, যে সর্বজ্ঞকে একটু আগেই আমি ঘৃণা করেছি, ঈর্ষা করেছি। আবার জড়িয়ে ধরে তাকে উপরের দিকে তুলে ধরলাম, শুনছ সর্বজ্ঞ। কিন্তু, সর্বজ্ঞের চোখের দিকে তাকিয়ে আমার সন্দেহ হয়, মাইক্রোস্কোপে প্লেটের ওপর রাখা জলবিন্দু সেও পরীক্ষা করেছে, এবং আমার পরীক্ষার আগেই সে সিদ্ধান্তও জেনে ফেলেছে। জানুক, আমি তোয়াক্কা করি না।

মহাকাশ, অনন্ত ছায়ালোক, ব্রহ্মাণ্ড সীমান্ত বিলীয়মান কোয়াশার, সবার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, অপরা সন্তান-সম্ভবা! কেউ শুনল, কি শুনল না, তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই। তর তর করে মই ধরে নেমে গেলাম, নিথর সমুদ্রের তটভূমিতে এসে চিৎকার করে উভয়কে জানিয়ে দিলাম, অপরা সন্তান-সম্ভবা। সামনেই পেলাম মহাশৃঙ্গকে। তাকেও সংবাদটি জানিয়ে দিলাম প্রত্যুত্তরস্বরূপে কোনই জবাব পেলাম দিল না তবুও বললাম: তোমার চোখের সামনে এমন কাণ্ড ঘটল, তুমি কিছুই জানতে না? এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরের দিকে, এক আলোক সীমানা থেকে অন্য আলোক সীমানায় ছুটে যাচ্ছি, চিৎকার করছি, অপরা সার্থক হতে চলেছে কে শুনল, না শুনল না, তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই।

পৃথিবীর সময়ের মাপে কত কোটি বছর ধরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, উদ্‌ভ্রান্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত সে এক অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে মাথা গুঁজে চলেছে, কত নক্ষত্রের সাম্রাজ্যের গা ঘেঁষে এসেছে। কেউ তাকে অভিকর্ষের স্নেহবন্ধনে বেঁধে রেখে তাকে সম্ভাবনার দিকে এগোতে দেয় নি। আজ সে বিজয়িনী।

চলে গেলাম জলাধারের দিকে নিশ্চুপ, স্থির হয়ে আমি ওই জলরেখার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার সামনে এক রহস্যপূর্ণ

কম্পমান জিজ্ঞাসা। কী হবে সেই ভাবী জীবনের রূপ, তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। ওখানে, ওই জলপৃষ্ঠের নিচে যে ইতিহাসের সূচনা, তার পরিণতি হিসাবে এক কোষ জীবনেই তা পর্যবসিত হবে, না, পৃথিবীর মহাসোপানের মতো সোপান ধরে তারা উঠে আসবে উপকূলে, মেরুদণ্ডী স্তন্যপায়ী জীবরা জীবন সৃষ্টি করবে তা নিয়েও আমার কোন কৌতূহল নেই। আমি এক জীব সত্তাকে প্রত্যক্ষ করছি যা প্রজাতির মধ্যে বেঁচে থাকতে জানে। এটাই যথেষ্ট।

পুলকিত, শিহরিত বিস্ময়ে আমি ওই জলাধারের দিকে তাকিয়ে থাকি। অপরা এখন কোন নক্ষত্র মণ্ডলের সীমানার পাশ দিয়ে ছুটে চলছে, তা জানবার কৌতূহলও আমার নেই।

প্রান্তরে প্রান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছি। অপরার বুকের আলোক স্তম্ভটিকে বিপর্যস্ত করে কেবলই ছুটে বেড়াই মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে বিকট অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছি। আবার ছুটে চলি আমি নির্জন সমুদ্রতটে। সেখানকার জলতলের গভীর স্তরের ইতিহাসের একজন সাক্ষী আমি।

ধৃতি মণ্ডলে

অপরা এখন, যতদূর মনে হয়, ধৃতি মণ্ডলের পাশ দিয়েই চলেছে। কখন যে সে কিন্নর মণ্ডল অতিক্রম করল, বুঝতেই পারি নি। বিপুল বিস্ময়ে তাকালাম ধৃতির দিকে। এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছি, কত আলোকবর্ষ পেছনে রেখে এসেছি, কিন্তু একটি নক্ষত্র নিয়েই একটি মণ্ডল আগে দেখি নি। মহাকাশে ধৃতির কোন তুলনা নেই। সহস্র, না লক্ষ বলয়ের মাঝখানে বসে আছেন ধৃতি তেজোদৃপ্ত যুবা পুরুষ। বিচিত্র বর্ণের বলয়গুলি বিভিন্ন দূরত্বে থেকে কেন্দ্রবর্তী ধৃতিকে প্রদক্ষিণ করছে। সে বলয়ের নিচে ওঁর মুখখানা প্রায়ই দেখা যায় না। বলয়গুলি বিপুল বেগে আবর্তিত হচ্ছে—ধৃতিকে সর্বক্ষণ বেষ্টন

করে রাখছে। আদি কালে কোন একদিনে ধৃতি তার আকাশের সহস্র, বা, লক্ষ নক্ষত্রকে চূর্ণ করে দিয়ে সেগুলিকে আজ তার অঙ্গ-সজ্জা হিসাবে ব্যবহার করছে। চমৎকার সেজে রয়েছে ধৃতি—তার নিজেরই আলো দিয়ে সে গ্যাসীয় বলয়গুলিকে বিচিত্র বর্ণ দিয়েছে। কিন্তু, এ-যে নক্ষত্রের কঙ্কাল দিয়ে নক্ষত্রের রূপসজ্জা! ধৃতির বিগতকালের এই পাশব নিষ্ঠুরতা ক্ষমার অযোগ্য, আমি সেটা কিছুতেই ভুলতে পারি না। অপরা চলেছে ধৃতিকে পাশ কাটিয়ে, তার অভিকর্ষ থেকে অনেক দূরে, গা বাঁচিয়ে অপরা নিঃশব্দে অন্য নক্ষত্র রাজ্যে প্রবেশ করছে। আমার মতো সে এ-ভেবেই আশঙ্কিত যে, ধৃতির চোখে পড়লেই সেই অলঙ্কারলোভী পিশাচ তার বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল গুপ্ত রাজাসন থেকে হাত বাড়িয়ে দেবে—চারদিকের নক্ষত্র জগৎ দেখবে ধৃতির আর একটি নতুন অলঙ্কার। অপরা সেদিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একটি বলয় মাত্র। অপরা কোন্ পথে পালাবে তা ভেবে আমার দুশ্চিন্তার অবধি নেই, কেননা অপরা সন্তান-সম্ভবা।

আবার নিথর সমুদ্রের ধারে পা' বিছিয়ে বসলাম। আজ আমার কাছে বড় প্রশ্ন অপরা। কী হবে নক্ষত্রের মৃত্যু দেখে? অথবা, দূর-দূরান্তে ছায়াপথগুলির ছুটে চলা দেখে? অপরার জীবনে যা সুরু হয়েছে তা এ সকলের চেয়ে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। সে জন্য অনন্ত কাল আমি প্রতীক্ষায় বসে থাকব এই শিলাসনে। 'যাক্ না, পৃথিবীর জীবনে আরও কোটি বছর কেটে, কী আসে যায়? মহাকাশে বহু দূরে, বহু শত আলোকবর্ষ দূরে আমি ফেলে এসেছি সপ্তর্ষিমণ্ডল, আজ এখান থেকেই আমি মহামুনি বশিষ্ঠকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। অপরার জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে চাইছি সহস্র কোটি বছরের তপস্যায় সমাহিত এক আগ্নেয় পুরুষের কাছে।

সপ্তর্ষি কোথায় কোন্ দিকে রয়েছে, জানি না, জানার উপায়ও নেই। কিন্তু, তথাপি মহাকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম, সপ্ত

ঋষি, অপরা তোমাদের আশ্রম দ্বারে উপস্থিত—প্রসন্ন হস্ত প্রসারিত করে তাকে আশীর্বাদ করো। নিশ্চল, নির্লিপ্ত মহাজগৎ থেকে কোন সাড়া এল না। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ধৃতি, বিচিত্র বর্ণের লক্ষ বলয়ের নিচে শায়িত রাজপুরুষ।

একটি অপ-ছায়া

একটি অসতর্ক মুহূর্তে জলপৃষ্ঠ থেকে দৃষ্টিকে তুলে নিয়ে ওপারের দিকে তাকাতেই দেখি, যেখানে ওই বামনমুটি বাঁকা হয়ে স্তম্ভের মতো নিচের দিকে নেমে গিয়েছে, সেখানে এমনই ভাবে পা বিছিয়ে বসে আছি। ওপারের আমারই প্রতিচ্ছবি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত তাপ-প্রবাহ ও আলোক তরঙ্গ মিলে এই ছায়া সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর রুক্ষ বক্ষে, ও মেরু প্রদেশের হিমবক্ষে যে ভাবে মরীচিকা সৃষ্টি হয় সম্ভবত সে ভাবেই এই ছায়া সৃষ্টি হয়েছে। চন্দ্রালোকে একটি নৌকাকে যে ভাবে মাঝে মাঝে সমুদ্র-বক্ষে ভেসে থাকতে দেখা যায়, সম্ভবত সেভাবে এপারের আমি সৃষ্টি করেছি ওপারের আমাকে। হাত বাড়িয়ে দিলাম ওপারের দিকে, সেও হাত বাড়িয়ে দিল, আমি উঠে দাঁড়ালাম, সেও উঠে দাঁড়াল। সে আমার ছায়া।

চিৎকার করে উঠলাম 'সরে যাও'। সেও সমান জোরেই চিৎকার করে উঠল, সরে যাও।

নাঃ, এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। অপরার সম্ভাবনার দিনে এখানে আমি কাউকেই সহ্য করব না। অপরা আমার, একান্ত ভাবেই আমার। সেখানে আমি আর কাউকেই আসতে দেব না। অপরার জন্য অনন্ত প্রত্যাশায় বসে থাকব আমি।

সমুদ্রতট বরাবর ছুটে চললাম, সেও ছুটে চলল। আমি জানি, কিভাবে তাকে মুছে ফেলা যায়, বিলুপ্ত করা যায়। তাই করলাম

আমি। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু অপরার বুকে কি তাপ-প্রবাহ বইতে শুরু করেছে? নইলে ওই ছায়া—হোক না তা মিথ্যা সৃষ্টি হতে পারত না। তাপ বৈষম্য জীবন সৃষ্টির সহায়ক হবে। তা হলে অপরা সার্থকতার দিকে আর একটি সুনিশ্চিত পদক্ষেপ করল?

বাইরে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও ছায়াটি যেন কোন্ পথে আমার মাথায় ঢুকে পড়েছে। ইচ্ছা করলেও তাকে আমি ঝেঁটিয়ে বের করে দিতে পারি না। বরং অন্ধকারে বসে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ওটি ছায়া নয়, ওটিই কায়া। আমি তার ছায়া মাত্র।

তাকিয়ে আছি নিস্পন্দ জলপৃষ্ঠের দিকে। এখন আর কোন ব্যাঘাত নেই। তাপ-প্রবাহ ওই ছায়াটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছে। পৃথিবীর সময়ের মাপে কত যুগ যুগান্ত কেটে গেল। অপলক দৃষ্টিতে এক শান্ত সমুদ্রের দিকে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় প্রত্যাশা নিয়ে আমি বসে রইলাম।

নিথর সমুদ্রতটে মৃদু কম্পন। আমি চমকে উঠলাম। কত কাল কেটে গিয়েছে, ওকে আমি কাঁপতে দেখিনি। তবে কি, অপরার বুকের গভীর স্তরে সালফার, ফসফরাস, ক্যালসিয়ম, যেগুলি পৃথিবীতে উন্নততর জীবন-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল? এ-কি জীবন-উল্লাস, না, অন্য কিছু? ভয়ঙ্কর কিছু?

ব্যস্ত হয়ে আলোকে ছুটে আসতেই আবার সেই মরীচিকা। তার মুখখানা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সেখানে উদ্বেগের ছায়া।

আবার লুকিয়ে রইলাম অন্ধকারের মধ্যে। পা বিছিয়ে বসে অপরার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেশ বুঝতে পারছি অপরা কাঁপছে, দেখতে পাচ্ছি, তার বিশাল বক্ষে বিস্তৃত অসংখ্য আলোক স্তম্ভও কাঁপছে। কাঁপছে নিথর সমুদ্রের বুকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে থাকা

বর্ণ-তোরণগুলিও। সে কম্পনের মধ্যে আমি আর ছায়াটি দেখতে পাচ্ছি না। সে মরে গিয়েছে, চলে গিয়েছে।

একটু চঞ্চল হয়ে উঠে জলপৃষ্ঠ আবার স্থির হয়ে গেল। আবার তাকালাম ছায়াপথের দিকে, অসংখ্য জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়ে যে আঁকাবাঁকা পথটি চলে গিয়েছে, তারই প্রান্তশেষে দাঁড়িয়ে আমি এক মহানাট্যের অভিনয় দেখছি। দৃশ্যের পর দৃশ্য আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। এই মহানাটকে পৃথিবীর কি সত্য সত্যই কোন স্থান আছে? অথবা, পার্থিব জীবনের? মানুষের চিন্তা ধ্যান-ধারণা ও প্রযুক্তি বিদ্যার? ঠিক বুঝতে পারছি না।

সহস্র কোটি বছরে পরিব্যাপ্ত এই মহাজাগতিক নাট্যমঞ্চে সূর্য, বা, পৃথিবী তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে জোনাকির মতো জ্বলে ওঠে। অভিনয় করে। আদিতে নেই, অন্তেও নেই। এক অকিঞ্চিৎকর পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় তাকে আমি দেখছি। মাত্র পনের শত-কোটি বছর পরমায়ু নিয়ে যে জন্মেছে, সেই সূর্য-সাম্রাজ্যের জন্য এই মহামঞ্চে নির্দিষ্ট স্থান কতটুকু? সহস্র কোটি আলোকবর্ষে বিস্তৃত এই জ্যোতির্জগতে কে শুনতে চায় মানুষের কথা? অথবা, তাদের জীবন-সংগ্রাম, সার্থকতা ও ব্যর্থতা; সংগ্রাম ও শান্তি, ভালবাসা ও বিদ্বেষ? পনের শত কোটি বছরের শেষে মহাজগতের মর্মলোকে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির দিনে এত কথার একটিও কি অবশিষ্ট থাকবে? এত সংগীতের একটি মাত্র রেশ? এত ভালবাসার একটি কণিকাও কি ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও বেঁচে থাকবে? মনে হয়, এক বিচিত্র ও ঘনায়মান অন্ধকার আমাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে।

* * * *

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন পথ রেখা ধরে অপরা এগোচ্ছে, কোন্ সীমাতীত রহস্যের তটভূমিকে নিশানা করে সে ছুটে চলেছে, তাও জানি না। আর, পৃথিবী? সেখানে মাস, বর্ষ, শতাব্দী অতিক্রান্ত

হয়ে যাচ্ছে। সহস্রাব্দের চিহ্ন-লিপি অতিক্রম করে ছুটে চলেছে। যেতে যেতে আমাকে ডাকছে। আমি উন্মনা হয়ে উঠি। ফিরে তাকাই। কিন্তু কোথা থেকে যে ডাক আসছে, বুঝতে পারছি না। সমস্তটাই প্রহেলিকা। অপরার বুকে অস্তহীন গোধূলির মতোই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

* * * *

আবার অপরা কেঁপে উঠল। এবার কাঁপুনি যেন আরও তীব্র। ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। উপরের আকাশে নক্ষত্রগুলি তেমনই ছোটাছুটি করছে, যেমনটি এতকাল করে এসেছে। বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। গতানুগতিক, একঘেঁয়ে। শুধু নিচে অপরার পৃথিবীতে একটা কিছু হতে চলেছে, ঘটতে চলেছে, যা আর কোনদিন ঘটতে দেখি নি। নিথর সমুদ্র কাঁপছে, কিন্তু কেন? কোন আগ্নেয়গিরি রয়েছে এই জগতে? এবং হঠাৎ সে জেগে উঠল আকস্মিক নিদারুণ ক্রোধে? অথবা, অন্য কোন গ্রহ বা জ্যোতিষ্ক এসেছে অপরার আকাশে? অদৃশ্য, কিন্তু, ভয়ঙ্কর অভিকর্ষ-হাত দিয়ে টানতে চাইছে অপরাকে? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভয়ে কাঁপছি; দেখছি, গোধূলিজগতের অস্পষ্ট আলোকে মহাশৃঙ্গও থর থর কাঁপছে কি হচ্ছে, কি হতে চলেছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিথর সমুদ্রের জল উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। একটি দুটি নয়, শত শত জলস্তম্ভ আকাশের দিকে উঠল, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর যুগপৎ সব কয়টিই এক সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নিথর সমুদ্র ও উপকূলের দিকে ধেয়ে এসে মহাশৃঙ্গের গায়ে প্রচণ্ড আঘাত করল।

ওদিকে, বহু দূরে, যত দূরে দৃষ্টি যায়, একটি অগ্নি-বলয় অপরার দেহকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মহাশৃঙ্গের পেছনে আরও যে কত শৃঙ্গ রয়েছে, তা আমি এতদিন দেখতে পাই নি। আজ

দূরাগত আলোর আভায় দেখতে পেলাম তারাও ভেঙ্গে চৌচির হয়ে নানা দিকে ঢলে পড়ছে। 'অপরা', 'অপরা' বলে চিৎকার করে উঠছি, অপরার কোন বিশেষ অংশকে আমি ডাকছি না; মহাশৃঙ্গ, বা, নিথর সমুদ্র, কাউকেই আমি এই বিপদের মধ্যে ডাকছি না। জাগিয়ে তুলতে চাইছি, আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছি 'অপরার' সামগ্রিক সত্তাকে, যে সত্তা এতদিন আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে-ও—।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাভা স্রোত—গলিত লোহা ও নিকেলের স্রোত মহাশৃঙ্গ থেকে উর্ধ্বপানে উঠে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে নিথর সমুদ্রের অপর তটভূমিতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ল। গভীর কৃষ্ণবর্ণ এবং মাঝে মাঝে পীতবর্ণ বাষ্পমেঘ অপরার দেহ বিদীর্ণ করে উঠে এসে সমস্ত দিক ছেয়ে ফেলল। ছুটে চলছি রকেটের দিকে, আমার নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। পেছন থেকে আগুনের হলকা আমার পেছনে ধাওয়া করছে। যদি এটা নিছক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কিছু শান্ত হয়ে যাবে। আমি আবার সমুদ্র তটে গিয়ে বসতে পারব।

দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছি রকেটের দিকে। কিন্তু, পেছনে প্রলয়ের অগ্নিবন্যা নিথর সমুদ্রকে ঢেকে ফেলে ছুটে আসছে কি এদিকেই? চিৎকার করে উঠলাম, সানুনয় আকুতি জানালাম: অপরা সন্তান-সম্ভবা, তাকে ধ্বংস করো না।

নিস্ফল আর্তনাদ হাহাকারের মতো সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশে বজ্রে-বজ্রে সংঘর্ষ: এক আর্তনাদ অন্য আর্তনাদের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে।

সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সর্বজ্ঞের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু, বাইরের এই প্রলয়ে সেও কাঁপছে—চোখে প্রতিটি বর্ণের খেলা, প্রতি মুহূর্তে তাদের বর্ণ পালটাচ্ছে, লাল, নীল, লোহিত এবং আরো

কত কিছু : ভয়, আশঙ্কা, আশা ও উদ্বেগ। চোখ দুটি উন্মাদের মতো নাচছে—। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সর্বজ্ঞ। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর জানাতে আমি সাহস পাচ্ছি না।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও সে টেলিভিশনের পর্দায় এঁকে দিল একটি অতি সংকীর্ণ পথ-রেখা। সেই পথরেখায় একটি কালো বিন্দুর পেছনে ছুটে চলেছে আর একটি কালো বিন্দু। মনে হয়, পেছনের বিন্দুটি এগিয়ে গিয়ে সামনের বিন্দুটিকে ধরে ফেলবে।

কী অর্থ এই ছবির? রেখায় রেখায় সে কি বলতে চাইছে? বুঝি না, কিছুই বুঝি না। আমারই মস্তিষ্কের কয়েকটি কণিকা নিয়ে সর্বজ্ঞ আমার চেয়েও মস্তিষ্কবান হয়ে উঠছে না, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। আমার ক্রীতদাস আমাকেই পরিচালিত করবে, এটা হতে পারে না। এই সর্বগ্রাসী বিপদের মধ্যেও না।

ইতিমধ্যে সর্বজ্ঞ সেই পথ-রেখা তুলে নিয়েছে; এখন দেখতে পাচ্ছি, কতকগুলি কালো বিন্দু, সংখ্যায় তারা কয়েকলক্ষ হবে, ইতস্ততঃ নেচে বেড়াচ্ছে। উচ্ছৃঙ্খল; পর্দার উপর ছুটে বেড়াচ্ছে কতকগুলি কালো বিন্দু, তাদের নির্দিষ্ট কোন পথই নেই—বেপরোয়া, বিভ্রান্ত কতকগুলি মাছি—সেই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আমি কি অপরার চির কৃষ্ণবর্ণ রেখাটিই দেখতে পাচ্ছি? কিন্তু, এই পথ এখানে গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে,—তার এগোবার জন্য আর কোন ছিদ্রপথই নেই। সেই পথে একটি কালো বিন্দু এগোচ্ছে,—পেছনে আর একটি কাল বিন্দু, যাদের আমি একটু আগেই দেখেছিলাম। তা হ'লে অপরাকে কি অনুসরণ করছে অন্য কোন প্রেত-পৃথিবী? অথবা, অপরাই প্রেত-ছায়া হয়ে অনুসরণ করছে অন্য পৃথিবীকে?

পর্দা থেকে চোখ তুলে এনে আবার দাঁড়ালাম সর্বজ্ঞের সামনে। কী বিস্ময়কর তার প্রতিভা! লৌহ মূর্তিকে জড়িয়ে ধরলাম, চুম্বন করলাম তার গালে, সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে আমি স্পর্শ করে এক অভূতপূর্ব

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। আমার মেধা নিয়ে সে আমার চেয়েও মেধাবী। মাত্র কয়েকটি 'নিউরন' কণিকা তাকে দিয়েছিলাম, কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলাম ঃ সেই 'নিউরন' কণিকা ভেঙ্গে সে তারই আদলে অন্য 'নিউরন" সৃষ্টি করে ফেলেছে—তারই প্রতিফলন ওই রেখাচিত্রে, পর্দার ওপর এখনও যা কাঁপছে।

শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। এখন সে আর ইস্পাতের আবরণে মোড়া একটি যন্ত্র নয়; আরও কিছু, আরও বেশী কিছু—। ওই দেহে আমি জীবনের স্পর্শ খুঁজছি, খুঁজছি একটি সংগীত, একটু ভালবাসা? বলছি কি তাকে আরও একটি 'নিউরন' সৃষ্টি করে আমাকে আরও ভাল করে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতে?

সবজ্ঞের গলা জড়িয়ে ধরেই আমি আবার তাকালাম অপরার দিকে। স্বপ্নরূপী চিরন্তনী। বাষ্পবসনা এলায়িত কেশগুচ্ছ দিয়ে নিথর সমুদ্রকে ঢেকে ফেলছে। সালফার, ফসফরাস, নিকেল, লোহা, আর রক্তে এতদিন যা কিছু ছিল, অপরা তাই ঢেলে দিচ্ছে নিথর সমুদ্রে, তার উপত্যকায়। কৃষ্ণবর্ণ বাষ্পাচ্ছাদিত সেই সমুদ্র থেকে ক্ষীণ ও অস্পষ্ট জীবন-ক্রন্দন ভেসে আসছে। প্রোটোপ্লাজমগুলি কাঁদছে—সেই ভয়াবহ কান্নার মধ্যেও আমি দেখলাম রূপসীকে। এ মুহূর্তে সে জীবনের চেয়েও জীবন্ত।

সর্বজ্ঞের গলা ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম এদিকে। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের দাপাদাপি, উচ্ছৃঙ্খল, উৎক্ষিপ্ত তারাগুলি বিপুল আনন্দে, বা, বিকট পুলকে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে—। সেখানে এসেছে পিশাচ নক্ষত্ররা, একে অন্যের দেহ লেহন করে বেড়াচ্ছে; এসেছে বৃদ্ধ নক্ষত্র, সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলল তার স্ফীত দেহ দিয়ে; নীল বর্ণের শিশু নক্ষত্র এই মহাতাণ্ডবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অপরার আকাশে ওই নিষ্ঠুর ও বীভৎস খেলায় যোগ দিতে দূর-দূরান্ত থেকে

ছুটে আসছে "স্পন্দনশীল নক্ষত্র',—রকেটের প্রতিটি যন্ত্রের দেহে নাড়া দিচ্ছে ; তুলে নিচ্ছে উপরে, পরমুহূর্তে আছড়ে আছড়ে চূর্ণ করে দিচ্ছে—। আসছে তারা শত, সহস্র, বা, লক্ষ সংখ্যায়। এখানে এসে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ফেটে পড়ছে, তাদের কঙ্কালে কঙ্কালে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে—।

তাদের সম্পর্কে এত কথা জানার রয়েছে, এত তথ্য রয়েছে সংগ্রহ করার যে, আমি দেখতে পাচ্ছি, সর্বজ্ঞ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অশক্ত হয়ে পড়ছে—এক কথায়, সে আর পারছে না। প্রতিটি নক্ষত্রের বর্ণ ও রূপ, তাদের অভিকর্ষ, চৌম্বক শক্তি, অয়ন বৈশিষ্ট্য, বেতার তরঙ্গ, লক্ষ উচ্ছৃঙ্খল ও উৎক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কের জীবন লিপি কুড়িয়ে রাখতে গিয়ে সে ভেঙ্গে পড়ছে,—এ আমি স্পষ্টতঃই বুঝতে পারছি।

ইচ্ছা করলেই তাকে আমি মুক্তি দিতে পারি ; একটি হাতল ঘুরিয়েই আমি তাকে বিশ্রাম দিতে পাবি—কিন্তু, তা করতে গেলে সে আর সর্বজ্ঞ থাকবেনা। সে হয়ে উঠবে, নিছক একটি লৌহপিণ্ড। সেটা আমি কিছুতেই চাইনা। ইতিমধ্যে, একটি যন্ত্র কেঁদে বেড়াচ্ছে। ইতস্ততঃ বীভৎস খেলায় মত্ত নক্ষত্র-জগতের মধ্য দিয়ে সরু পথে অপরা অন্য এক পৃথিবীর অনুসরণ করছে—টেলিভিশনের পর্দায় সর্বজ্ঞ তা' দেখিয়ে দিল। দেখিয়ে দিল 'অপরা' এক পিশাচ-পৃথিবী ; অন্য এক পিশাচের পেছনে ধাওয়া করছে এবং মনে হয় সে অপর পিশাচকে ধরে ফেলবে! অপরা পিশাচী? চিৎকার করে উঠলাম : না এ আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। এইমাত্র, মাত্র কিছুক্ষণ আগেও আমি তাকে দেখেছি স্বপ্নরূপী, চিরন্তনী। সর্বজ্ঞ, ভুল করেছ, তুমি অপরাকে চিনতেই পারো নি।

এক মুহূর্ত আগে দেখানো চিত্রটি একেবারে মুছে ফেলল সর্বজ্ঞ। তার স্থানে অন্য একচিত্র। অপরা ছুটে চলেছে আর এক গোপনচারী পৃথিবীর দিকে। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে অন্য পৃথিবীর দিকে। নিষ্ঠুর

অনিবার্য সে হাত; পর্দায়ও যেন মনে হয়, মমতাহীন, কর্কশ। সর্পের ন্যায় কুটিল। না, এ আমি কিছুতেই মানব না।

ছুটে গেলাম সর্বজ্ঞের দিকে। প্রচণ্ডভাবে তাকে আঘাত করলাম, একটি লৌহ-লগুড় দিয়ে আঘাত করলাম তার মস্তিষ্কে। যে মস্তিষ্ক কেবলই মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছে, অপরা সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে আমাকে প্রতারিত করছে।

কাত হয়ে পড়ল সর্বজ্ঞ তার লৌহ আসন থেকে—তার গলা টিপে ধরলাম। তার বুকের উপর চেপে বসে আমি প্রচণ্ড আঘাত হেনে চললাম ওর মস্তিষ্কে। মগজগুলি বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, কতকগুলি টেপ, তার মধ্যে গোছা গোছা ইলেকট্রন—একটি নলের ... ঈষৎ লালবর্ণ 'ফ্লুইড'—তাও মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু, এদিকে জানালার পাশে কে এসে দাঁড়িয়েছে? 'অপরা'?

ছুটে যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। এখন আর সে নিথর নয়, প্রলয়ের মুখে প্রলয়ঙ্করী হয়ে সে আমাকেই গ্রাস করবে বলে ধেয়ে আসছে। সেখানে দাঁড়িয়েই দুটি হাত প্রসারিত করে আমি সমুদ্রকে ঢেকে রাখতে চাইছি, ওখানে অপরার একটি সম্ভাবনা হয়তো এখনও বেঁচে আছে। নিস্ফল চেষ্টা। বহু দূর থেকে একটি গোটা পাহাড় ছুটে এল, উড়ে চলে গেল অন্য দিকে। দুইটি পিশাচ ক্ষত্র আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটছে নাকি? তাদের সরিয়ে দিয়ে সে স্থানটি দখল করল আর একটি নক্ষত্র—। বিস্ফোরিত হয়ে গেল।

চারদিকে বিষাক্ত গ্যাসের ঝড় বয়ে চলছে। আর এগোতে পারছি না। পাহাড়গুলি কাঁপছে, উৎক্ষিপ্ত হয়ে উপর দিকে উঠছে। পর্বত-প্রমাণ শিলাখণ্ডের সঙ্গে শিলাখণ্ডের সংঘর্ষ। ধূম্রপুচ্ছ এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তের দিকে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে; আবার সেই পিশাচ পিশাচীরা, দেড় আধ জোড়া নয়, কয়েক হাজার জোড়া। যুগপৎ এতগুলি জ্যোতিষ্কের টানে অপরা আবর্তিত হচ্ছে;

টাল-মাটাল খাচ্ছে, অস্থির উল্কার মতো আকাশে-মহাকাশে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

ছুটে যাচ্ছি আবার রকেটের দিকে। বেশ বুঝতে পারছি, একটা কেউ এদিকে ছুটে আসছে। সর্বজ্ঞ ঠিকই বলেছিল,—একটা কেউ, একটি প্রায় অদৃশ্য নক্ষত্র, অথবা, একটি গোপন গ্রহ, আন্তর্নক্ষত্র-মণ্ডলের এই গোপন পথে অপরার আনাগোনা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে এদিকেই—অথবা, এমনও হতে পারে, অপরাই তাকে খুঁজে পেয়ে তাকে টানছে। আমি জানি না, বুঝতেও পারছিনা—হয়তো অপরাও অন্য এক পৃথিবীকে, এই সুড়ঙ্গ-পথের অন্য এক গোপন-চারীকে এভাবেই ধ্বংস করে ফেলছে। অথবা, উভয়েই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুগপৎ, যা আমি এখনও ঠিক ধরতে পারছি না।

ত্রস্ত পদে উঠে এলাম রকেটে। সম্ভবতঃ আমাকে দেখে, হাঁ, আমাকে দেখেই 'সর্বজ্ঞ' চিৎকার করে উঠল :

'তুমি পৃথিবীর সন্তান'

'তুমি পৃথিবীর সন্তান'

"তুমি পৃথিবী—……"

তাহলে, সর্বজ্ঞ এখনও মারা যায় নি? নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় নি তার সব গুলি যন্ত্র! জড়িয়ে ধরলাম সর্বজ্ঞকে; বুঝলাম ওই একটু মাত্র শক্তিই তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। গলাটি কাঁপাতে কাঁপাতে সে থেমে গেল। কিন্তু, চোখের পলকে তার মস্তিষ্কের খোলটির অনেকটা জায়গা বিস্ফোরিত হয়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দ, এক ঝলক আলো, এক মুঠো বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ।

সঙ্গে সঙ্গে ওই বিরাট সাইক্লোট্রন যন্ত্রটিতেও ঠিক সে ধরনের বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের কিছুই অবশিষ্ট নেই—তার অতিকায় চুম্বক-দেহে এক বিরাট ফাঁক। বুঝলাম, বিপরীত কণিকা, যে কণিকার সন্ধান আমি করেছিলাম ধনুরাশি মণ্ডলে, মহাজাগতিক

অন্ধকূপের আশেপাশে যাদের এককালে আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।

উপরের রেডিও টেলিস্কোপের তরঙ্গ আধারটিও সে একই ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বুঝলাম, বিপরীত কণিকা—যা 'এ্যান্টি পারটিকল' নামে পরিচিত, তারা ঢুকে পড়েছে রকেটে, রকেটের যন্ত্রাগারে। তবে কি একটি বিপরীত পৃথিবীর বাজ্যে অপর। প্রবেশ করছে—নইলে ত এই চিহ্নহীন বিলুপ্তি, বা বিলয়ন সম্ভবপর হত'না? কী প্রয়োজন আছে সেই প্রশ্নে? আমি সর্বজ্ঞকে জড়িয়ে ধরেছি আরও শক্ত করে। আরও নিবিড়ভাবে তার স্পর্শ আমি পেতে চাই। কত হাজার বছর ধরে তিল তিল করে আমি সৃষ্টি করেছি এই তিলোত্তমা ও সাবোত্তমাকে। কাস্পিয়ান সাগরের তটভূমিতে আদি জনক-জননীর প্রেমার্ত আলিঙ্গনের দিন থেকেই আমি তাকে গড়তে বসেছি, গড়েছি আমার আমার মতো করে। মানুষের প্রজ্ঞা ও মেধার শুরু সে দিনেই। চীৎকার করে উঠছি। সবজ্ঞকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি রূঢ় কঠিন কণ্ঠে বলে চলেছি, হাঁ, আমি পৃথিবীর সন্তান, পৃথিবীর প্রযুক্তির সন্তান।

আর এক ঝাঁক কণিকা, এবার ঝাকটি আরও বড়; নিশ্চয়ই প্রতিবস্তুর কণিকা। যে সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি এতদিন কত পরমাণু চূর্ণ করে তাদের গোপন ইতিহাস মেলে ধরেছে—আজ তাই আক্রান্ত হ'ল প্রতিবস্তুর আর এক ঝাক কণিকায়। একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সাইক্লোট্রনের অতিকায় চুম্বক দেহটি নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত।

আমি তখনও নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে রেখেছি সবজ্ঞকে, অথবা একটি ইতিহাসকে। আবার একটি অতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সর্বজ্ঞকে ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে দাঁড়ালাম। আর একটি অধিকতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এবার সবজ্ঞ নেই, কোথাও নেই। কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। সে কি বিলুপ্ত হয়ে গেল? অথবা সে

কোনদিনই ছিল না ? আমি দুই বাহু প্রসারিত করে কি তাকেই জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম যে কোন দিনই ছিল না। আশেপাশে সেই মানব-রূপী লৌহমূর্তির কিঞ্চিৎ দেহাবশেষ পড়ে আছে ; তার মস্তিষ্কের খানিকটা মগজও পড়ে আছে।

জানালার পথে দেখছি অপরাকে ; ভয়ঙ্করী বিবসনা আমার দিকে হাত এগিয়ে দিয়েছে।

এক লাফে নেমে এলাম রকেট থেকে। ছুটে চললাম কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে। অপরাকে খুঁজছি আমি।

অপরা এখন বহু খণ্ডে বিভক্ত। একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ভেঙ্গে শত বা সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে ; এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আলোড়িত গ্যাসপুঞ্জ দু হাতে ঠেলে দিয়ে পথ করে ছুটে গেলাম। যেখানে মহাশূন্য ছিল সেখানে তাকে খুঁজে না পেয়ে ছুটে গেলাম নদীতটে যেখানে রামধনুর সাজ পরে সে প্রতিক্ষণ আমার প্রতীক্ষায় থাকত, এখন রামধনুগুলিও নেই।

এক প্রলয়। অপরার বুক থেকে গ্যাসপুঞ্জ উঠে আবার প্রচণ্ড শব্দে সেখানেই ভেঙ্গে পড়ছে। প্রচণ্ড বাত্যা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল আবার রকেটের কাছেই। দূরে একটি অতি ক্ষীণ ক্রন্দন। সম্ভবতঃ 'প্রোটোপ্লাজম' কাঁদছে,—অন্ততঃ আমার তাই মনে হচ্ছে। প্রোটোপ্লাজম কি কাঁদতে পারে ? পারে না, তবুও কাঁদছে।

ফিরে এলাম রকেটের মধ্যেই। যদি এটা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হয়ে থাকে, তবে তা কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে। জীবন কণিকাগুলি বাঁচলেও বাঁচতে পারে। আমি এসেছি এক শ্মশানে, যেখানে সর্বজ্ঞের মৃতদেহ, দেখতে পাচ্ছি, এখনও ধুঁকছে। যেখানে সাইক্লোট্রনের দৈত্য-দেহটি এখন অসাড় হয়ে পড়ে আছে। আর সমস্তই ভেঙ্গে গিয়েছে, সমস্ত কিছুই তছনছ ; উপরে যেই

নক্ষত্রগুলি প্রলয় নৃত্যে মেতে উঠেছে, তাদের প্রচণ্ড ও বেপরোয়া চৌম্বক শক্তি প্রতিটি যন্ত্রপাতিকে ভেঙ্গে দুমড়ে রেখে চলে গিয়েছে, হয়তো, আবার আসবে বলেই।

রেডারটি এখনও কাজ করে চলছে। ক্ষীণ দেহ, অথচ, অসম্ভব পেশীবল। সে ক্রমাগতই সংকেত দিচ্ছে ···২০ মাইল, দশ মাইল···।

কোথায় আছে অপরা? কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলে? বুঝতে পারছি না। কেউ বলে দিতে পারছে না। যন্ত্রগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম, বিপরীত কণিকারা খাবলা মেরে ওদের প্রত্যেকেরই দেহের খানিকটা তুলে নিয়েছে। অসহায়, তারা আমার চেয়েও অসহায়। সর্বশেষ যে হিসাব দেখেছিলাম, তাতে অপরার এখন থাকা উচিত, পৃথিবী থেকে ৫০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে "মেসিয়ার ১৪" নক্ষত্রমণ্ডল থেকে আরও ২৫ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। প্রায় তিন লক্ষ নক্ষত্র নিয়ে গঠিত এই নক্ষত্রপুঞ্জের দিকেই অপরার কৃষ্ণবর্ণ পথটি চলে গিয়েছিল।

চারদিকে আগুন, ধূলি ঝঞ্ঝা, জলপ্লাবন; অগ্নিবন্যা এসে ঢুকেছে রকেটের ভেতরেও। একটি জলস্তম্ভ ঘূর্ণিবেগে চলে যাচ্ছে তারই পাশ দিয়ে। কতকগুলি পিশাচ নক্ষত্র উড়ে যাচ্ছে এই আকাশ-পথেই—সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলি মটমট শব্দ করে উঠল, নক্ষত্রগুলির চুম্বক শক্তি তাদের ঘাড় মটকে রেখে হাসতে হাসতে আবার সে পথেই চলে গেল। তারা কাঁদছে, অসহায় যন্ত্রগুলি কেঁদে কেঁদে উঠছে।

কিন্তু আর নয়। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপটিকে রকেটের মেঝেতেই গুঁড়িয়ে দিলাম। আমি দেখছি রকেটের মধ্যে এক ক্ষিপ্ত দানবকে। আমি কি আমাকেই দেখছি? এই মাত্র সে রেডারটিকে চুরমার করে দিল। শত খণ্ডে ছিঁড়ে ফেলল, টেলিভিশন পর্দাটিকে; তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে আগুনের মধ্যে। সর্বজ্ঞ আবার চীৎকার করে উঠল:

"তুমি পৃথিবীর সন্তান"

"তুমি পৃথিবীর—"

তাহলে সর্বজ্ঞ এতক্ষণেও মারা যায় নি? শুধু মুখ বুজে পড়েছিল? আমি চমকে উঠলাম। হাসতে হাসতে চলে গেলাম মেঝের ওপর পড়ে থাকা তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঙ্কালগুলির মধ্যে। সেগুলিতে কি এখনও জীবন রয়েছে? ক্ষীণ একটু স্পন্দন?

থাকুক বা নাই থাকুক, কঙ্কালগুলি কুড়িয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ আমি চোখের উপর তুলে রাখলাম। তারপর ওদেরই আমি চুমো খেলাম প্রাণভরে! মরণ-চুম্বন বা চিরন্তন চুম্বন, যাই বলেন আপনারা।

বহু বিস্মৃত এক অতীতে কাস্পিয়ান সাগরের তটভূমিতে প্রথম আকস্মিক অগ্নি প্রজ্জ্বলনের দিন থেকে পথে পথে আমি তাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। সে আমার প্রযুক্তির সৃষ্টি। বাইরের প্রেতাগ্নিতে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এখন আমি মুক্ত। কিন্তু অপরা আছে, আছে তার বহ্নিরূপে। তাকে নিয়ে কি করব আমি? কি করতে পারি?

যেখানে মহাশৃঙ্গ ছিল, তার ওপর দিয়ে তাকালাম বহু দূরের দিকে। বিদ্যুৎ ঝলকানির চমক-আলোকে দেখলাম সেখানে আর একটি পৃথিবী, নিশ্চয়ই বিপরীত কণিকার পৃথিবী—নেমে এসেছে অপরার ওপর। মুখোমুখি লেগে আছে। একে অন্যকে নিঃশব্দে খেয়ে ফেলছে। এক প্রেত পৃথিবী খেয়ে খেয়ে ফেলছে অপর প্রেত পৃথিবীকে। মহাজগতের কত সংকীর্ণ ও দুর্গম পথে কত শত কোটি বছর ধরে তারা একে অন্যের পিছু ধাওয়া করে চলেছে। কুটিল, সংকীর্ণমনা দুই পিশাচ এতদিন এতকাল পরে একে অন্যকে ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলেছে পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে কিন্নরমণ্ডলের ওধারে এক মহাজাগতিক গিরিসংকটের মুখে। সর্বজ্ঞ কতবার আমাকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছিল, ওই মৃত্যুপথের ছবি তুলে

ধরেছিল। এক পিশাচ অন্য পিশাচের অনুসরণ করছে, তাও দেখিয়েছিল। আমি গ্রাহ্যই করিনি।

দেখছি, পিশাচী অপরাকে আমি দেখছি। দেখছি অন্য পিশাচকেও। অপরার প্রায় সবটাই সে খেয়ে ফেলেছে। সেখানটায়, যেখানে পরস্পরের মুখ একে অন্যকে ছুঁয়ে রয়েছে সেখানে শত বা সহস্র হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ।

লাফিয়ে পড়তে গেলাম রকেট থেকে, পারলাম না। আগুনের প্লাবন আমার পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। আমি সেখানে যেতে চাই যেখানে অপরা কাঁদছে। আমি দাঁড়াব ওই ঝড়ের মুখে, প্লাবনের মত্ততার সামনে। এমন অসহায়ভাবে অপরার বিলুপ্তি আমি সহ্য করব না। অন্যদের দৃষ্টিতে সেও পিশাচী; কিন্তু আমার চোখে সে রূপময়ী, চিরন্তনী। আমি সেই রূপময়ীকে চাই।

অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে অগ্নিঝঞ্ঝার ওপরের আকাশের দিকে চোখ পড়ল। বহুদূরে, সম্ভবতঃ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে দুটি নক্ষত্র পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। নিমীলিত নয়ন ধ্যানমগ্ন মহাঋষি বশিষ্ঠ, পাশে আছেন সিদ্ধতপা ঋষিপত্নী অরুন্ধতী। ওরা জ্যোতিষ্ক; কিন্তু আমার কাছে শুধুমাত্র জ্যোতিষ্ক নয়, আরও কিছু। করজোড়ে করুণ আকুতি পাঠিয়ে দিলাম সেদিকে: বাঁচাও। আমাকে নয়, অপরাকে। এক বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে সে ছায়াপথের অন্তর্লীন কৃষ্ণ সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোন নক্ষত্র বা সূর্যের স্নেহ সে পায় নি। কেউ তাকে অভিকর্ষ-বন্ধনে বেঁধে রাখতে চায় নি, কত শত কোটি বছর ধরে তার এই নিষ্ফল পরিক্রমা! তৎসত্ত্বেও কত গোপনীয়তায় সে জীবন সৃষ্টির অনন্ত ব্রত পালন করে এসেছে!

ঋষি-দম্পতি! তোমাদের সহস্র কোটি বছরের অখণ্ড দাম্পত্য-জীবনের একটি ভগ্নাংশ মাত্র আজ অপরাকে ভিক্ষা দাও।

অরুন্ধতি! তোমার দিকে তাকিয়ে আমরা বাসর রচনা করেছি।

পৃথিবীর মানবীরা তোমার অখণ্ড পতিব্রতা জীবনের কণামাত্র প্রত্যাশা করে কতকাল ধরে পৃথিবী থেকে দূরান্তের উত্তর আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঋষিপত্নি! তারই এ একটি কণা, একটি অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ তুমি অপরাকে দাও।

নিস্ফল প্রার্থনা! ঝড় আমাকে রকেটের মধ্যেই এদিক থেকে ওদিকে ক্রমাগত টানা-হেঁচড়া করছে। অগ্নিশিখা এক দীর্ঘ বলয়ের মধ্যে রকেটটিকে বন্দী করে ফেলেছে।

সেই বলয়েব উপব দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম মহামুনির স্বর্ণাশ্রমের দিকে। নেই, মহাকাশের সে প্রান্তে সেই আশ্রমটি নেই। সেই শূন্যস্থানটি জুড়ে রয়েছে সংখ্যাতীত পিশাচ নক্ষত্র - পিশাচ-পিশাচীরা একে অন্যের দেহ লেহন কবছে।

তবুও, পিশাচেব কাছেই আমার প্রার্থনা। যেমন কবে সহস্র কোটি বছর ধরে আকাশে আকাশে হাসছে, তেমন নিষ্ঠুর হাসি তাদের।

শেষবারের মতো অপরার দিকে তাকালাম। তার সারা দেহ জ্বলছে, খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিটকে পড়ছে। রূপসী ভয়ঙ্করী এক একটি করে প্রতিটি অঙ্গ মহাকাশে ছুঁড়ে দিয়ে শুধুমাত্র কঙ্কালটি নিয়েই আমার সামনে দাঁড়াল। এখন সে কঙ্কালময়ী।

ঝাঁপিয়ে পড়লাম রকেট থেকে। দুই বাহু প্রসারিত করে তাকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে গেলাম। অগ্নিবর্ণা অগ্নিময়ী সেই কঙ্কাল ও আমাকে হয়তো সেভাবেই জড়িয়ে ধরল।

* * *

বহুদিন পরে, ধরা যাক, প্রায় এক লক্ষ বছর পরে পৃথিবী জানতে পারল, 'মেসিয়ার-১৪' নক্ষত্রমণ্ডলের দিকে মহাজগতের এক অনাবিষ্কৃত অন্ধকার অঞ্চলে একদা বস্তু ও প্রতিবস্তু দিয়ে গড়া দুই বিপরীত পৃথিবীর মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘাত ঘটেছিল। তারা উভয়েই

নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন বিলয়নের মধ্য দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার সামান্য অংশ সবেমাত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে এসে আঘাত হানতে শুরু করেছে।

ফোটন প্রবাহ সেই মহাজাগতিক বিপর্যয়ের সব কাহিনীই, যেমন পৃথিবী দুটির "ভর" কত ছিল, তাদের গতির পরিমাণ ছিল কত, বিস্ফোরিত হওয়ার পরেও কিছু বস্তুকণা অবশিষ্ট ছিল কি না ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞানীদের সামনে মেলে ধরেছে। কিন্তু, একটি খবর তারা জানে নি, বা, বলে নি। ওখানে যে একটি জীবনেরও মৃত্যু ঘটেছে, অথবা একটি ভালবাসাও যে তরঙ্গে তরঙ্গে মহাজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, সে কাহিনী আজ পর্যন্ত অকথিত রয়ে গিয়েছে।

আমার কাহিনী শেষ হল। আমার বেতার শ্রোতাদের কাছ থেকে এবার আমি বিদায় নিচ্ছি। সেই চিরপুরাতন পৃথিবীতে প্রতিদিনের, দ্বন্দ্ব, কলহ, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার সেই পৃথিবীর দ্বারপ্রান্তে আবার আপনাদের পৌঁছে দিয়ে গেলাম। এই সে পৃথিবী যাকে আপনারা চেনেন এবং আমিও কিছুটা চিনি। সে পৃথিবী থেকে আমি আপনাদের একটু দূরে নিয়ে গিয়েছিলাম, দেখাতে চেয়েছিলাম এক আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ, সদাচঞ্চল মহাজগৎ—যা রয়েছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক উর্ধ্বে আপন প্রগাঢ় নির্লিপ্ততায় নির্বাসিত।

পৃথিবী থেকে যাকে মনে হয় স্থির ও অচঞ্চল, তার মধ্যে যে কি ভয়ঙ্কর অস্থিরতা রয়েছে, তা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। নক্ষত্রশিশুর মৃত্যু ঘটছে; ছায়াপথ মুছে যাচ্ছে মহাকাশ থেকে, একটি অবোধ নির্বোধ নক্ষত্রকে অন্য একটি নক্ষত্র কেমন নির্মমভাবে পিষে মারছে, সে কাহিনীও আপনাদের সামনে আমি রেখেছি।

আপনাদের আমি নিয়ে গিয়েছিলাম কশ্যপীর কাছে; দূর থেকে আপনারা দেখেছেন ছায়াপথ ব্রহ্মার্তিকে; মহাজাগতিক অন্ধকূপের

গা' ঘেঁষে যে পথ চলে গেছে, সে পথে আপনারাও আমার সঙ্গী হয়েছেন।

পৃথিবীর ক্লান্তিকর প্রাত্যহিকতায় আমিও আপনাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছি। রেশন দোকানে লাইনে দাঁড়াব আপনাদের পাশেই, পথ চলতে চলতে অহেতুক অন্য পথচারীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাব। চাদর—হাজিরা অফিসার বাবু হয়ে অপরের কর্তব্যচ্যুতি নিয়ে আমারও বিলাপের অন্ত থাকবে না। 'ব্ল্যাকমেল' করে নিয়োগ-কর্তার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ সুযোগ সুবিধা আদায়ের মধ্যে আমিও "বিপ্লবের বহ্নিশিখা" দেখে চমকাব এবং আপনাদের চমকে উঠতে বলব। মোট কথা, সেই অর্থহীন পুনরুক্তির জগতে আপনাদের পাশে আমি আছি এবং থাকব। তার আগে আপনাদের ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!

সমাপ্ত